তৃতীয় অধ্যায়

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে স্বদেশচেতনা

- জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনার উৎস সন্ধান
- স্বদেশপ্রেমের সংঘাতে ব্যক্তি-প্রেমের বিবর্তন ঃ পুরু বিক্রম
- স্বদেশপ্রীতির আলোকে 'সরোজিনী'র প্রতিফলন
- প্রচারে অশ্রুমতীর প্রেমকাহিনি পরিবেশনে প্রতাপসিংহের স্বদেশপ্রেম

তৃতীয় অধ্যায়
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে স্বদেশচেতনা

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনার উৎস সন্ধান

জোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যে এক প্রবাদ পুরুষ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঞ্চম পুত্র তিনি। জন্ম ৪মে, ১৮৪৯। ঠাকুর বাড়ির সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় তাঁর বেড়ে ওঠা। ক্রমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুযোগ্য পুত্র রূপে আত্মপ্রকাশ। গৃহেই তার শিক্ষারম্ভ। ক্রমে সেন্ট পলস, মন্টেগু আকাডেমি ও হিন্দুস্কুলে তিনি পড়াশুনা করেন। ১৮৬৪ সালে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ক্যালকাটা কলেজ থেকে। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময়ই তিনি পারিবারিক জোড়াসাঁকো থিয়েটারের সান্নিধ্যে আসেন।[১]

ঠাকুর বাড়ির স্বদেশি আবহাওয়ার মধ্যে তিনি বড়ো হন। ক্রমে তাঁর সংযোগ ঘটে নবগোপাল মিত্রের হিন্দু মেলার সঙ্গে। এখান থেকেই তাঁর স্বদেশী ভাবনা বিস্তার লাভ করে। ঠাকুর বাড়ির পৃষ্ঠপোষকতায় চৈত্র মেলা বা জাতীয় মেলা বা হিন্দু মেলা স্থাপিত হয়। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। প্রথম অধিবেশনটি হয় ১২৭৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংক্রান্তিতে অর্থাৎ ৩০ চৈত্র শুক্রবার (১২ এপ্রিল ১৮৬৭)। স্থান ছিল রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় বাহাদূরের চিৎপুরের বাগান বাড়ি।[২] পরবর্তীকালে এই মেলা শুধু ঠাকুরবাড়ি নয় সমগ্র বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষে প্রভাব বিস্তার করে।

এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশ প্রেমে বাঙালিদের উদ্বুদ্ধ করা। অর্থাৎ 'হিন্দু মেলা' বা 'জাতীয় মেলা' গঠনমূলক উদ্দেশ্য নিয়েই প্রবর্তিত হয়েছিল। এর ঘোষিত উদ্দেশ্যই ছিল 'স্বজাতীয়দিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা স্বদেশের উন্নতি করা।' এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 'স্বদেশীয় লোকগণ মধ্যে পরস্পরের বিদ্বেষভাব উন্মূলন করিয়া উপরোক্ত সাধারণ কার্যে নিয়োগ', 'প্রত্যেক বৎসরে আমাদিগের হিন্দু সমাজের কতদূর উন্নতি হইল, এই বিষয়ে তত্ত্বাবধারণ', 'আমদেশীয় যে সকল ব্যক্তি স্বজাতীয় বিদানুশীলনের উন্নতি সাধনে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন, 'প্রতি মেলায় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীয় লোকের পরিশ্রম ও শিল্পজাত দ্রব্য' সংগ্রহ ও প্রদর্শন, 'স্বদেশীয় সঙ্গীত নিপুণ ব্যক্তিগণের উৎসাহ বর্দ্ধন' ও 'যাঁহারা মল্ল বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, প্রতি মেলায় তঁহাদিগকে একত্রিত করিয়া উপযুক্ত পারিতোষিক বা সম্মান প্রদান ... এবং স্বদেশীয় লোক মধ্যে ব্যায়াম শিক্ষা' প্রচলন – এই ছ'টি সাধনোপায় নির্দিষ্ট হয়েছিল এবং দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ছ'টি মণ্ডলীতে বিভক্ত করে তাঁদের উপর এক একটি বিভাগের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল।'[৩]

এহেন একটি সংগঠনের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যুক্ত হন। নবগোপাল মিত্র তাঁকে উৎসাহ দেন। 'নব গোপালবাবু দেখা হলেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে উত্তেজনাপূর্ণ জাতীয়ভাবের কবিতা লিখিতে

অনুরোধ করিতেন। জ্যোতিবাবু এ সময়ে কবিতা লিখিতেন না বা ইহার পূর্বেও কখনও লেখেন নাই। কিন্তু ক্রমাগত অনুরুদ্ধ হওয়ায় তিনি একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন'।

জ্যোতিরিন্দ্র কবিতার মধ্যে সমগ্র দেশের মূর্তি স্থাপন করে দেশবন্দনা করেছেন। 'এই কবিতাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম কবিতা।'[৫] অকুন্ঠ ভাবে নির্মিত এই কবিতাটির মধ্যে আছে স্বদেশের প্রতি গভীর মমত্বের ছাপ। কবিতাটির কিছু অংশ দেওয়া হল –

জাগ জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান।
মাকে ভুলি কত কাল রহিবে শয়ান ?
ভারতের পূর্বকীর্তি করহ স্মরণ,
রবে আর কতকাল মুদিয়ে নয়ন ?
দেখ দেখি জনীনর দশা একবার
রুগ্নশীর্ণ কনে বর, অস্থি চর্মসার ;
অধীনতা অজ্ঞানাদি রাক্ষস দুর্জয়
শুষিছে শোনিত তাঁর বিদায় হৃদয় ;
স্বার্থপর অনৈক্য পিশাচ প্রচণ্ড,
সর্বাঙ্গসুন্দর দেহ করে খণ্ড খণ্ড !
মায়ের যাতনা দেখি বল কোন প্রাণে
সুপুত্র থাকিতে পারে নিশ্চিন্ত মনে ?
যে-জননী পয়ঃ সুধা শতনদী ধরে
পিয়াইছে নিরবধি আমা সবাকারে ;
যে জননী মৃদু হাসি সব দুঃখ ভুলি
উপাদেয় নানা অন্ন মুখে দেন তুলি ;
এমন মায়ের ভোলে যে-কোন সন্তান
নিশ্চয় হৃদয় তার পাষাণ সমান।

কবিতাটি রচনা করার পর দ্বিতীয় অধিবেশনে ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তা পাঠ করে শোনান। শিবনাথ শাস্ত্রী ও অক্ষয় চৌধুরীর কবিতা ও ওই আসরে পঠিত হয়। এভাবে স্বদেশি ভাবনার বাহকরূপে এই মেলা বৎসরে বৎসরে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। অর্থাৎ ঠাকুর বাড়িতে স্বদেশি পরিবেশে জ্যোতিরিন্দ্র নাথের পথ চলা শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশী প্রথার চলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান স্থিরদীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে এখটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুন্ন ছিল, তাতাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে এখটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল।'[৬]

সেই কারণে দুর্বার এক স্বদেশিস্রোত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে বহমান ছিল। খুব সহজেই সে কারণে হিন্দুমেলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। একথা বলা উচিত, হিন্দু মেলাতেও আদি ব্রাহ্মসমাজের সদস্যরাই ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও ছিলেন সেই দলের। '.... তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আমল হইতেই প্রকৃতপক্ষে স্বদেশীভাবের প্রচার আরম্ভ হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় উক্ত পত্রিকাতে ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনি লিখিয়া লোকের মনে সর্বপ্রথম স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। তাহার পর রাজানারায়ণ বসু মহাশয় হিন্দুমেলার কল্পনা করিয়া এবং নবগোপাল মিত্র মহাশয় অনুষ্ঠানে তাহা পরিণত করিয়া এই স্বদেশীভাবের প্রবাহে সে সময়ে প্রচণ্ড একটা বল সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন। বলিতে গেলে পূর্বে আদিব্রাহ্মসমাজই তখন স্বদেশী ভাবের প্রধান কেন্দ্র ছিল।'[৭] পরবর্তী কালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থ সাহায্যে স্বদেশীভাব প্রচারের উদ্দেশ্যে National Paper নামক একটি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যার সম্পাদক ছিলেন নবগোপালবাবু। এই মেলার মাধ্যমেই প্রথম ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে ভক্তিও উপলব্ধির চেষ্টা করা হয়।

হিন্দুমেলার ২য় বৎসর ১১এপ্রিল ১৮৬৮-তে সতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সবে ভারত সন্তান' জাতীয় সংগীত গীত হয়। বাংলা সাহিত্যে জাতীয় সংগীতের সূচনা হয় এই গান দিয়েই। এবং এই সভাতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কৃত 'জন্মভূমি জননী, স্বর্গের গরীয়সী' কবিতাটি পাঠ করা হয়।[৮]

হিন্দুমেলার পঞ্চম অধিবেশনে (১১-১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭১) 'ভারতীয় বাণিজ্য' বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বক্তৃতা দেন। ইতিপূর্বে তিনি পাটের ব্যবসায় নিযুক্ত হন। তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও দেশীয় শিল্প নিয়ে তার এই বক্তৃতায় স্বদেশভাবনার প্রকাশ ঘটে। সপ্তম অধিবেশনে 'ভারত মাতার বিলাপ', 'নীলদর্পণ' প্রভৃতি স্বদেশভাবনার নাটকের কিছু অংশ অভিনীত হয়। এরপর নবম বার্ষিক অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের 'হিন্দুমেলায় উপাহার' কবিতাটি আবৃত্তি করেন কবি স্বয়ং। কবিতাটি স্বদেশিভাবের চরম নিদর্শন। সমকালে কবিতাটি পাঠকমহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও ভুজেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায় সংশ্লিষ্ট সম্পাদক নির্বাচিত হন। 'হিন্দুমেলার উপহার'ও আবৃত্তি করা হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সম্পাদক থাকা কালে। সুতরাং হিন্দুমেলায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বদেশ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারা আয়ত্ত করেন। ইংরেজ কবল থেকে ভারতকে মুক্ত করতে তাঁকে উপায় অবলম্বন করতে দেখা যায়।

হিন্দুমেলায় যুক্ত থাকাকালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'সঞ্জীবনী সভা'।'' জ্যোতিদাদার উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকের সভা। কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়িতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। বস্তুত, তাহার মধ্যে ওই গোপনীয়তাটাই একমাত্র ভয়ংকর ছিল। আমাদের ব্যবহারে রাজার বা প্রজার বয়ের বিষয় কিছুই ছিল না। আমরা মধ্যাহ্নে কোথায় কী করিতে যাইতেছি, তাহা আমাদের আত্মীয়রাও জানিতেন না। দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্‌মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি – ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত, আর বেশি-কিছুই প্রয়োজন ছিল না। আমার মতো অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল। সেই সভায় আমরা এমন একটি খ্যাপামির

তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে, অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম। লজ্জা ভয় সংকোচ আমাদের কিছুই ছিল না। এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো।' [৯]

স্বদেশি ভাবনার উত্তেজনাকে ধরে রাখাই ছিল এ সভার উদ্দেশ্য। হিন্দুমেলা একদিকে সাংস্কৃতিক সম্মেলন। সেই সম্মেলনে নিযুক্ত ব্যক্তিরা কখনও বিপ্লব করতে পারে না। তাই বিপ্লব-এর জন্য গুপ্ত সমিতি 'সঞ্জীবনী সভা' সে দায়িত্ব পালনে অগ্রণী হয়। [১০] যাই হোক, এ সভার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলা যায়, বিশ্বে তখন পরিবর্তনের এখটা বাতারণ সূচিত হয়েছে। এ দেশে হিন্দুমেলার জনপ্রিয়তা বাড়ছে। অন্যদিকে ইউরোপে মাৎসিনি, গারিবল্ধি কভুরের উদ্যোগে ইতালিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের উন্মাদনা দেখা যাচ্ছে। আমেরিকাতে ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে ক্রীতদাসেরা আন্দোলনের পথে নেমেছেন। অর্থাৎ অন্যান্য দেশে যখন স্বাধীনতা, স্বাধীনতা আন্দোলনে উন্মত্ত হয়েছে। একের পর এক সফলতা পাচ্ছে। তখন বাংলাদেশের শিক্ষিত তরুণের মধ্যেও সেই আন্দোলনের আঁচ এসে লেগেছে।

মাৎসিনী ইতালির স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যেমন, 'কার্বোনারি' নামে গুপ্ত সভার সভ্য হন এবং সেখানে সাঙ্কেতিক ভাষায় কাজ চলত তেমনি এ দেশের যুবকদের মধ্যে কার্বোনারির মতো নানান গুপ্তসভা স্থাপনের উদ্যোগ দেখা যায়। এর ফলে ঠাকুর বাড়িতে 'সঞ্জীবনী সভা'র প্রতিষ্ঠা হয়। এই সভার আদর্শ ও কার্বোনারির আদর্শ কল্পিত। সভার কার্য বিবরণীর দিকে দৃষ্টি দিলে তা সহজেই বোঝা যায়। "ছেলেবেলাকার সেই Masonic সভার ইহা একটি দ্বিতীয় সংস্করণ। ঠনঠনে একটা পোড়া বাড়িতে সেই সভা বসিত। এ বাড়িতে পূর্বে নাকি একটা স্কুল ছিল, জ্যোতিবাবুরা শুনিয়াছিলেন, এ বাড়ির যে কে মালিক তাহা তাঁহারা তখন তো জানিতেনই না, আজ পর্যন্তও জানেন না। সভার অধ্যক্ষ ছিলেন বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু।... জাতীয় হিতকর ও উন্নতিকর সমস্ত কার্যই এই সভায় অনুষ্ঠিত হইবে, ইহাই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।" [১১] এই সভার গোপীয়নতা কঠোরভাবে রক্ষা করা হত। অধ্যক্ষ পট্টবস্ত্র পরে বেদমন্ত্র দিয়ে সভ্য করানোর রীতি ছিল। অর্থাৎ স্বাদেশিকতার উত্তেজনার মাত্রা এখানে এমনই ছিল যে তাতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা থাকার কথা বলে মনে করে প্রশান্ত কুমার পাল মহাশয়। মাৎসিনির জীবনাদর্শ প্রচার থেকে এই সভার সূচনা তাও জানা যায়। বিপিনচন্দ্র পাল এ সম্পর্কে বলেছেন –

"সে সময়ে সুরেন্দ্রনাথ নব্য ইতালীর স্বাধীনতার ইতিহাসের কথা আমাদিগের মধ্যে প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কি করিয়া ম্যাট্‌সিন এবং ইয়ং ইতালী (Young Italy) সমাজের সভ্যেরা নিজেদের মাতৃভূমিকে অস্ট্রীয়ার শাসনশৃঙ্খলা হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করেন, সুরেন্দ্রনাথের মুখে এই কাহিনী শুনিয়া আমাদের অন্তরে একটা নূতন স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা আসে। ম্যাট্‌সিনি প্রথমে ইতালীর প্রাচীন বিপ্লববাদী কারবনারাইদিগের (Carbonari) সঙ্গে জুটিয়া পড়েন। কারবনারাই-দল দেশময় বহুসংখ্যক গুপ্ত রাষ্ট্রীয় সমিতির গঠন করিয়াছিলেন। ম্যাট্‌সিনি গুপ্তষড়যন্ত্র ও গুপ্তহত্যার দ্বারা দেশ উদ্ধার হইবে না, ইহা বুঝিয়া অল্পদিন মধ্যেই তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যান। কিন্তু কারবনারাইদিগের কথা কলিকাতার ছাত্রমণ্ডলীকে একরূপ পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। দলে দলে মিলিয়া তাঁহারা কারবনারাইদিগের অনুকরণে নিজেদের মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট গুপ্ত-সমিতি (বা Secret Society) গড়িবার

চেষ্টা করেন। এ সকলের পিছনে কোনো প্রবল বিপ্লববাদের প্রেরণা ছিল না।'' [১২] এই সভা ১২৮৩ পৌষের কোন একসময়ে। এখানকার ভাষাও ছিল গুপ্ত। থাকে 'হামচূপামূহাফ' বলা হত। জাতীয় হিতকর কার্যপ্রণালীকে অব্যাহত রাখতে প্রতি সভ্য তাঁর আয়ের এক দশমাংশ দান করতেন। সভার ভারতবাসীর সার্বজনীন পোশাক সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশচেনতার মাত্রা মন কে অতিক্রম করে শরীরে স্পর্শ করে। সমগ্র ভারতবাসীকে একটি সূত্রে আবন্ধ করার ঐকান্তিক প্রয়াস এখানে দেখি। 'জীবনস্মৃতি'-তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন –

''ভারতবর্ষের একটা সর্বজনীন পরিচ্ছদ কী হইতে পারে, এই সভায় জ্যোতিদাদা তাহার নানাপ্রকারের নমুনা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ধুতিটা কর্মক্ষেত্রের উপযোগী নহে অথচ পায়জামাটা বিজাতীয়, এইজন্য তিনি এমন একটা আপস করিবার চেষ্টা করিলেন যেটাতে ধুতিও ক্ষুন্ন হইল, পায়জামাও প্রসন্ন হইল না। অর্থাৎ, তিনি পায়জামার উপর একখণ্ড কাপড় পাট করিয়া একটা স্বতন্ত্র কৃত্রিম মালকোঁচা জুড়িয়া দিলেন। সোলার টুপির সঙ্গে পাগড়ির সঙ্গে মিশাল করিয়া এমন একাট পদার্থ তৈরি হইল যেটাকে অত্যন্ত উৎসাহী লোকেও শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য করিতে পারে না। এইরূপ সর্বজনীন পোশাকের নমুনা সর্বজনে গ্রহণ করিবার পূর্বেই একলা নিজে ব্যবহার করিতে পারা যে-সে লোকের সাধ্য নহে। জ্যোতিদাদা অম্লানবদনে এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে গাড়িতে গিয়া উঠিতেন – আত্মীয় এবং বান্ধব, দ্বারী এবং সারথি সকলেই অবাক হইয়া তাকাইত, তিনি ভ্রূক্ষেপ মাত্র করিতেন না। দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকিতে পারে কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন পোশাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন লোক নিশ্চয়াই বিরল।'' [১৩]

কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো সভ্যই এ পোশাক পরিধান করলেন না। 'তখন অগত্যা এ কল্পনা ছাড়িয়া দিয়া আমরা দেশে শিল্পবাণিজ্যের কল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হইলাম। সর্বপ্রথম দিয়াশলাইয়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইল।' [১৪] অর্থাৎ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় ও দেশীয় উপায়ে সহজে প্রস্তুত এই কাঠির মধ্যে স্বদেশচেতনা প্রকাশই ঘটে। কিন্তু অনেক কষ্টে এবং অনেক অর্থ ব্যায়ে দেশলাই প্রস্তুত করেও সাধারণ দেশস্ত মানুষের হাতে তা তুলে দেওয়া গেল না। কারণ তাতে খরচ খুব বেশি পড়ত। নানান অসুবিধার কারণে দেশলাই উৎপাদন বন্ধ করে দেশেয় মঙ্গলসাধনে অন্য কার্যে তারা ব্যাপিত হন। রসিকতা করে রবীন্দ্রনাথ এই দেশীয় কারখানা বন্ধ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলেছেন, ''অনেক পরীক্ষার পর বাক্সকয়েক দেশলাই তৈরি হইল। ভারতসন্তানদের উৎসাহের নিদর্শন বলিয়াই যে তাহারা মূল্যবান তাহা নহে – আমাদের এক বাক্সে যে-খরচ পড়িতে লাগিল তাহাতে একটা পল্লীর সম্বৎসরের চুলা-ধরানো চলিত। আরো একটু সামান্য অসুবিধা এই হইয়াছিল যে, নিকটে অগ্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া তোলা সহজ ছিল না। দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ যদি তাহাদের জ্বলনশীলতা বাড়াইতে পারিত, তবে আজ পর্যন্ত তাহারা বাজারে চলিত।'' [১৫]

'সঞ্জীবনী সভা'র সদস্যরা দেশ হিতকর এমন ভাবনা থেকে সরে আসেন নি। নব উদ্দামে এবার দেশীয় কাপড়ের কল তৈরি করতে সভার সদস্যরা ঐক্যমত প্রকাশ করেন। সভ্যরা দ্বিগুণ উৎসাহ ও উত্তেজনায় কাজ শুরু করলেন। সামান্য অর্থে এমন আয়োজনে একখানি গামছা ভিন্ন আর কিছু প্রস্তুত হয়নি, ''দেখিতে দেখিতে নবপ্রতিষ্ঠিত কাপড়ের কলে একদিন একখানি গামছা প্রস্তুত হইল। ব্রজবাবু সেই গামছাখানি মাথায় বাঁধিয়া উন্মত্তের মতো তাণ্ডব নৃত্য শুরু করিয়া দিলেন... এই গামছাখানি ছাড়া অন্য আর কিছুই সে কলে প্রস্তুত হয় নাই।''[১৬] এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, জাতি ধর্ম নির্বিশেষ এই সভাতে যোগদান করে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হতেন – একই আহার একই আসনে বসে খেতেন। এককথায় স্বভাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে এই সভা ব্যাপকভাবে সফল না হলেও তা স্বল্প পরিসরে সফল হয়েছিল তা বলাই যায়। আর রাজনারায়ণ বসুর (হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা রচনা করেন) মতো স্বদেশপ্রাণ মানুষের স্পর্শে তা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ১২৮৪ জৈষ্ঠ্য পর্যন্ত ছয়মাস এই সভা স্বদেশ উত্তেজনার নাটিকা সৃষ্টি করে লুপ্ত হয়। অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর যে মনে প্রাণে স্বদেশের জন্য অকুণ্ঠ দান করতে পারতেন, সমস্ত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করতে পারতেন তা এই সভার বিবরণী থেকে আহ্বান করা যায়। এবং 'ভারতী' পত্রিকার প্রকাশই হয়ত এই সভার কার্যাবলীকে কিছুটা ক্ষীন করে। পত্রিকার নামের মধ্যে দেশভাবনা জাগরিত হয়। সঞ্জীবনী সভার উদ্দেশ্যে লেখা রবীন্দ্রনাথের গান 'তোমারি তরে মা সপিনু দেহ' ভারতীকে প্রকাশিত হয়।

এর কিছু দিন পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বঙ্গ ভাষা সংক্রান্ত একটি সভা স্থাপন করেন। বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি ও বঙ্গভাষার সেবকদের সম্মান প্রদর্শন এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পরস্পরের ভাব বিনিময়ে সৌভাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে এমন একটি পরিকল্পনা তিনি করেন। সভার নাম হল 'কলিকাতা সারস্বত সম্মিলনী'। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো স্বদেশানুরাগী ব্যক্তিরা এ সভার যোগদান করায় সভার মাত্রাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনার খেয়ালিপন এখানেই থেমে যায় নি। প্রতিটি স্থানে, চিন্তায়, তিনি স্বদেশমূর্তিকে স্থাপন করতে সর্বদা বদ্ধ পরিকর ছিলেন। তাই দেশীয় ভাষা, শিল্প, সাহিত্যকে তিনি গৌরবময় স্থানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ইংরেজদের অপেক্ষা এই হিন্দু বাঙালিরা যে কোনও কোনো অংশে কম নয় তার প্রতিযোগিতায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য আরও দৃষ্টান্ত আলোচনা করা হল।

জ্যোতিরিন্দ্রিনাথ ভগ্নিপতি জানকীনাথ ঘোষালের সঙ্গে কিছুদিন পাটের ব্যবসা করে কিছু টাকা পয়সা আয় করেন। সেই টাকা দিয়ে তিনি কিছুদিন নীলের চাষ করেন। নীল চাষেও মোটা অঙ্কের টাকা লাভ করে তা নিয়ে কি করবেন ভাবছেন এমন সময় নিলামে একটি জাহাজ কিনে ফেললেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''কাগজে কী একটা বিজ্ঞাপন দেখিয়া একদিন মধ্যাহ্নে জ্যোতিদাদা নিলামে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া ফবর দিলেন যে, তিনি সাত হাজার টাকা দিয়া একটা জাহাজের খোল কিনিয়াছেন। এখন ইহার উপরে ইঞ্জিন জুড়িয়া কামরা তৈরি করিয়া একটা পুরা জাহাজ নির্মাণ করিতে হইবে।''[১৭]

বাঙালিকৃত প্রথম জাহাজ চালানোর নেশাতেই তিনি এমন কাজ করেছিলেন। জাহাজখানি সারিয়ে তা তলার উপযোগী করে তুললেন। নাম দিলেন 'সরোজিনী'। তাঁর বিখ্যাত মঞ্চসকল নাটক নামানুসারে 'সরোজিনী'র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জাহাজটির নাম রাখা হয় 'সরোজিনী' (এখানে এ প্রসঙ্গে বলা রাখা দরকার, স্বদেশপ্রাণ পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরও 'ইন্ডিয়া' নামের একটি জাহাজ এর মালিক ছিলেন।) খুলনা থেকে বরিশাল 'সরোজিনী'র যাত্রাপথ নির্ধারিত হল। ঠিক এমন সময় ব্রিটিশ কোম্পানি ফ্লোটিলা তার জাহাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা শুরু করল ঐ একই যাত্রাপথে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকেই একশ্রেণির মানুষের মধ্যে স্বদেশচেতনার উন্মেষ ঘটে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের কারণে, "একখানি মাত্র স্টিমার লইয়া কার্যে অসুবিধা হওয়ায় আমি আরও চারিখান জাহাজ ক্রমে ক্রমে ক্রয় করিলাম। এ জাহাজগুলির নাম ছিল বঙ্গলক্ষ্মী, স্বদেশী, ভারত এবং লর্ডরিপন।"[১৮]

দেশীয় ছাত্রদের উৎসাহের সীমা ছিল না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জাহাজগুলির নামে যে স্বদেশ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, সেই মূর্তির প্রেরণায় দেশীয়রা দেশীয় জাহাজের যাত্রী আনার ব্যবস্থা করে। "পাছে আমাদের জাহাজে লোক না গিয়ে প্রতিপক্ষের জাহাজে যায়, এইজন্য কতকগুলি ভদ্রলোক ও স্কুলের ছাত্র রাত্রি ৪টার সময় উঠে দলবন্ধ হয়ে উৎসাহের সহিত জাহাজের ঘাটে প্রত্যহ উপস্থিত হন ও যদি কোনও যাত্রী প্রতিপক্ষের জাহাজে যেতে চায়, তাহাকে অনেক প্রকারে বুঝিয়ে এমন কি পায়ে পর্যন্ত ধরে ফিরিয়ে আনেন। যেখানে জালি বোটে করে প্রতিপক্ষের জাহাজে লোক উঠ্‌ছে, সেখান পর্যন্ত গিয়ে তাদের এইরূপ বুঝাতে থাকেন : 'আমাদের কথাটি একবার শুনুন্ তারপর যে জাহাজে ইচ্ছা হয় যাবেন। আপনারা বাঙালি, বাঙালির জাহাজ থাক্‌তে কেন আপনারা ইংরাজদিগের জাহাজে যাবেন? দেশের টাকা দেশে থাকে এটা কি প্রার্থনীয় নয়? প্রতিপক্ষের জাহাজে স্বদেশীয়দিগের প্রতি কুব্যবহার করা হ'ত, অপমান করা হ'ত – আমাদের নিমন্ত্রণেই, আমাদের অহ্বানেই ঠাকুরবাবুরা তাই এখানে জাহাজ এনেছেন – তখন কি আপনাদের ও জাহাজে যাওয়া উচিত?' 'হাঁ বটে, যা বল্লে তার উত্তর নাই, চলো ঐ জাহাজেই যাওয়া থাক।' এই বলে যাত্রীরা আবার আমাদের জাহাজে অনেকে ফিরে আসেন। একটি বারো-বৎসর বয়স্ক বালক ঘাটে সেদিন বক্তৃতা দিয়াছিল :–'হে ভাই সকল, তোমার আপনার জাহাজ থাক্‌তে পরের জাহাজে যাইবা না। উহাদের ঐ যে জাহাজ দেখিতেছ – উহার যেরূপ গঠন তাহাতে একটু বেশি বাতাস উঠিলেই দোদুল্যমান হইয়া জলগর্ভে নিমগ্ন হইবে। তাহার সাক্ষী দেখ উহারা এখানে জাহাজ রাখিতে পারে নাই, ওপারে লইয়া গিয়াছে এবং সে বাতাসে দোদুল্যমান হইতেছে। যদি তোমরা প্রাণ বাঁচাইতে চাও ত' ভাই সকল ঐ জাহাজে যাইবা না।' –এই কথা শুনে নিচুশ্রেণী লোকদের ভয় হল –আর প্রতিপক্ষের জাহাজে তারা গেল না। ঝড় হোক্– বৃষ্টি হোক্– রৌদ্র হোক্– যে কোনও বাধা হোক্, কিছুই না মেনে তাঁহারা জাহাজের সিটি (বাঁশির ডাক) শুনবামাত্র দৌড়ে ঘাটে এসে উপস্থিত হন্। তাঁহারা বলেন, আমাদের জাহাজের সিটি তাঁহাদের এমন মিষ্টি লাগে ও তা শুন্‌তে পেলে তাঁদের এমন আহ্লাদ হয় যে তাহা বল্‌বার নয়। বন্ধুদের সুপরিচিত গলার স্বর দূর হতে শুন্‌লে যেমন বুঝা যায় কে-আস্‌চে, তেমনি সিটি শুনলেই কোন জাহাজ আস্‌চে তাঁরা বুঝতে পারেন। ঐ আজ 'ভারত' আসচে, ঐ 'লর্ড রিপন' আসচে, ঐ 'বঙ্গলক্ষ্মী' আসচে, ঐ 'স্বদেশী'

আসচে, ঐ 'সরোজিনী' আস্‌চে – এই বলে সকলে উৎসাহের সহিত হাস্যমুখে দলবন্ধ হয়ে ঘাটে এসে উপস্থিত হন। সেদিন একজন বল্‌ছিলেন, 'যেমন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে হৃদয় আকৃষ্ট হত, সেইরূপ তাঁদেরও হৃদয় আকৃষ্ট হয়।' আবার প্রতিপক্ষের জাহাজের নাম পর্যন্ত তাঁরা সইতে পারেন না – তার সিটি তাঁহাদের কানে অত্যন্ত কর্কশ লাগে। প্রতিপক্ষের জাহাজ যদি কোনও দিন যাত্রী পায় – সেদিন তাঁদের আর আপ্‌সোসের সীমা থাকে না।''[১৯]

এই জাহাজী ব্যাবসাকে অবলম্বন করে দেশের বুকে জাতীয় চেতনার বন্যা বয়ে যায়। ফ্লোটিলা কোম্পানির ভাড়া কমিয়ে যাত্রী পরিষেবা দিতে থাকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও পাল্লা দিয়ে ভাড়া কমাতে থাকেন। অর্থাৎ ইংরেজদের সঙ্গে যেন আসল প্রতিযোগিতায় নিজেকে কোনোভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চান না। এই মানসিকতার মধ্যে তার স্বদেশ প্রেমেরই পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে তার এই জাহাজী ব্যাবসায়ী দেশীয় মানুষজন এতই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাতে চরম তৃপ্ত হন। একটি বর্ণনায় তিনি বলেছেন –

''সেদিন এখানে জাতীয় সংকীর্তন হয়েছিল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' অঙ্কিত নিশান হাতে নিয়ে, খোল-করতাল বাজাতে বাজাতে বাহু তুলে উৎসাহের সহিত গান করতে করতে সংকীর্তনের দল ' – ' বাবুর বাড়ি থেকে বৈকালে বেরুলেন্ – যেতে যেতে রাস্তায় লোকের ভিড় বাড়তে লাগল – তারপর বাজারে পৌঁছিলে লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌ল। প্রথমে লোকেরা মনে করেছিল, বুঝি কোনও ধর্মসম্প্রদায়ের সংকীর্তন, আই অ (অশিনী কুমার দত্ত ?) –বাবু একাট টুলের উপর দাঁড়িয়ে এ কীর্তনের উদ্দেশ্য অল্পকথায় ও সহজ ভাষায় বেশ বুঝিয়ে দিলেন – তাতে লোকেরা বেশ বুঝতে পারলেও উৎসাহের সঙ্গে সংকীর্তনে সবাই যোগ দিলে।

নগর-সংকীর্তনে যে কি মাতানো ভাব আমি সেদিন বেশ বুঝতে পারলেন। এইরূপ জাতীয় সংকীর্তন যদি নগরে নগরে গ্রাম গ্রামে গাওয়া হয় তা হলে বড়োই উপকার হয়। সাধারণের মধ্যে জাতীয় ভাবপ্রচারের ভালো উপায় এর চেয়ে আর কিছুই নেই। যে গানটা গাওয়া হয়েছিল সেটা নিম্নে লিখে দিলাম। এই গানটায় লোকেরা যে কি-রকম মেতে উঠেছিল, সুর না শুনলে শুধু কথায় তা বোঝা যাবে না।''[২০]

স্বদেশবাসীকে সেই উন্মাদনায় পরিপূর্ণ রাখতেই হয়ত তিনি এই ব্যবসাতে ক্ষতি স্বীকার করেও পিছপা হন নি। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতিতে' বলেছেন,

'এক দিকে বিলাতি কোম্পানি আর এক দিকে তিনি একলা– এই দুই পক্ষে বাণিজ্য-নৌযুদ্ধ ক্রমশই কিরূপ প্রচণ্ড হইয়া উঠিল তাহা খুলনা বরিশালের লোকেরা এখনো বোধ করি স্মরণ করিতে পারিবেন। প্রতিযোগিতার তাড়নায় জাহাজের পর জাহাজ তৈরি হইল, ক্ষতির পর ক্ষতি বাড়িতে লাগিল, এবং আয়ের অঙ্ক ক্রমশই ক্ষীণ হইত হইতে টিকিটের মূল্যের উপসর্গটা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল – বরিশাল-খুলনার স্টীমার-লাইনে সত্যযুগ আবির্ভাবের উপক্রম হইল। যাত্রীরা যে কেবল বিনা ভাড়ায় যাতায়াত শুরু করিল তাহা নহে, তাহারা বিনা মূল্যে মিষ্টান্ন খাইতে আরম্ভ করিল। ইহার

উপরে বরিশালের ভলন্টিয়ারের দল স্বদেশী কীর্তন গাহিয়া কোমর বাঁধিয়া যাত্রীসংগ্রহে লাগিয়া গেল, সুতরাং জাহাজে যাত্রীর অভাব হইল না কিন্তু আর সকলপ্রকার অভাবই বাড়িল বৈ কমিল না। অঙ্ক শাস্ত্রের মধ্যে স্বদেশহিতৈষিতার উৎসাহ প্রবেশ করিবার পথ পায় না ; কীর্তন যতই জমুক, উত্তেজনা যতই বাড়ুক, গণিত আপনার নামতা ভুলিতে পারিল না – সুতরাং তিন-ত্রিক্খে নয় ঠিক তালে তালে ফড়িঙের মতো লাফ দিতে দিতে ঋণের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।"[২১]

এমন সময় খুলনা থেকে ফরার পথে 'স্বদেশী' গঙ্গা গর্ভে তালিয়ে গেল। মাল বোঝাই জাহাজের নিমজ্জনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হতাশায় ভেঙে পড়েন। শেষে রাজা প্যারিমোহন বসুর পরামর্শ মতে চারখানা জাহাজ ক্লোটিলা কোম্পানিকে বিক্রি করে দিলেন। তবুও ঋণ জাল থেকে তিনি বের হতে পারলেন না। স্বদেশ উন্মাদনার বশেই তিনি এ জাহাজী ব্যবসাকে টিকিয়ে রাখতে চাইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা রাখতে পারলেন না। বাংলাদেশের নদীতে স্বদেশী ভাবধারাকে বয়ে দিতে গিয়ে তিনি নিঃস্ব হয়ে রাচি চলে গেলেন।[২২] 'সরোজিনী' জাহাজে ভ্রমণকালে জাহাজে বসেই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'সরোজিনী প্রয়ান'। এখানে তিনি বলেন, "এই যে সব গঙ্গার ছবি আমার মনে উঠিতেছে, এ কি সমস্তই এইবার কার স্টীমার যাত্রার ফল ? তাহা নহে। এসব কত দিনকরে কত ছবি, মনের মধ্যে আঁকা রহিয়াছে। ইহারা বড়ো সুখের ছবি, আজ ইহাদের চারিদিকে অশ্রুজলের স্ফটিক দিয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছি। এমনতরো শোভা আর এ জন্মে দেখিতে পাইব না।"[২৩]

স্বদেশ ভাবনার আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আবাল্য স্বদেশ মাতার গৌরবকে উজ্জ্বল করতে চেয়েছেন। লাভের হিসাব নিকাশ অপেক্ষা নতুন নতুন আবেগ ও উন্মাদনায় দেশের মানুষের কাছে স্বদেশ সম্পর্কে একটি বোধ তিনি গড়ে দিতে যে পেরেছিলেন তা জানা যায় ১২৯১ এর ৬ ফাল্গুনে লেখা একটি পত্র থেকে – "লর্ড রিপণ নামক জাহাজ খুলনা হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত একদিন অন্তর যাতায়াত করিতেছে। ... বরিশাল ও খুলনা অঞ্চল নিবাসী লোকের স্বদেশের উপর এবং স্বদেশীয় অনুষ্ঠানের উপর যেরূপ আন্তরিক টান দেখিলাম তাহাতে চমৎকৃত হইয়াছি। একদিন দৈববশতঃ বাগেরহাটে লর্ড রিপণ পৌঁছিতে এক ঘন্টা বিলম্ব হয়। সেদিন বাদলার দিন। ফ্লাটিলা কোম্পানীর জাহাজ সময় মত পৌঁছিলে যাত্রীগণের একপ্রাণীও তাহাতে না গিয়ে সমস্তক্ষণ বৃষ্টিতে ভিজিয়া লর্ড রিপণ জাহাজের প্রতীক্ষায় ঘাটে দণ্ডায়মান ছিলেন। লর্ড বিবরণ পৌঁছিলে উৎসাহের সহিত তাঁহারা তাহাতে উঠিলেন। ...এরূপ চমৎকার কাণ্ড, এরূপ একতা, এরূপ জাতীয় অনুরাগ বোধ হয় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইত।...এক্ষণে আমি তাঁহাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ভারত নামক আর একখানি জাহাজ সত্বর খুলনায় পাঠাইবার সংকল্প করিয়াছি। সর্বসাধারণকে জানান যাইতেছে আগামী সোমবার (১৩ ফাল্গুন ১২৯১, [23 Feb 1885]) হইতে 'ভারত' ও 'ভারত বন্ধু রিপণ' উভয়ে মিলিয়া প্রতিদিন তাঁহাদের কাজে নিযুক্ত থাকিবেন।"[২৪]

স্বদেশপ্রেমি এই যুবক জীবনের বেশিরভাগ সময়ই স্বদেশচিন্তায় নিজেকে নিমগ্ন রেখেছেন। এরই মাঝে রচনা করেছেন স্বদেশ প্রীতিমূলক নাটকসমূহ। হিন্দুমেলার প্রত্যক্ষ যোগে তাঁর মনে স্বজাতি প্রীতি জন্ম নেয়। '.... হিন্দু মেলার পর হইতে বলই আমার মনে হইত – কি উপায়ে দেশের

প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব গাথা ও ভারতের গৌরব কাহিনী কীর্তন করিলে হয়তো কতকটা উদ্দেশ্য সিন্ধ হইলেও হইতে পারে।"[২৫] তাই নাটক রচনার মধ্য দিয়ে তিনি সেই স্বদেশপ্রীতিকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। অনেকেই তার নাটকগুলি সাম্প্রদায়িক বলে মনে করেন, কিন্তু তা ঠিক নয়। লেখক আদি ব্রাহ্মসমাজ, হিন্দুমেলার সংস্পর্শে এলে হয়ত হিন্দুত্ব বোধ তার ছিল। কিন্তু তার এই উক্তির পর নাটকগুলিকে সেই দোষে দুষ্ট বলা পায় না। ইতিহাসের বীর কাহিনিই ছিল তার স্বদেশপ্রেম আনার একমাত্র লক্ষ্য। বিদেশি ইংরেজদের আলোকে মুসলমান শাসকদের তিনি অঙ্কন করেছেন। তা না হলে আমরা দেখলাম 'সঞ্জীবনী সভা'তে উগ্র হিন্দুত্ববাদের পরিবর্তে জাতিধর্ম নির্বিশেষে একত্র আহারে প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে কীভাবে। আসলে ইতিহাস থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে গিয়ে নাট্যকাহিনি এমন গতি পেয়েছে। ভারতীয়দের হাতে নিরেট ইতিহাস তো একমাত্র মুসলমান শাসকদের। তার পূর্বের কোনো ইতিহাস যা ভারবর্ষকে দীর্ঘদিন ধরে অবদমিত করে রেখেছে তা পাওয়া যায় না। তাই মুসলমান শাসক তাঁর নাটকে জাতি শত্রু হিসাবে আসেনি। এসেছে বিদেশি শাসক হিসাবে। সেই সূত্রে ইংরেজরাও বিদেশি শাসক ছাড়া আর কিছু ছিল না।

২০০১, ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রশান্ত কুমার পাল 'পরিচয়' এ লেখেন, "জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। তাঁর অনেক কর্মপ্রচেষ্টা দেশের প্রতি ভালোবাসা থেকে সঞ্জাত। জোড়াসাঁকো নাট্যশালা, হিন্দুমেলা, দেশাত্মবোধক নাটক ও প্রহসন রচনা, সঞ্জীবনী সভা, সারস্বত সমাজ, ভারত সঙ্গীত সমাজ প্রতিষ্ঠা ও স্বদেশী জাহাজ কোম্পানি পরিচালনা এবং আরও বহুবিধ গঠনমূলক কার্যাবলি এই দেশেপ্রেমেরই বিচিত্র প্রকাশ। ফরাসি, সংস্কৃত ও মারাঠি সাহিত্যের কিছু মূল্যবান নিদর্শনের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় স্থাপনের মূল্য কম নয়। উল্লেখ্য, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটক গুজরাটি ও মারাঠি ভাষায় অনুদিত হয়েছিল।"[২৬]

স্বদেশীভাব জাগ্রত করার আশাতেই তিনি যে নাটক রচনা করেন তাতে ইতিহাসের নানান উপাদানকে নিজের প্রয়োজন মতো ব্যবহার করেন। তিনি যে ভাব ও ভাষায় স্বদেশীভাব জাগ্রত করলেন বাংলা নাট্য সাহিত্যে তা প্রথম। সংস্কৃত প্রভাবকে একপ্রকার বিদায় দিয়ে, ইতিহাসের কঠোর সত্যকে কিছুটা উপেক্ষা করে বাঙালির মতো করে – পাত্র-পাত্রীদের চেনা মানুষের [২৭] রূপ দেন। সেকারণে বাংলাদেশে তা অধিকমাত্রায় জনপ্রিয়তা অর্জন করে [২৮] এবং বর্তমানে আমরা স্বাধীনতার আরাম শয্যার যে শয়ন করছি, সেখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার চিহ্ন রয়ে গেছে। "দেশের এই যে জাতীয় আন্দোলন – যার ফলে পরাধীন ভারতবর্ষ বর্তমানে স্বাধীনতা অর্জন করেছে – তার মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দানের কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। তাঁর বিবিধ কর্মোদ্যোগের মধ্যে এই আন্দোলনের বীজ নিহিত আছে – তাঁর স্বদেশী স্টীমার চালনার উদ্যোগ, স্বদেশী দিয়াশলাই প্রস্তুতের কাজ, পাট ও নীলের ব্যবসায়ে, হিন্দুমেলায় তাঁর কর্মোদ্যমে এবং তাঁর রচিত সংগীতে এবং নাটকাবলীতে।"[২৯]

উল্লেখ্য যে বাংলা নাট্য সাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রবেশ 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে অভিনয়ের

মাধ্যমে। গোপাল উড়ের যাত্রা শুনে তিনি নিজবাড়িতে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সংকল্প নেন। কৃষ্ণকুমারীর কিছুদিন পরে 'একেই কি বলে সভ্যতা'তে তিনি অভিনয় করেন। এরপর দেশীয় নাট্যকারদের উৎসাহ দান করার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে সমাজ সমস্যা মূলক নাটক রচনার প্রেরণা দেন। এখানে ও নাট্যকারের স্বদেশচেতনা চোখে পড়ার মতো। ১৮৬৫ এর ১৫ জুলাই 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রে হিন্দুনারীর দুরবস্থা এবং পল্লীগ্রামের জমিদারের অত্যাচার বিষয়ক নাটক লেখার বিজ্ঞাপন [৩০] দেন।

১৮৬৭ সালের জানুয়ারি মাসে মধ্যে প্রাপ্ত নাটক অভিনীত হয়। বিদ্যাসাগর, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রমুখের সংস্পর্শে সমাজভাবনার চরম রূপ প্রদর্শিত হয়। এর কিছুদিন পর 'হিন্দুমেলা'র উদ্বোধন হয়। ক্রমে সেখানে নাট্যকারের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়। সেখানে নাট্যকারের সমাজচিন্তা-স্বদেশচিন্তা বিকশিত হয়। নানান নাটক রচনার মধ্য দিয়ে তার স্ফুরণ দেখি। অর্থাৎ নাট্যকারের উদ্বোধন জাতীয়চেতনার বৃহৎ স্পর্শে। স্বদেশপ্রীতিই তার মূল সুর। তাঁর জীবনচর্চা, জীবনকর্মের প্রতিটিতে স্বদেশ আত্মার অনুভব স্পষ্ট। তাঁর সাহিত্যকর্মে, ব্যক্তিগত কর্মে, পারিবারিক জীবনে স্বদেশপ্রেমেই যার মূল বাণী এহেন নাট্যকারের নাটকের বিষয়বস্তু যে উন্নত স্বদেশচিন্তা নিয়ে উপস্থিত হবে তা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। "একটি পরাধীন দেশের নাগরিকের মর্ম বেদনা তিনি অন্তরাত্মা দিয়ে অনুভব করেছেন, তাঁর হৃদয়ের বেদনার সেই প্রতিধ্বনি তাঁর রচিত মৌলিক নাটকাবলীর মধ্যেও অনুরণিত। বিদেশীর আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা করার জন্য যে আকাঙ্খা তাঁর ছিল, সেই আকাঙ্খা দেশের জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত করার জন্যে ঐতিহাসিক নাটক লিখে দেশের মানুষের সম্মুখে তা উপস্থাপিত করেন।" [৩১] তাঁর মৌলিক নাটক পাই দশটি। তার মধ্যে স্বদেশচেতনামূলক ঐতিহাসিক নাটকের সংখ্যা চার – সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ (১৮৭৪), পুরুবিক্রম (১৮৭৫), অশ্রুমতী (১৮৭৯), এবং 'স্বপ্নময়ী' (১৮৮২)। গবেষণার পরিধিও বিষয়ের কথা বিবেচনা করে এগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি নাটকের বিশ্লেষণ করে আমরা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে স্বদেশভাবনার একটা রূপরেখা টানার চেষ্টা করব।

সুতরাং বলা যায়, ঠাকুর বাড়ির স্বদেশি পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা নাট্যকার স্বদেশভাবনাকে কেবল মননে পোষণ করেন নি। প্রখ্যাত স্বদেশহিতৈষী রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র প্রমুখ মানুষের সংস্পর্শে এসে তার বিকশ ঘটান। গানের সুরে, ছবির টানে তাঁর স্বদেশচেতনা যেমন ফুটে উঠেছে। তেমনি দেশীয় শিল্প, বাণিজ্যের প্রতি আগ্রহে তার চরম পরিণতি পেয়েছে। 'সঞ্জীবনী সভা' সে স্বদেশভাবনার রসদ যুগিয়েছে পূর্ণ মাত্রায়। নানা প্রচেষ্টায় বার বার ব্যর্থ হলেও নাট্যকারকে কখনও হতোদ্যম হতে দেখিনি। জাহাজি ব্যবসার পর রাঁচি যাত্রার পরও নিজেক সর্বদা স্বদেশের মঙ্গল চিন্তায় মগ্ন থেকেছেন। এমন নাট্যকারের নাটকে স্বদেশচেতনা যে আসবেই তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বদেশপ্রেমী বিপ্লবী বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে নাট্যকারের পত্রালাপ নাট্যকারের স্বদেশ বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধাকে নির্দেশ করে। যিনি দেশের কথা ভাবেন, যিনি দেশোদ্ধারের কথা ভাবেন, তিনিই নাট্যকারের 'আইকন' (প্রতাপসিংহ থেকে শুরু করে তিলক পর্যন্ত)। তাই তিলকের অনুরোধে নাট্যকার গীতা রহস্যের বঙ্গানুবাদ [৩২] করেন। কিন্তু নাট্যকারেরতা সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই

তিলকের দেহত্যাগ[৩৩] হওয়ায় নাট্যকার খুবই মর্মাহত হন। যাই হোক তাঁর রচিত নাটকগুলি বিচারের সময় এ সকল অনুসঙ্গ সহায়ক হবে তা বলা যায়। আমাদের আলোচ্য তিনখানি নাটক এর মধ্যে নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন এর পূর্বে দু'খানি ও পরে এক'খানি রচিত হলেও স্বদেশমাত্রা জাগ্রত করতে সে আইন কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি নাট্যকারের মননে। সফল অভিনয়ে তৎকালীন সময়ে তিনি স্বদেশীয়দের মধ্যে স্বদেশভাবনা কীভাবে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন, তা কতটা সার্থক হয়েছিল তা বিশ্লেষণের দ্বারা দেখানো হবে।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ ঃ

১. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু (স), 'সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান', কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১৮৫

২. প্রশান্ত কুমার পাল, 'রবিজীবনী' (১ম), কলকাতা, ১৪১৪, কলকাতা, পৃ. ৬৮-৬৯

৩. ঐ, পৃ. ৬৯

৪. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি', কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৪২

৫. সুশীল রায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ', কলকাতা, ১৯৬৩, কলকাতা, পৃ. ৫৪

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনস্মৃতি', ১৩৮০, কলকাতা, পৃ. ৮৬

৭. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি', কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৪৩

৮. প্রশান্তকুমার পাল, রবিজীবনী' (১ম), কলকাতা, ১৪১৪, পৃ. ৮৪

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনস্মৃতি', ১৩৮০, কলকাতা, পৃ. ৮৭-৮৮

১০. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্র জীবনকথা', কলকাতা, ১৪০৭, পৃ. ১৩

১১. বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি', কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৫৫

১২. প্রশান্ত কুমার পাল, 'রবিজীবনী' (১ম), কলকাতা, ১৪০৭, পৃ. ২৪২

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি, কলকাতা, ১৩৮০, পৃ. ৮৮

১৪. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি', কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৫৬

১৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনস্মৃতি', কলকাতা, ১৩৮০, পৃ. ৯০

১৬. বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি', কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৫৭

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনস্মৃতি', কলকাতা, ১৩৮০, পৃ. ১৫০

১৮. বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি', কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৬৪

১৯. ঐ, পৃ. ৬৫

২০. ঐ, পৃ. ৬৬

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনস্মৃতি', কলকাতা, ১৩৮০, পৃ. ১৫০-১৫১

২২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছেলেবেলা', কলকাতা, ১৪০৫, পৃ. ৬৭

২৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিচিত্র প্রবন্ধ', কলকাতা, ১৪০১, পৃ. ১৭

২৪. প্রশান্ত কুমার পাল, 'রবিজীবনী' (৩য়), কলকাতা, ১৩৯৪, পৃ. ৩৪

২৫. বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি', কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৪৬

২৬. ঐ, পৃ. ১০২

২৭. অজিত কুমার ঘোষ, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৩৪

২৮. সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ৩য় খণ্ডের (১৪০৫) ৬৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন, 'নাট্য রচনায় নাট্যাভিনয়ে সঙ্গীতে চিত্রকলার এবং সচেষ্ট দেশ হিতৈষীতায় তিনি অসামান্যতা দেখাইয়াছেন।'

২৯. সুশীল রায় 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ', কলকাতা, ১৯৩৬, পৃ. ১৩৮

৩০. ইণ্ডিয়ান মিরর, ১৫ই জুলাই, ১৮৬৫, দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', পৃ.

৩১. সুশীল রায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ', কোলকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ১৬৭

৩২. ১৯১৭, ২০শে ডিসেম্বর পুনা থেকে বালগঙ্গাধর তিলক জ্যোতিরিন্দ্রকে এপত্রে লেখেন, "আগামী কংগ্রেসের জন্য আগামী ২৬শে হইতে ৩০শে পর্যন্ত কলিকাতায় থাকিব। তখন আপনার কোনও প্রতিনিধির সহিত গীতারহস্যের বঙ্গানুবাদ সম্বন্ধে কথাবার্তা হইতে পারে ... আপনার কোনও প্রতিনিধি বা বন্ধুকে আমার সহিত কলিকাতায় সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া বাধিত করিবেন।" দ্র. সুশীল রায় 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ', কলকাতা, ১৯৩৬, পৃ. ২২৬

৩৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থের ২২৪ পৃষ্ঠায় অনুবাদকের ভূমিকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বয়ং একথা স্বীকার করেন, "... কেবল একটা আক্ষেপ রহিয়া গেল– এই অনুবাদ গ্রন্থখানি মহাত্মা তিলকের করকলমোস্বহস্তে সমর্পণ করিতে পারিলাম না। তাহার পূর্বেই তিনি ভারতবাসীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া দিব্যধামে চলিয়া গেলেন।"

স্বদেশপ্রেমের সংঘাতে ব্যক্তি-প্রেমের বিবর্তন ঃ পুরু বিক্রম

পুরু বিক্রম নাটকটি পাঁচটি অঙ্কে নয়টি গর্ভাঙ্কে বিন্যস্ত। তার মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে কোনো গর্ভাঙ্কভাগ নেই। এ নাটকের প্রতিটি ছত্রে আছে দেশের প্রতি ভালবাসা। নাটকটির রচনাকাল ১৮৭৪, ভারতবাসী তথা বাঙালির ইংরেজদের প্রতি মোহমুক্তির যুগ। ইংরেজদের প্রকৃত উদ্দেশ্য শিক্ষিত বাঙালিরা বুঝতে পেরেছেন। অশিক্ষিত, সাধারণ মানুষকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বরূপ উন্মোচনের জন্য নাট্যকার অপূর্ব কৌশল অবলম্বন করেছেন। যা তার ঐতিহাসিক নাটক তথা স্বদেশভক্তির নাটকের আলাদা বৈশিষ্ট্য হিসাবে সূচিত হয়েছে।

নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে আমজনতাকে সজাগ করার জন্যই তিনি বেছে নিয়েছেন প্রেমের রসঘন প্রেক্ষাপটে স্বদেশচেতনা। এ নাটকে ইংরেজ প্রতিভূ যবনরাজ সেকেন্দার শাহ। নিজ ক্ষমতাও অমিত শক্তির আধারে ভারতবর্ষকে পদানত করতে চেয়েছে। আর তার বিরুদ্ধে স্বদেশপ্রেমী ভারতবাসী হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন পুরুরাজকে। স্বদেশচেতনায় উজ্জ্বল পুরুরাজের চরিত্রাঙ্কনে দর্শকমনে স্বদেশপ্রেমকে আনার চেষ্টা করেছেন। আর সেকেন্দার শাহের প্রতাপ ও পুরুরাজের একাগ্রতাকে যুক্ত করেছেন প্রণয় সম্পর্কের টানাপোড়নের মধ্য দিয়ে। একশ্রেণির দেশীয় রাজন্যবর্গের বিদেশি শক্তিকে ভিতরে ভিতরে বলশালী করেছে আত্মস্বার্থরক্ষায় তাদের প্রতিনিধি তক্ষশীল। অর্থাৎ একদিকে যবনরাজ সেকেন্দারশাহ অন্যদিকে পুরুরাজ। আর কাহিনিকে মনোগ্রাহী করেছে ঐলবিলা ও পুরুর প্রণয়। এ প্রসঙ্গে এও বলা যায়, ঐলবিলা মাতৃশক্তিতে পূর্ণ ভারতীয় নারী, যে ভারতবর্ষের নারীসমাজকে জাগ্রত করতে সাহায্য করেছে।

ঐল্যবিলাকে পাওয়ার বাসনায় পাঞ্জাবের নরপতি দেশের প্রতি কর্তব্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে অত্যাচারী শক্তির সঙ্গে আঁতাত করেছে। সেকেন্দার শাহের বীর্যবত্তায় আকৃষ্ট অম্বালিকা মোহিত হয়ে নিজের ধ্বংস ডেকে এনেছে। যদি প্রতিপক্ষকে চিত্রে দেখানো যায় তাহলে চিত্রটি এমন হবে –

<u>বিদেশি শক্তি</u>   <u>দেশীয় শক্তি</u>

সেকেন্দার শাহ ←——→ পুরু ও ঐলবিলা

↓ সহায়ক শক্তি

তক্ষশীল ও অম্বালিকা

আবার এই প্রতিপক্ষের অন্তরে প্রেমের যে ফল্গু ধারা তার চিত্রটি হল –

দেশীয় শক্তি ঃ পুরু ←——→ ঐলবিলা ←—— তক্ষশীল/অম্বালিকা

↓

বিদেশি শক্তি ঃ সেকেন্দার শাহ

অর্থাৎ দেশীয় রাজন্যবর্গ নিজেদের প্রণয়াস্পদকে পাওয়ার যেমন তীব্র লড়াই তেমনি বিদেশি শক্তিকে পাওয়ার জন্য দেশীয় রাজকন্যার তীব্র আকাঙ্খা। অথচ বিদেশি শক্তি সেকেন্দার শাহ সেই তীব্রতা অপেক্ষা রাজ্যবিস্তারের আকাঙ্খা অনেক বেশি।

প্রেমের এই অভিনব বন্ধনে অঙ্কিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম। নাটকের প্রতিটি অঙ্ক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় স্বদেশ প্রেমের কাছে মানবপ্রেমের স্থান বা স্বদেশপ্রেম কাছাকাছি আনে দুটি মানব-মানবীর প্রেম। বিদেশি শক্তির অবসানে প্রেমের মাধুর্য চরম রূপ পায়। দর্শকমনে প্রেমের কাহিনি যেমন একদিকে আনন্দ দেয়, অন্যদিকে তাদের মাতৃভূমির গৌরব রক্ষায় বীরত্ব দর্শককে স্বদেশচেতনায় উজ্জ্বল করে।

কল্লুপর্বতের রানি ঐলবিলা স্বদেশপ্রেমে এক আত্মনিবেদিত প্রাণ। যে দেশের জন্য বীরত্ব দেখায়, যে দেশের কথা ভাবে সেই রানির প্রিয় পাত্র। তাই নাটকের শুরুতেই দেখি পাঞ্জাব প্রদেশে যাওয়ার তাঁর তীব্র আকাঙ্খা। সেখানকার রাজাদের উত্তেজিত পূর্বেও করেছেন আবারও করতে চান। কারণ তিনি বলেছেন, 'যতদিন না যবনেরা আমাদের প্রিয় জন্মভূমি হতে একেবারে দূরীভূত হচ্ছে ততদিন আমার আর আরাম নেই বিশ্রাম নেই।' রানির প্রেম লাভ করার জন্য প্রদেশের রাজারা যে একত্র হবেন, এ বিশ্বাস রানির আছে। তবে রানি স্বীয়সার্থে ধনমান প্রাচুর্যে নয়, যে বীর মাতৃভূমির সম্মান রক্ষার জন্য আত্মনিবেদিত প্রাণ, তেমন বীরকেই তিনি গ্রহণ করবেন। পুরুরাজ যে সেই বীরদের অন্যতম তা রানি বিলক্ষণ জানেন। তাই বলেন, 'তার মতো বীরপুরুষ ভারতভূমিতে আর দ্বিতীয় নাই। আমি যে রূপ প্রতিজ্ঞা করেছি, তাতে আমার আন্তরিক প্রেমের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হবেনা, অথচ এতে সমস্ত রাজকুমারগণ উৎসাহিত হয়ে, মাতৃভূমির রক্ষার জন্য একত্রিত হবেন।' অর্থাৎ রানির 'প্রেম' স্বদেশপ্রেম হোক ; ব্যক্তিপ্রেমই হোক তার আধার দেশমাতৃকতার শৃঙ্খলমুক্তি। এহেন নারী হয়ে উঠেছে এ নাটকের চরিত্রগুলির চালিকা শক্তি।

প্রথম অঙ্কেই একজন গায়িকার প্রতি তার বিনম্র শ্রদ্ধা তার মাতৃপ্রেমকে আরও স্পষ্ট করে। গান প্রসঙ্গে পরে তার সবিস্তার আলোচনা হবে। নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যটির মধ্যেই নিহিত নাটকের গতিপথ। ঐলবিলার প্রেরণায় উদ্দীপ্ত তক্ষশীল সেকেন্দার শাহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু বোন অম্বালিকা তার ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা সিদ্ধি করতে এহেন একজন বীরকে সরে আসার জন্য প্ররোচিত করতে থাকে। সেকেন্দারের বীর্যবত্তা, সাহসের কাছে পুরুরাজের বীরত্ব যে তুচ্ছ তা তুলে ধরে। তাই দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচন এর উদ্যোগকে অম্বালিকা বলে, '... কেন নিরর্থক বিপদকে আহ্বান করছেন ?' কিন্তু প্রত্যুত্তরে বীরদীপ্ত কন্ঠে ভারতের যোগ্য সন্তান তক্ষশীল বলেন, 'আমি কি স্বহস্তে ভারতবাসীদিগের জন্য অধীনতা শৃঙ্খল নির্মাণ করব ?' স্পষ্ট ভাষায় সেও জানায় দেশমাতৃকা উদ্ধার করতে সে বদ্ধ পরিকর। কোনোভাবেই বিদেশি শক্তির কাছে পদানত তারা হবেনা।

তক্ষশীলের চরিত্রাঙ্কনে নাট্যকার যে দোলাচলতাকে প্রদর্শন করেছেন তা তৎকালীন ভারতের প্রাদেশিক রাজণ্যবর্গের রূপমাত্র। এরাই পরিবর্তীত হয়ে বিষাক্ত হয়ে ওঠে, এরাই স্বদেশপ্রেমের পথ

ধরে স্বদেশকে তুলে দেয় অন্যের হাতে। আর এই অন্যায় বোধ দর্শককে স্বাদেশিকতা বোধে উন্নীত করে। দর্শক ন্যায়-অন্যায় বোধে উদ্বুদ্ধ হয়।

নাছোড়বান্দা অম্বালিকা কিন্তু আপন ভ্রাতাকে বিদেশি অমিত শক্তির কাছে আত্মসমর্পন করাতে পারেনা। তাই ছলে-বলে ভ্রাতাকে সংকল্প থেকে সরাতে চায়। দেশীয় রাজ্যকন্যার এহেন আচরণ দেশের কালিমাস্বরূপ হয়ে প্রতিভাত হয়। অম্বালিকা জানায় সেকেন্দারের মতো বীর কেবলমাত্র তক্ষশীলের বন্ধুত্ব চাই। এ যেন তার পরম সৌভাগ্য। এ প্রসঙ্গে অম্বালিকার নীচতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা প্রকাশ পায়। 'তিনি (সেকেন্দার) এই মনে করেছেন যে, যদি আপনি এই যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করেন, তা হলে, তিনি অনায়াসে আর সকলের উপর জয়লাভ করতে সমর্থ হবে।' বা 'তাঁর বজ্র উদ্যত হয়ে রয়েছে, আর একটু পরেই নিপাতিত হয়ে ভারতভূমিকে বিদীর্ণ করবে।' নাট্যকার এই চরিত্রের মুখ দিয়ে এমন সব সংলাপ বালিয়েছেন যে জনজাগরণের মন্ত্র হিসাবে কাজ করেছে। দর্শক স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

আসলে সেকেন্দারের প্রতি অম্বালিকার যে প্রণয়মোহ তাতেই সে এ ধরণের হীন কাজ করতে সমর্থ হচ্ছে। কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ে পুর্ণ বীরের মতোই তক্ষশীল বলে, 'প্রেম বীর্যবান ব্যক্তিকে ও নিবীর্য করে ফেলে এবং যে বীর পুরুষ সসাগরা পৃথিবীকে জয় কত্তে পারেন, তিনিও প্রেমের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। আমার এই ইচ্ছা যে, তুমি প্রেমের সুখকর সংগীতে সেকেন্দার শাকে নিদ্রিত করে রাখ; আমরা এদিক থেকে তাঁকে হঠাৎ গিয়ে আক্রমণ করি।' কিন্তু ঘটনায় বিবর্তনে তার যে আশঙ্ক া, 'কিন্তু ভগিনী সাবধান! যেন ঐ যবনরাজের মন হরণ করতে গিয়ে, উল্টে যেন তোমার নিজের মন অপহৃত না হয়।' কিন্তুই তাই তা সত্যি হয়ে ওঠে। ভগিনী তাকে প্ররোচিত করে যে সেকেন্দারের বিপুল সৈন্যের কাছে তাদের পরাজয় অনিবার্য তবুও –

"তক্ষশীল। ভগ্নি! তোমার নিকট আর আমি কিছু গোপন করব না। কল্লুপর্বতের রাণী ঐলবিলার প্রেমাস্থায় আমি এই দুঃসাহসিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছি। তোমাকে বলতে কি, মহাবীর সেকন্দর শাকে যে আমরা যুদ্ধে পরাস্ত কত্তে পারব, তা আমার বড়ো বিশ্বাস হয় না। কিন্তু রানী ঐলবিলার প্রতিজ্ঞা শুনে অবধি আমি তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছি। তিনি আমাদের এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, যে রাজকুমার মাতৃভূমি রক্ষার্থে সর্বাপেক্ষা বীরত্ব প্রকাশ করবেন, তিনিই তাঁর পাণিগ্রহণ করবেন। এখন বলো দেখি অম্বালিকে! কি করে আমি রাজকুমারী ঐলবিলার প্রেমের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে সেকন্দর শার সঙ্গে সন্ধি করি?"[১]

(প্রথম অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

রানি ঐলবিলার প্রতিজ্ঞাপণে বন্ধ রাজকুমার বা একত্রিত যখন, তখন অম্বালিকা বলে আসলে রানি কোনো রাজকুমারকেই প্রেমবন্ধনে আবন্ধ করে নি। তার হৃদয় রাজ্যে, কেবলমাত্র পুরু রাজ আর এখানেই তক্ষশীলের দুর্বলতা প্রবেশ করে। সত্য হোক বা মিথ্যা হোক ভগিনীর এই বার্তা তক্ষশীলকে দুর্বল করে তোলে।

আর এ দুর্বলতা ফাটল ধরায় তাদের ঐক্যের মধ্যে। পুরু ও তক্ষশীল যে ব্রতে সম্মিলিত হয়েছিল, ভগিনীর ভূমিকায় তাতে বিলীন হয়। তক্ষশীল চাই, সেকেন্দারের সঙ্গে সন্ধি করতে। কিন্তু বীর বিক্রমে পুরু তা অগ্রাহ্য করলে তাদের বিবাদ চরম আকার নেই। সেকেন্দার শাহের কাছে কোনো ভাবে নত হওয়ার অর্থই হল, এ দেশের গৌরবকে ক্ষুন্ন করা। যে দেশের প্রতি অত্যাচার করে, দেশের প্রতি শত্রুতা করে তার সঙ্গে সন্ধি করা এ দেশের বীরের সাজে না। স্বদেশপ্রেমে পূর্ণ এই রাজা তাই বলে,

"পুরু। কি বললেন মহারাজ! সন্ধি? সেই যবনদস্যুর হস্ত হতে আমরা সন্ধি গ্রহণ করব? ভারতভূমিতে এতদিন গভীর শান্তি বিরাজ কচ্ছিল, সে স্বচ্ছন্দে এসে সেই শান্তি উচ্ছেদ করলে, আমরা তার প্রতি অগ্রে কোনো শত্রুতাচরণ করি নি। সে বিনা কারণে খড়্গহস্তে আমাদের দেশে প্রবেশ করে, লুটপাট করে আমাদের কোনো কোনো প্রদেশ ছারখার করে ফেললে, এখন আমরা কিনা তার সঙ্গে সন্ধি করব? আমরা তাকে কি এর সমুচিত শাস্তি দেব না? এখন বুঝি দৈব তার প্রতি বিমুখ হয়েছেন, তাই তিনি আমাদের সঙ্গে সন্ধি করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। .... ভালো। তিনি যে এই সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন, তার বিনিময়ে তিনি কি প্রত্যাশা কচ্ছেন? আপনি সহস্র সহস্র দেশকে জিজ্ঞাসা করুন যে, এইরূপ কপট সন্ধি করে তিনি সেই-সকল দেশকে অবশেষে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বন্ধ করেছিলেন কি না? তাঁর সঙ্গে বন্ধুতা করাও যা, তাঁর দাসত্ব স্বীকার করাও তা। সেকন্দর শা যেরূপ লোক, তাঁর সহিত মধ্যবিৎ ব্যবহার চলতে পারে না। হয় তাঁর ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে, নয় তাঁর প্রকাশ্য শত্রু হতে হবে।"[২]

(প্রথম অঙ্ক/দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

পুরু আহত হন। তক্ষশীল সাধারণ চর্মচক্ষের হিসাবে শুধু কপোট শক্তির কাছে বদন্যতা স্বীকার করতে আপন দেশের গৌরবকে রক্ষা করবে। তার মত, 'তিনি শুধু গৌরব চান, তিনি তো আমাদের সিংহাসন চান না।... একবার তাঁকে বিজয়ী বলে স্বীকার করলেই তিনি সন্তুষ্ঠ হবেন।' কিন্তু বীর পুরু আত্মমর্যাদার পূর্ণ এক ভারত তনয়। তার কাছে এ হেন অপমান অসহ্য। প্রবল বেগে সে চলে যাবে অথচ ভারত সন্তান হয়ে তাঁর কোনো চিহ্ন রাখবে না? তার অনুগ্রহের স্বাধীনতা পরাধীনতার চেয়ে কষ্টকর। তক্ষশীলকে সে উত্তেজিত করতে চায়, স্মরণ করিয়ে দেয় তার ভগিনীকে কেমনভাবে সেকেন্দার হরণ করে তার প্রসঙ্গ। এমন সময় তাদের সঙ্গে সন্ধি মানে ক্ষত্রিয় ধর্মকে অবমাননা করা। স্বদেশকে বিদেশি রাজার আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার মধ্যে রাজার কর্তব্য বোধ, স্বদেশচেতনা নিহিত। ভীত তক্ষশীলের মনের দুর্বলতার আত্মপ্রকাশ ঘটে, তার বীরত্বে কেউ খুশি না হোক, '.... রাজকুমারী ঐলবিলা তো আপনার বাক্যে আদর করবেনই।' প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যেই দেশীয় রাজন্যবর্গের সমাপতন হয়। তক্ষশীল যুদ্ধ একপ্রকার নিশ্চিত অনুমান করে সেকেন্দারের বিরুদ্ধতা থেকে সরে আসে।

ঐলবিলা ক্ষত্রিয় রমণী। অসীম ধৈর্য্য মনীষা দিয়ে তক্ষশীলকে আবার ফিরিয়ে আনতে মনস্থ করে কিন্তু তাকে ক্ষমা করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে যায়। যখন তক্ষশীলের মনান্তর সম্পর্কে জানতে পারেন তখন বীরত্বে পূর্ণ, স্বদেশ নিষ্ঠায় ব্রতী ঐলবিলা পর্যন্ত তাকে ঘৃণার সঙ্গে বলে,– 'ঐ স্বদেশদ্রোহী কাপুরুষকে এতদিন আমরা চিনতে পারি নি ?' তিনি স্থির করেন তাঁর প্রতি অবজ্ঞা করে শত্রু পক্ষের দিকে না ঠেলে মিষ্টি ভাষনে ফিরিয়ে আনতে হবে।

ঐলবিলা জানে এ সময় পুরুর পাশে তক্ষশীলকে তাদের খুব প্রয়োজন দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার জন্য, অর্থাৎ দেশের পুনরুদ্ধারের জন্য পুরু ও ঐলবিলার একনিষ্ঠতা ও দৃঢ়তা অনেক বেশি তাদের প্রণয়ের অপেক্ষা। তাদের দৃঢ়তা পরিচয় মেলে নিচের সংলাপে –

"ঐলবিলা। তাকে যে আমি চাচ্ছি মহারাজ! সেও কেবল আপনার জন্য। আপনি একাকী সহায়বিহীন হয়ে কি করে সেই পৃথ্বী-বিজয়ী যবনরাজের অসংখ্য সৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করবেন ? তক্ষশীল আপনার সঙ্গে যোগ দিলে আপনার সৈন্যদলের অনেক বৃদ্ধি হবে। সংগ্রামে শুদ্ধ প্রাণ দিলেই তো হয় না, জয়লাভের প্রতিও দৃষ্টি রাখা চাই। আমি জানি আপনি রণভূমে অনায়াসে প্রাণ বিসর্জন কত্তে পারেন। কিন্তু তা হলেই কি যথেষ্ট হল ? যুদ্ধে জয়লাভ না হলে, আমাদের দেশের যে কি দুর্গতি হবে, তা কি আপনি ভাবছেন না ? যদি মহারাজ ! রণস্থলে শুদ্ধ অন্ধ বীরত্ব প্রকাশ করে আপনার গৌরব লাভ করবার ইচ্ছা থাকে, তা হলে আর অন্য কোনো দিকে দৃষ্টিপাত করবার অবশ্যক নাই, যান আপনি সেই গৌরব অর্জনে এখনি প্রবৃত্ত হউন,...

পুরু। ... আমাকে ওরূপ নীচাশয় মনে করবেন না। আমি যদি দেশকেই উদ্ধার করতে না পারলেম, তা হলে শুদ্ধ অন্ধ বীরত্ব প্রকাশ করে আমার কি গৌরব হবে ? রাজকুমারি ! আমি সে গৌরবের আকাঙ্খী নই। কিন্তু আমি এই কথা বলছি যে, যদি আর কেহই আমার সহায় না হয়, সকলেই যদি আমাকে পরিত্যাগ করে, তথাপি স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য একাকীই আমি ঐ অসংখ্য যবনসৈন্যর সহিত সংগ্রাম করব। এতে যদি প্রাণ যায় তাও স্বীকার, তুব যবনেরা এ কথা যেন না বলতে পারে যে, তারা ভারতবাসিগণকে মেষের ন্যায় অনায়াসে বশীভূত কত্তে পেরেছে।

ঐলবিলা। কি ? ভারতবাসিগণ অনায়াসে মেষের ন্যায় যবনের অধীনতা স্বীকার করবে ? যদি কেহই আমাদের সহায় না হয়, তাই বলে কি আমরা যুদ্ধ হতে ক্ষান্ত হব ? তা কখনোই না। ক্ষত্রিয় হয়ে কেউ কখনো কি এ কথা বলতে পারে ? আমার বলবার অভিপ্রায় এই যে, যতদূর সাধ্য, সহায় বল অর্জনে আমাদের চেষ্টার যেন ত্রুটি না হয়। গৌরবের অনুসরণ হতে আপনাকে বিমুখ করতে আমার ইচ্ছা নয়, বরং যাতে আপনার গৌরব বৃদ্ধি হয়, তাই আমার মনোগত ইচ্ছা। আপনার বাহুবলে যবনরাজের দর্প চূর্ণ করে দিন, কিন্তু সহায় বল অর্জনে কিছুতেই বিরত হবেন না। সহায়সম্পন্ন

না হলে যুদ্ধ যে নিষ্ফল হবে। ... এ আপনি নিশ্চয় জানবেন যে, কোনো কাপুরুষকে আমার হৃদয় কখনোই সমর্পণ করব না।”[৩]

(প্রথম অঙ্ক/দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

তাহলে দেখা গেল, নাটকের প্রথম অঙ্কেই একপক্ষের বিদেশি শক্তির প্রতি ঘৃণা ও সম্মুখ সংগ্রামের প্রচেষ্টা। অন্যপক্ষ দেশীয় রাজন্য বর্গ রাজা তক্ষশীলের মানসিক পতন ও বিদেশিকে সাহায্য করার ইঙ্গিত।

‘পুরুবিক্রম’ নাটকটির দ্বিতীয় অঙ্কে কোনো গর্ভাঙ্ক ভাগ নেই। আসলে এ অঙ্কের মধ্যে ক্ষীণ শক্তিকে বলশালী করার চেষ্টা যেমন আছে। তেমনই দেশীয় রাজন্য কুলকে একত্রিত করে স্বদেশমাতৃকার উদ্ধারের জন্য সংকল্প নেওয়ার আহ্বান আছে। অন্যদিকে তক্ষশীলের প্রতি ধীক্কার আসলে দেশদ্রোহীতাকে তুলে ধরে। নাটকটি অভিনয় কালে দর্শকমনে স্বদেশবোধকে তীব্র করে তোলা এবং প্রণয় সম্পর্ককে ব্যক্তিগত স্তরে রেখে স্বদেশপ্রেমকে ব্যপ্তিস্তরে উন্নীত করার চেষ্টা আছে। সুশীল রায় সে কথায় বলেন, “দেশের লোকের মনে স্বদেশপ্রীতি জাগ্রত করার উদ্দেশ্য নিয়েই নাটকটি রচনা। ঐলবিলাও পুরুরাজের স্বদেশপ্রেম উভয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রেমের চেয়ে এখানে বড় হয়ে উঠেছে।”[৪]

আবার অত্যাচারী শক্তি ব্রিটিশের আধারে সেকেন্দার শাহের কূটনৈতিক ছলনাকে দর্শক মনে তুলে ধরে ব্রিটিশ সম্পর্কে বৈরীভাবকে জাগ্রত করার চেষ্টা আছে। ইতিপূর্বে যে সেকেন্দর ছিল সম্পূর্ণ একক শক্তি, এ অঙ্কে সেই শক্তির বিকাশ ঘটেছে তক্ষশীলের মাধ্যমে। অর্থাৎ দেশের স্বাধীনতা আনয়নে বাধা দেওয়ার জন্য দেশীয় রাজা সাহায্য পাওয়ার এ এক কৌশল। টোপ হিসাবে সেকেন্দার দুটি দিককে গুরুত্ব দেয়। প্রথমত— রাজকন্যা অম্বালিকার প্রতি প্রণয়াভিনয় ; দ্বিতীয়ত— সুখ-সমৃদ্ধি প্রলোভনে তক্ষশীলকে বশীভূত করে দেশের ঐক্য বিনষ্ট করা।

সেকেন্দার শাহ → অম্বালিকার প্রতি প্রণয়াভিনয়
সেকেন্দার শাহ → তক্ষশীলকে প্রলোভন।

নারীলোলুপ এই বিদেশীশক্তির স্বরূপ উন্মোচন করে নাট্যকার দর্শকের মনে বিদেশি শক্তির প্রতি ধীক্কারের মনোভাব গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ এ অঙ্কে , স্বদেশপ্রেমকে আনা হয়েছে বিদেশি শক্তির প্রতি কদর্যতা প্রদর্শনে।

যবনদূত এফেস্টিয়ন কিছুটা ‘ব্ল্যাকমেল’ এর সুরে অম্বালিকাও তক্ষশীলকে ক্রয় করতে চায়। অম্বালিকা তার হাতে সমর্পণ করে দেশের সামগ্রিক স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিতে জানায়,

‘... যেমন এখন সমস্ত ভারতভূমির শান্তি তাঁর উপর নির্ভর কচ্ছে, তেমনি তাঁরও হৃদয়ের শান্তি একমাত্র আপনার উপর নির্ভর কচ্ছে।’

অম্বালিকাকে রীতিমত ভয় প্রদর্শন করা হয়। অন্যান্য রাজারা যা করার করুক। তক্ষশীল যেন সেকেন্দারের সঙ্গে সন্ধি করে। অম্বালিকা রাজকন্যা হলেও গোপন পরামর্শে নিজের দুর্বলতাকে প্রকাশ করে সেকেন্দারকে শক্তিশালী করে তোলে। অম্বালিকা যে যবনরাজের প্রণয়াসিক্ত এ বার্তা প্রকাশ্যে ঘোষনা করে ফলে শত্রুকে শক্তিশালী করা আর আপন দেশের সম্ভ্রম অন্যের হাতে সমর্পণ করা সমমাত্রা পায়।

যবনদূত এবার পুরু ও অন্যান্য রাজকুমারদের প্রতি আপন প্রভুর গুণগান করে। সেকেন্দারের প্রতাপও বীরত্বে চূর্ণ রাজদের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করে। ঐ উপায়ে অম্বালিকা ভীত হয়। কারণ সে তো কাপুরুষতা বশীভূত। আত্মস্বার্থ চরিতার্থে মগ্ন। যবনদূতের এহেন বজ্রঘোষণে নতুন মাত্রা দেয় ভীরু তক্ষশীল কিন্তু অন্যান্য রাজন্যবর্গ তাতে ভয়ও পায় না, পিছিয়ে ও আসে না। বরং প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সংকল্প বন্ধ হয়। দেশের সম্মান রক্ষায় উদ্দীপ্ত প্রান্তিক রাজারা যেখানে প্রস্তুত সেখানে শক্তিশালী তক্ষশীল বিদেশী শক্তির পদলেহী। তাই পুরুর ধীক্কার যেন তার স্বদেশানুরাগের মাত্রাকেই সূচীত করে –

“প্রথম রাজকুমার। আমরা যবন-দস্যুর সঙ্গে কখনোই সন্ধি করব না।

দ্বিতীয় রাজকুমার। রাজা তক্ষশীলের কথা আমরা শুনব না।

তৃতীয় রাজকুমার। রাজা তক্ষশীল আমাদের ইচ্ছার বিপরীত কথা বলেছেন।

চতুর্থ রাজকুমার। পুরুরাজ আমাদের হয়ে কথা কন, রাজা তক্ষশীল কাপুরুষের ন্যায় কথা বলেছেন।

পুরু। যখন পঞ্চনদ-কূলবর্তী সমস্ত প্রদেশের রাজগণ যবনরাজের বিরুদ্ধে এই বিতস্তা-নদীকূলে প্রথম সমবেত হন, তখন আমি মনে করেছিলেম যে, সকলেই বুঝি একহৃদয়ে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কৃতসংকল্প হয়েছেন। কিন্তু এখন দেখছি, তাঁদের মধ্যে একজন স্বদেশের স্বাধীনতা অপেক্ষা যবনরাজের বন্ধুত্বকে অধিক মূল্যবান জ্ঞান করেন। রাজা তক্ষশীল যখন স্বদেশের স্বার্থ বিসর্জন কত্তে উদ্যত হয়েছেন, তখন স্বদেশের হয়ে কোনো কথা বলবার ওঁর কিছুমাত্র অধিকার নাই এবং দূরাজ! তাহা আপনার শোনাও কতর্ব্য নয়। অন্যান্য রাজকুমারগণের কি অভিপ্রায়, তা তো আপনি এইমাত্র শুনলেন। আমি তাঁদের প্রতিনিধি হয়ে, দেশের প্রতিনিধি হয়ে, আপনাকে পুনর্বার বলছি, আপনি শ্রবণ করুন। যবনরাজ সেকন্দনর শা কি উদ্দেশে আমাদের দেশে এসেছেন? তিনি কেন আমাদের দেশ আক্রমণ কল্লেন? এতদিন আমাদের দেশে গভীর শান্তি বিরাজ করছিল, তিনি আমাদিগকে আক্রমণ করে কেন সেই শান্তি ভঙ্গ কল্লেন? আমরা কি অগ্রে তাঁর প্রতি কোনো শত্রুতাচরণ করেছিলেম যে, তজ্জন্য তাঁর ক্রোধ উদ্দীপিত হয়েছে? তাঁর এতদূর স্পর্ধা যে তিনি বিনা কারণে, বিনা উত্তেজনায় আমাদের দেশ আক্রমণ কত্তে সাহসী হলেন? তাঁর প্রগলভ্তার সমুচিত শাস্তি না

দিয়ে আমরা কি এখন তাঁকে ছেড়ে দেব ? তা কখনোই হতে পারে না। তিনি কি মনে কচ্ছেন যে, পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বন্ধ করে তিনি একাধিপত্য করবেন ? সমস্ত পৃথিবীকে তিনি কি একটি বৃহৎ কারাগার করে তুলতে চান ? না, আমি যদি পারি, তাঁকে তা কখনোই কত্তে দেব না।"[৫]

(প্রথম অঙ্ক/দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

পুরুর এতদিনের বিশ্বাসে ঘা লাগে। দেশমাতৃমার শৃঙ্খল মোচনে কোনা স্বদেশবাসী যে পিছপা হতে পারে তা তাঁর বিশ্বাস হয় না। অথচ তক্ষশীলের মতো বিশ্বাসঘাতক তা সহজে করতে পারে। নাটকে এ অংশের অভিনয় কালে দর্শকমনে তক্ষশীলের প্রতি যে ঘৃণা ও ধীক্কার জন্ম নেবে তা আর বলার অপেক্ষা রখে না। এমনকি অম্বালিকা যত বড়ই প্রেমিকা না হন কেন তাঁর এমন কদর্য মানসকিতাকে দর্শক ভালোভাবে নেবে না তা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ দর্শক হৃদয়ে জন্ম নেবে স্বদেশানুরাগ। নাট্যকার অভিনব বাচন ভঙ্গিও Plot নির্মাণে এমনই বার্তা দিতে চেয়েছেন।

পুরু অন্যান্য রাজুকমারদের ক্ষত্রিয়ধর্ম সম্পর্কে সচেতন করে। সেকেন্দার শাহ কাছে কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার না করার অঙ্গীকার করেন। তক্ষশীল আগের যে দূরত্বে আহ্বান করছিল এখানে সেই দূরত্ব আরও বৃদ্ধি পেল। কিন্তু ঐলবিলার যখন বীরত্ব, দৃঢ়তা, নিয়ে তক্ষশীলকে প্রশ্ন করে তক্ষশীল আবার যেন একপা এগিয়ে আসে এবং সৈন্য সাজানোর জন্য প্রস্তুত হয়। অর্থাৎ টানাপোড়েনের ফাঁদে পড়ে ক্ষত-বিক্ষত হয় তক্ষশীল। এর একমাত্র কারণ পূর্বে বলা হয়েছে – দুর্বলতা। অম্বালিকা তার মধ্যে যে বীজ রোপন করেছে তা ক্রমে শাখা বিস্তার করতে শুরু করেছে। অর্থাৎ একদিকে রানিকে বীরত্ব প্রদর্শন করে পাণিগ্রহণ অন্যদিকে পুরু ও ঐল্যবিলা সম্পর্কে সংশয় তাকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। তার এক উক্তিতে তা অত্যন্ত স্পষ্ট –

"তক্ষশীল। (স্বগত) ঐলবিলা বোধ হয় পুরুরাজকেই আন্তরিক ভালোবাসেন, কিন্তু আমারও আশা একেবারে যাচ্ছে না (চিন্তা করিয়া) দূরে হোক, কেন বৃথা আশায় মুগ্ধ হয়ে আমি আমার ধন, প্রাণ রাজ্য সকলি খোয়াতে যাচ্ছি ? যাই সেকেন্দর শার হস্তে আমার সমস্ত সৈন্য সমর্পণ করে তাঁরই শরণাপন্ন হইগে।"[৬]

(দ্বিতীয় অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

আসলে তক্ষশীলের মতো চরিত্ররা দেশের স্বার্থের কথা, দেশের গৌরবের কথা ভাবে না। আত্মমর্যাদাহীন অপদার্থ এই শ্রেণির মানুষেরা আত্ম প্রত্যয়ে পূর্ণ নয়, অপর শক্তি দ্বারা চালিত মাত্র। তাই যে শক্তিকে বেশি বলশালী মনে করে সে শক্তির প্রতি তাদের আগ্রহ দেখা দেয়। আর এই দুর্বলতার সুযোগ নেয় সুযোগ সন্ধানীরা। এখানে সেকেন্দার শাহ তেমনই একজন সুযোগসন্ধানী। দেশীয় ঐক্যে চিড় ধরিয়ে আপন স্বার্থ পূর্ণ করতে সচেষ্ট হয়। রানির স্বদেশপ্রেম কোনভাবেই টলে না। পুরু জানে হয়ত পরাজয় ঘটবে তবুও ক্ষত্রিয় ধর্ম সম্পর্কে সচেতন। তক্ষশীল রাজা হয়েও সে আদর্শ লালন করে না।

ঐল্যবিলা শুধু দেশভক্তিতে পূর্ণই নয় চালিকা শক্তি রূপে যে যথার্থ তাও বোঝা যায় -এ অঙ্কের শেষে। পুরু তাই বলে কপট শক্তি (তক্ষশীল) যদি তাদের সঙ্গে নাও থাকে সেও ভালো তবে যদি বিরোধী শক্তির সঙ্গে মিশে যায় তা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। তাই তার বীরত্বসূচক উক্তি, 'কপট বন্ধু অপেক্ষা প্রকাশ্য শত্রুও ভালো।' এবং দুরারোগ্য ক্ষতগ্রস্থ অঙ্গকে (অর্থাৎ তক্ষশীলকে) কেটে ফেলাই কর্তব্য বলে সিদ্ধান্ত করেন।

ঐলবিলাই যে অসীম ধৈর্য্যও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে দেশীয় রাজাদের একত্র করেছেন তা পুরুও স্বীকার করেন। সেদিক দিয়ে স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত করার প্রধান গুরু হিসাবে ঐলবিলাকে স্থান দিতে হয়। তাই ঐলবিলা এবার তক্ষশীলের সৈন্যদের উদীপ্ত করার শেষ চেষ্টা করেন। '... আমি একবার এইখানে চেষ্টা করে দেখি তক্ষশীলের সৈন্যগণকে যবনগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে দিতে পারি কিনা। হাজার হউক, তবু তারা ক্ষত্রিয় সৈন্য। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য তারা সব কত্তে পারে।...' রাজার শক্তি আসলে যে সৈন্যের শক্তি সেই বিশ্বাসে রানির এ প্রচেষ্টা। নাটকটির দ্বিতীয় অঙ্কে ঐলবিলাও পুরুরাজের স্বাদেশিকতা বোধ ও তার নিদর্শন নাটকটিতে প্রাণ সঞ্চার করে। রানির সমস্ত শক্তি প্রবাহিত হয় দেশীয় রাজা প্রজাও সৈন্যদের মধ্যে। দর্শকমনে ভারতভূমির প্রতি শ্রদ্ধা জেগে ওঠে।

তবে একটা অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। নাটকে শুধু রাজন্যবর্গের দ্বন্দ্ব যতটা প্রকট, বিদেশি শক্তির অত্যাচারের নিদর্শন, অপশাসনের দৃষ্টান্ত তেমন নেই। যদি তেমন কোনো দৃষ্টান্ত থাকত তবে নাটকটির মূল উদ্দেশ্য অনেক বেশি সিদ্ধ হোতো। 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকে যে অত্যাচারের ছবি বর্ণিত তাতে দর্শক শঙ্কিত হয়। শঙ্কিত হয় প্রসাশন, সেই অত্যাচার যে তাদের জন্যও অপেক্ষামান তা দর্শক-পাঠক বুঝতে পারে। তৈরি হয় গণজাগরণ। এ নাটকে তেমন কিছু দৃশ্য এই অঙ্কে সন্নেবেশিত হওয়া উচিত ছিল। যদিও নাটকটি তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে এর জন্য অক্ষম হয়নি। অজিত ঘোষ ও ধরণের ত্রুটি স্পর্কে বলেছেন, "নাটকখানির মধ্যে স্বদেশী ভাবোদ্দীপনা এবং বীর রসোদ্বেল তার জন্য ইহা সাময়িকভাবে দর্শকগণকে আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছিল কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত দোষ ত্রুটির জন্য ক্রমে ইহার মূল্য কমিয়া আসিয়াছিল।"[৭] কিন্তু নাটকটির মূল আবেদন স্বদেশপ্রেম জাগানো। নাট্যকার সে কথা তার জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন, "হিন্দু মেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত — কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব গাথা ও ভারতের গৌরব কাহিনী কীর্তন করিলে হয়তো কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কটকে থাকিতে থাকিতেই আমি 'পুরু-বিক্রম' নাটকখানি রচনা করিয়া ফেলিলাম।"[৮] অর্থাৎ ইংরেজ মেহামুক্তির যুগে বাঙালিকে স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত করার মতো কোনো নাটক বাংলা নাট্যমঞ্চে অভিনীত হয়নি। নাটকটির রচনাকাল ১৮৭৪, ১৮৭২ -তে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ। তেমন সময় তথাকথিত দর্শককে উজ্জীবিত করাই ছিল নাট্যকারের উদ্দেশ্য। এবং 'সাময়িক দর্শকগণকে আকৃষ্ট' করার মধ্যে নাটকটি সার্থকতা। তবে দোষ ত্রুটি আছে সত্য তবে সেই দোষত্রুটির কারণেই যে তার মূল্য কমে যায় তা কিন্তু নয়। তাহলেও ত্রুটিহীন অনেক নাটককেও এমন মূল্য নেই বলতে হয়। যুগের চাহিদায় তার মূল্য কমতে পারে কিন্তু স্বদেশচেতনা জাগ্রত করাতে তার মূল্য অপরিসীম।

তৃতীয় অঙ্কে নাটকের ক্লাইমেক্স ধরা পড়েছে। দেশের গৌরব শুধু স্বাধীনতা অর্জনে নয়, বীরত্ব প্রদর্শনে ; সত্যের প্রতি অবিচলতায় ; দেশীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধায় তা দেখানো হয়েছে। স্বদেশের স্বাধীনতা আনতে বিদেশির কাছে যে ভারতবাসী ভিক্ষা চায় না, আদায় করে নিতে পারে তা এ অঙ্কে দেখানো হয়েছে। অপরদিকে বিদেশি যবনরাজ ন্যায় আদর্শের কথা বললেও আপন অহংবোধকে রক্ষা করার জন্য যে অন্যায়, মিথ্যার আশ্রয় নেয় তাও দেখানো হয়েছে। তাই এ অঙ্কে দ্বন্দ্ব শুধু স্বাধীনতা ও পরাধীনতায় নয়, দ্বন্দ্ব আদর্শের। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে পুরু শিবির যুদ্ধ প্রস্তুতিও দেশমাতৃকার বন্দনায় স্বদেশপ্রেমের গানে মাতোয়ারা হয়। দেশীয় সৈন্যগণ পুরুর প্রেরণায় উদ্দীপ্ত, খড়্গ হস্ত। এমন সময় ঝড়ের প্রাদুর্ভাব, এ ঝড় আসলে প্রতিবন্ধকতার প্রতীক। শেক্সপীয়রের ‘কিংলিয়র’ নাটকেও চরম পর্যায়ে এ ধরণের ঝড়ের দৃশ্য আছে।

হঠাৎ জানা যায় ধূর্ততা অবলম্বন করে সেকেন্দার শাহ নদীর এপারে সৈন্যদের প্রেরণ করেছেন। এবং পুরুর সৈন্যদের অন্যায়ভাবে পরাজিত করেছেন। মিথ্যাশ্রয়ী সেকেন্দার সম্পর্কে সত্যাশ্রয়ী পুরুর ক্ষত্রিয়সুলভ উক্তি –

“পুরু। আমি শুনেছিলেম, পারসিকদিগের সহিত আরাবোলার যুদ্ধে সেকেন্দর শার একজন সেনাপতি রাত্রে অলক্ষিতভাবে শত্রুগণকে আক্রমণ করবার পরামর্শ তাঁকে দেওয়াতে তিনি সদর্পে এইরূপ বলেছিলেন যে, সেকেন্দর শা কখনো চৌরের ন্যায় অলক্ষিতভাবে আক্রমণ করে জয়লাভ কত্তে ইচ্ছা করেন না। তিনি প্রকাশ্য দিবালোকেই যুদ্ধ করেন। যে সেকেন্দর শা পারস্যদেশে এ কথা বলেছিলেন, সেই সেকেন্দার শা কি ভারতভূমিতে ঠিক তার বিপরীতাচরণ কল্লেন? সৈন্যগণ! সেই ধূর্ত শৃগালের যেখানে থাকুক না কেন, তোমরা সিংহের ন্যায় গিয়ে তাদের আক্রমণ করো।”[৯]

(তৃতীয় অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

অর্থাৎ ঝড়ের রাত সেকেন্দার শাহের কপটতার প্রকাংশ সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে। দেশীয় রাজা তক্ষশীল যেমন প্রতারণা করে তেমনি প্রতারণা করে এদেশের প্রকৃতি। তাই পুরুর যুদ্ধ শুধু সেকেন্দারের বিরুদ্ধে নয়। দেশীয় প্রতারক রাজা ও দেশস্থ প্রতারক প্রকৃতির বিরুদ্ধে। অর্থাৎ লড়াই -এর তীব্রতা স্বদেশপ্রেমের তীব্রতাকেই সূচিত করে। এর উপর শত্রুপক্ষের রাজা মিথ্যাশ্রয়ী। সুতরাং চিত্রে যদি দেখানো যায় রাজা পুরুর লড়াই তাহলে এমন হতে পারে –

তক্ষশীলের বিশ্বাসঘাতকতা
↓
পুরু ও দেশীয় সৈন্য ———→ সেকেন্দার শাহের মিথ্যাচার
↑
ঝড়ের রাত

অর্থাৎ একক শক্তি দেশীয় রাজন্য বর্গ একদিকে অন্যদিকে বিদেশি শক্তিও তার সহায়ক শক্তি। সহায়ক শক্তি কখনো দেশীয় রাজার প্রতারণা, কখনো ঝড়ের তাণ্ডব। সংগ্রামে টিকে থাকা তাই পুরুর

পক্ষে কষ্টকর হয়ে ওঠে। তবুও দেশমাতৃকার সম্মান রক্ষায় যখন তার সমস্ত সৈন্যরা নিহত হন তখন দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করেন – আপন প্রাণ রাজি রাখেন। এ ভারত যে বীর সন্তানের জন্মদাত্রী, এ ভারত যে আদর্শে উজ্জ্বল, এ ভারত যে বিদেশিদের পুতুল নয় তা প্রমাণ করার দায়িত্ব নেন রাজা পুরু। শুরু হয় যুদ্ধ।

টানটান এই উত্তেজনা দর্শকমনে উৎকন্ঠা জাগায়। অতি সাধারণ দেশীয় দর্শক চাইবেন পুরুর জয়। তার জয়েই দেশের জয়। স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করার ক্ষেত্রে এ যুদ্ধের চিত্রটি অতীব তাৎপর্য পূর্ণ। প্রথমবারে জয়ী হন পুরু। যবনরাজের অস্ত্র হস্তচ্যুত হয়। আদর্শে, সত্যনিষ্ঠায় প্রাণবন্ত – ভারতমায়েরযোগ্য সন্তান পুরু ক্ষত্রিয় বীর্যে বলেন, 'মহারাজ! নিরস্ত্র হয়েছেন, অস্ত্র নিন, ক্ষত্রিয়গণ নিরস্ত্র যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করেন না।' অথচ যদি পুরু কপটতার আশ্রয় নিতেন তবে সেকেন্দার এখানেই পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হতেন কিন্তু স্বদেশের গৌরবকে তা কালিমালিপ্ত করতো। অথচ সেই কপটতা দিয়েই পুরুকে বন্দি করে। প্রথমবার পুরুর অস্ত্রের অগ্রভাগ ভেঙে পড়লে অস্ত্র নিতে বলে, সেই সুযোগে বীর পুরষ পুরু আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে সেকেন্দারকে আক্রমণ করে। যখন দেশলুন্ঠনকারী যবনরাজ পুরুর হাতের মুঠোয় তখনই সেকেন্দারের সৈন্যরা পুরুকে আঘাত করে। অথচ তাদের বলা ছিল, '... আমাদের দুইজনে যখন যুদ্ধ হবে তখন উভয় পক্ষীয় সৈন্যকে নিরস্ত্র থাকতে হবে।...' কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেকেন্দার বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। বন্দি করলেন পুরুকে। পরাধীন দেশের একমাত্র আলোর দিশারী বন্দি হলেন।

নাট্যকার অপূর্বভাবে বিদেশিদের কপটতাকে এ নাটকে তুলে ধরলেন। দর্শক-পাঠককে বিদেশি শক্তির নগ্ন স্বরূপ দেখাতে সমর্থ হলেন। দর্শক মনে স্বাজাত্য বোধ যে জেগে উঠবেই, দেশবাসী এ নাটক দর্শক করে বিদেশি শক্তিকে ঘৃণা করতে শুরু করবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এখানেই শেষ নয়, পুরুর আদর্শের কাছে তুচ্ছ – সেকেন্দার সেই আঘাতকারী সৈন্যদের মৃত্যুদণ্ড দেন কিন্তু পুরুর প্রতি বশ্যতা স্বীকার করেন না। একটি সংলাপ তুলে ধরলে, এই নগ্নতা স্পষ্ট হয়।

"সেকেন্দার শা। (ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া) নরাধম। আমার নিষেধের অবমাননা। শত্রুকে অন্যায় রূপে আহত করে সেকন্দর শার নির্মল যশে তুই আজ কলঙ্ক দিলি? দেখ্ দিকি, তোর এই জঘন্য আচরণে সমস্ত গ্রিসদেশকে আজ হাস্যস্পদ হতে হল? এফেস্টিয়ন! আমি ওর মৃত্যুদণ্ড আজ্ঞা দিলেম, এখনি ওকে শিবিরে নিয়ে যাক।... (স্বাগত) আজ আমাকে বড়োই লজ্জিত হতে হয়েছে। আর আমি এখানে থাকতে পাচ্ছি নে। শিবিরে গিয়েই সৈন্যদিগকে উচিতমতো শিক্ষা দিতে হবে।

এফেস্টিয়ন। আজ্ঞা মহরাজ! (যাইতে যাইতে সৈন্যগণের প্রতি) তোমরা এখানে থাকো, আমি এলেম বলে। (দুই-তিন রক্ষকের সহিত ব্যস্তসমস্ত হইয়া এফেস্টিয়নের প্রস্থান)

পুরুর সৈন্যগণ। মহারাজ যে মূর্ছা হয়েছেন দেখছি, এসো, আমরা এখন এঁকে ধরাধরি করে আমাদের শিবির মধ্যে নিয়ে যাই। (মূর্ছাপন্ন পুরুকে তুলিয়া সৈন্যগণের গমনোদ্যোগ)

যবন সৈন্যগণ। আমাদের বন্দীকে তোরা কোথায় নিয়ে যাস? রাখ এখানে, না হলে দেখতে পাবি।

পুরুর সৈন্যগণ। (অসি নিষ্কোষিত করিয়া) কি, মহাবীর পুরু যবনের বন্দী! আমরা একজন বেঁচে থাকতেও যবনকে কখনোই মহারাজের গাত্র স্পর্শ কত্তে হবেনা।

যবন সৈন্যগণ। (অগ্রসর হই ?া ও অসি নিষ্কেষিত করিয়া) কি! এখনও বল-প্রকাশ? রাখ এখানে বলছি। (কলহ করিতে করিতে উভয় সৈন্যের প্রস্থান)" [১০]

(তৃতীয় অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

সুতরাং নাটকটির গতি প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকার যে ভাবে স্বদেশপ্রেমের ধারার বিস্তার ঘটালেন তাতে নাট্যকারের দেশপ্রীতি যে কোন মাত্রায় পৌঁছায় তা বর্ণার অতীত। ঐতিহাসিক তথ্য সত্যকে নিয়ে রূপকের আড়ালে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতি যে বিদ্বেষ তা এখানে প্রকটিত। এ পর্যন্ত দেখা গেল স্বদেশপ্রীতি জাগ্রত করায় জন্য নাট্যকার যে কৌশল নিয়েছেন তা হল –

১. দেশীয় রাজন্যবর্গের দেশভক্তি।

২. দেশীয় বিশ্বাসঘাতক রাজন্যবর্গের কপটাচার।

৩. বিদেশি শক্তির সাম্রাজ্য বিস্তারের অন্ধ ইচ্ছা।

৪. রানি চরিত্রের বীরত্বও দৃঢ়তা।

৫. ব্যক্তি প্রেম ও দেশপ্রেমের সেতুবন্ধন।

নাটকের এই (৩য়) অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে নাট্যকার নতুন একটি দিক উন্মোচন করেন। প্রথম গর্ভাঙ্কে পারস্যরাজের বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রাতরণা ছিল পুরুর প্রতি। এবার সেই প্রতারণার শিকার রানি ঐল্যবিলা। অর্থাৎ দু'জন বীরকে দুটি অঙ্কে প্রতারিত হতে হয়। প্রথম বীরের প্রতারণা সহ্যের সীমার মধ্যে কিন্তু দ্বিতীয় বীরের প্রতারণা সহ্যের সীমা লঙ্ঘন করে। ঘৃণার সঙ্গে দর্শকমনে ঠাঁই হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রতি শ্রদ্ধায়, করুণায় দর্শক ব্যথিত হয় – জেগে উঠে দেশের প্রতি ভালোবাসার প্রগাঢ়তা। দেশের হিতসংকল্প প্রাণ ঐলবিলাকে বন্দি হতে হয় দেশীয় রাজা তক্ষশীলের হাতে। মিথ্যা প্রবোধ দিয়ে তক্ষশীল রানিকে প্রতারণা করতে শুরু করে। যোগ দেয় অম্বালিকা। একদিকে দেশের উদ্ধারের জন্য মরণপণ যুদ্ধ অন্যদিকে এ দেশের রাজকন্যা অম্বালিকার কপটতা ঐলবিলার প্রতি।

সেকেন্দারের সাহায্যে তক্ষশীলের হাতে বন্দি ঐলবিলা যুদ্ধের ফলাফল জানতে উদগ্রীব। তাই পত্র পাঠিয়ে বীর বিক্রম পুরুর খবর নিতে চান। আর একাজ করতে হঠাৎ আসে অনাথিনী গায়িকা। যার গানে আপ্লুত রানি সেই উদাসিনী নিঃস্ব, রিক্ত হস্তেও দেশোদ্ধারের জন্য অসময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এবার অম্বালিকা প্রলোভিত করে ঐলবিলাকে। রানির বীরত্ব, দেশপ্রেম সম্পর্কে বিন্দু বিসর্গ ধারণা নেই বলেই অম্বালিকা কাপুরুষোচিত উক্তি প্রতুক্তিতে তুচ্ছ মানবী হয়ে ওঠে –

"ঐলবিলা। (অম্বালিকার প্রতি) রাজকুমারী। আমাকে রক্ষকগণ শিবিরের বাহিরে যেতে দিচ্ছে না কেন? তবে কি আমি এখানে বন্দী হলেম? আপনার ভাই মুখে বলেন যে, তিনি আমাকে ভালোবাসেন। এই কি তাঁর প্রেমিক পরিচয়? কোথায় আমি বিশ্বস্তচিত্তে তাঁর খোনে এলেম, না তিনি কিনা বিশ্বাসঘাতক হয়ে আমার স্বাধীনতা হরণ কল্লেন?

অম্বালিকা। ও কথা বলবেন না রাজকুমারি! তিনি তো বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় কাজ করেন নি, বরং তিনি প্রণয়িজনের ন্যায়ই ব্যবহার করেছেন। এই তুমুল সংগ্রামের সময় আপনাকে যে এখান হতে বরুতে দিচ্ছেন না, এতে তা তাঁর প্রগাঢ় প্রেমেরই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এই সময়ে কি কোনো স্ত্রীলোকের বাহিরে বেরনো উচিত? এ স্থানটি দেখুন দিকি কেমন নিরাপদ — কেমন চারি দিকেই শান্তি।" [১১]

(তৃতীয় অঙ্ক/দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

অম্বালিকার হীনতা ও দেশদ্রোহীতা সেইসঙ্গে জঘন্য চক্রান্ত বীর চরিত্রদের পাশাপাশি দর্শকদের ও ব্যাথিত করেছে। আর এহেন চরিত্রের পরিনামে তাই নেমে এসেছে চরম দণ্ড, দু'জন প্রিয় অবলম্বনকে হারাতে [১২] হয়েছে। নাট্যকার সচেতনভাবেই তাঁর চরিত্রটিকে স্পষ্ট ও সক্রিয়ভাবে তুলে ধরেছেন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে কপটাচারের, বিশ্বাসঘাতকার প্রথম পর্ব শেষ হতেই সূচনা হয় দ্বিতীয় পর্বের। তক্ষশীল এসে হীন, কদর্যতার যে পরিচয় দেয় তাতে তাকে ঘৃণা করতে ইচ্ছা করে, তাকে ধ্বংস করতে ইচ্ছে করে। যে তক্ষশীল ঐলবিলার দেশভক্তিতে আপ্লুত হয়ে সৈন্য সজ্জায় ব্যস্ত ছিল ; যে তক্ষশীল অন্যান্য রাজকুমারদের মতো মরণপণ সংগ্রাম করে দেশকে উদ্ধার করার সংকল্প নিয়েছিল ; সেই তক্ষশীল অন্যায়ভাবে বন্দি করা সেই রানিকে নিষ্ঠুর বাক্য বলে, যা শুধু ঐলবিলাকে নয়। সমগ্র ভারতবাসীকে অপমান করে, অর্থাৎ 'যদি পুরুরাজ আমার তখন আমার কথা শুনতেন...' তাহলে পুরুকে মরতে হোতো না।

অর্থাৎ পুরুর মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ দিয়ে তাকে বশীভূত করতে চেয়েছে। এহেন হীন আচরণ কখনও চর্তুস্পদের হয় না। বিশ্বাসঘাতক এই চরিত্র জানে হয়ত রানি ঐলবিলা শুধু প্রেমের জন্যই দেশোদ্ধারে নেমেছে কিন্তু পুরুর মৃত্যু সংবাদ রানির কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হয় তবুও দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে আশা ছাড়তে পারেন না। আপন হৃদয়ের প্রণয় তৃষ্ণাকে ধৈর্য ধরতে বলে। দেশের শৃঙ্খল মোচন করেই তবে স্বর্গে দেখা করার কথাভাবে রানি। এখানেই নাটকটি এক অত্যাশ্চর্য নাটকীয় বাঁক নেয়। অম্বালিকা, তক্ষশীল তথা অভিনয়কালে কতিপয় দর্শকের মনে যে স্থান ছিল যে, পুরুর যুদ্ধ শুধু ঐলবিলার জন্য আর ঐলবিলার বজ্রঘোষন শুধু নিজের অহং প্রতিষ্ঠা করে একজন বীরকে লাভ— তার এখানে অবসান হয়।

পূর্বেই বলেছি, দেশেপ্রেমের কাছে মানবপ্রেমের স্থানের তুচ্ছতা। দেশপ্রীতিই তাদের কাছাকাছি এনেছে। স্বপ্ন দেখিয়েছে আবার দেশেপ্রেমেই প্রধান আসন নিয়েছে। রানি ও তক্ষশীলের এ উক্তিতে তার দৃষ্টান্ত মেলে —

"ঐলবিলা। (একটু পরেই চেতন পাইয়া, উঠিয়া বসিয়া স্বগত) আর আমার বেঁচে সুখ নেই। যখন পুরুরাজ গেছেন তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতাও জন্মের মতো বিদায় নিয়েছেন; যখন পুরুরাজ গেছেন তখন ভারত-ভূমির মস্তকে ভীষণ বজ্রাঘাত হয়েছে; যখন পুরুরাজ গেছেন তখন আমার সকলি গিয়েছে, আমার পৃথিবীর আশা ভরসা সকলি ফুরিয়ে গেল। কিন্তু হৃদয়! এখনো ধৈর্য ধরো। যদিও আমার প্রেমের প্রস্রবণ জন্মের মতো শুষ্ক হয়ে গেল, তবু দেশ উদ্ধারের এখনো আশা আছে। আর-একবার আমি চেষ্টা করে দেখব। তার পরেই এ পাপ-জীবন বিসর্জন করে পুরুরাজের সহিত স্বর্গে সম্মিলিত হব। (প্রকাশ্যে) আমাদের সমস্ত সৈন্যই কি পরাজিত হয়েছে? আর একজনও কি বীরপুরুষ নেই যে, মাতৃভূমির হয়ে অস্ত্র ধারণ করে? বীরপ্রসূ ভারত-ভূমি কি এর মধ্যেই বীরশূন্য হলেন?

.....

তক্ষশীল। সেকন্দর শার সম্পূর্ণ জয় হয়েছে ও পুরুরাজের সৈনগণ একেবারে পরাস্ত হয়েছে।

ঐলবিলা। ধিক্ রাজকুমার! আপনি অম্লানবদনে ও কথা মুখে বলতে পাচ্ছেন? দেশের জন্য আপনার কি কিছুমাত্র দুঃখ কি লজ্জা বোধ হচ্ছে না? দেখুন দিকি, আপনার জন্যই তো পুরুরাজ পরাভূত হলেন, দেশ দাসত্বশৃঙ্খলে বন্ধ হল। পুরুরাজ একাকী সহায়বিহীন হয়ে কতকাল অসংখ্য যবন সৈন্যগণের সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে পারেন?... আপনার মুখে আর পৌরুষের কথা শোভা পায় না। সেকন্দর শা কি ইচ্ছা কচ্ছেন যে, তিনি আমার সিংহাসন কেড়ে নিয়ে আবার তিনি সেই সিংহাসন আমাকে দান করবেন? আমি তেমন কুলে জন্মগ্রহণ করি নি যে, শত্রুহস্ত হতে কোনো দান গ্রহণ করব। এইরূপ দান করে তিনি কি মনে কচ্ছেন তাঁর বড়োই গৌরব বৃদ্ধি হবে? দানে গৌরব বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু এ কি সেইরূপ দান? আমার সিংহাসন আমার কাছ থেকে অপরহরণ করে। কিনা তাই আবার তিনি আমাকে দান করবেন?... হীনবল পারসীকেরা ওরূপ পারে, কিন্তু কোনো ক্ষত্রিয়কন্যা কখনোই স্বরাজ্যপাহারী দস্যুকে বন্ধু বলে স্বীকার কত্তে পারে না, ও তার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে কখনোই রাজত্ব কত্তে পারে না। স্বর্ণশৃঙ্খল কি শৃঙ্খল নয়? প্রভু আপনার ক্রীতদাসকে যতই কেন বেশভূষাতে ভূষিত করুক না, তাতে কেবল প্রভুরই গৌরব বৃদ্ধি হয়, তাতে কি কখনো দাসের দাসত্ব ঘোচে? সেকন্দর শার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে যদি আমাদের রাজত্ব রাখতে হয়, তা সে তো রাজত্ব নয় – সে দাসত্বের আর-এক নাম মাত্র, না, আমাদের অমন রাজত্বে কাজ নেই। ওরূপ রাজত্ব আপনি স্বচ্ছন্দে করুন গে, বরং সেকন্দর শা আপনার বন্ধুতার পুরস্কার স্বরূপ আমার ও পুরুরাজের সিংহাসন অপহরণ করে আপনাকে প্রদান করুন, আমরা তাতে কাতর নই। কিন্তু সেন্দর শা যদি তেমন লোক হন, তা হলে আপনার মতন অকৃতজ্ঞ স্বদেশদ্রোহী নরাধমকে তাঁর ক্রীতাদাস বলেও লোকের কাছে পরিচয় দিতে লজ্জিত হবেন।"[১৩]

(তৃতীয় অঙ্ক/দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

নিজের প্রেমাস্পদের মৃত্যু সংবাদের পরও যে নারী দেশোদ্ধারের সংকল্প থেকে বিন্দুর সরে আসে না। পুরুর মৃত্যুদাতাকে শাস্তি দেওয়া অপেক্ষা তক্ষশীলকে ভৎর্সনা ও দেশের শৃঙ্খল মোচনের এহেন উক্তি সত্যই স্বদেশ প্রেমের নতুন মাত্রা যোগ করে।

এমন চরিত্রাঙ্কনের দ্বারা নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন দেশের স্বার্থরক্ষা করতে হলে, দেশকে সম্মান দিতে গেলে, ব্যক্তি সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে রানির মতোই দৃঢ়, হৃদয়ের চাওয়া পাওয়াকে তুচ্ছ করতে হবে। নানান প্রতিকূলতার সামনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্যে অবিচল এই চরিত্র নাট্যকারের মানসলোকের মূল বার্তাবহের কাজ করে।

তক্ষশীলকে তো আপন নারীত্বও আদর্শ দিয়ে পরাভূত করে এবার অম্বালিকার কপটতা শুরু হয়। কপটতার মাত্রা এতটাই তীব্র যে নাট্যকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে সমর্থ। একজন দেশীয় রাজকন্যা অন্য দেশীয় রাজকন্যার প্রতি যে আচরণ তাতে জাতি অপমানিত হয়। যাদের হাতে দেশের গৌরব নিহিত; যাদের নির্ভরতায় সাধারণ মানুষের বিপুল আশা; তারা এমন কপটাচারে লিপ্ত যে দর্শক ব্যথিত হয়। জেগে ওঠে, দেশমাতৃকার উদ্ধারের জন্য বিদেশি শক্তির সামনে দাঁড়াবার মানসিক শক্তি।

অম্বালিকা তক্ষশীলের জবানীতে একখানি পত্র লিখে পৌঁছেদেন বন্দি পুরুর হাতে। যাতে পুরুর সঙ্গে ঐলবিলার চিরবিচ্ছেদ বটে এই উদ্দেশ্য নিয়ে। বিচ্ছেদ ঘটে ঠিকই তবে তা সাময়িক। ঈর্ষা পরায়ণ এই নারী আপন দাড়ি পাল্লায় যাচাই করে ঐলবিলাকে। যেন –তেন প্রকারে ঐলবিলাকে তুলে দিতে চাই ভ্রাতার হাতে।

শত্রু সেকেন্দারের মুখে যে কথা শোভা পায় তা ফুটে উঠেছে তক্ষশীলের মুখে। যবনরাজ বলে, জনবর উঠেছে 'পুরুরাজ মরেছে' আর তক্ষশীলের মনে – ''ভগবান করেন, যেন এই জনরবটি সত্য হয়।... এতদিনে বুঝি আমার পথের কন্টক অপসৃত হল।''

পতনের শেষধাপে পৌঁছাতে তক্ষশীলকে সাহায্য করে সেকেন্দার। 'রক্ত করবীর' রাজার মতোই যবনদূত পরামর্শ দেয়, ''মহারাজ! চিন্তা করবেন না, আপনার রাজ্য তো আপনারই রইল। এতদ্ব্যতীত পুরুরাজের রাজ্য ও রানী ঐল্যবিলার রাজ্যও আমি আপনাকে প্রদান করলেম। আপনি এখন তিন রাজ্যের অধীশ্বর হলেন, এই তিন রাজ্যের ঐশ্বর্য নিয়ে সেই সুন্দরীর চরণে সমর্পণ করুন, তা হলেই নিশ্চয় তিনি প্রসন্ন হবেন।'' [১৪] (তৃতীয় অঙ্ক/দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

সেই সুযোগে কপোট ক্ষত্রিয় কুলকলঙ্ক সেকেন্দার শাহ অম্বালিকাকে সাক্ষাৎ করে প্রেমালাপে মত্ত হয়। এ নেশা যে যুদ্ধের নেশার মতো! নিজের রাজধর্মের প্রতি যেমন সে নির্বোধ মানব ধর্মের প্রতি তেমনই স্তাবক, নাট্যকার তার ইঙ্গিত দিয়ে এ অঙ্কের পরিসমাপ্তি টেনেছেন।

তৃতীয় অঙ্কের বিন্যাসে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করার যে রীতি যে ঘটনা বিন্যাস করা হয়েছে তাতে নাট্যকার সার্থক। প্রকৃত বীর চরিত্র কখনও কোনো প্রতিকূলতার কাছে মাথা নত করে না। এমন বীর যে ভারতের মাটিতে জন্মায় তা দেখিয়েছেন নাট্যকার। নাট্যকারের স্বদেশের প্রতি যে প্রীতি তার

স্ফুরণ এ ধরণের দৃশ্য সংযোজন। দেশের হীত কামনায় শৃঙ্খল মোচনে নাট্যকার যে উদগ্রীব ছিলেন তা এই অঙ্কেই পরিস্ফুট।

চতুর্থ অঙ্কটিতে চরম ক্লাইমেক্স অতিক্রম করে 'Falling Action' এর দিকে কাহিনির গতি প্রবাহ শুরু হয়। স্বদেশপ্রেমে উজ্জ্বল বীর ভারত সন্তানদের গৌরব সূচিত হওয়ার দিকে; তবুও শত্রু শক্তি ক্ষীন আশা নিয়ে ঐলবিলাকে নত করতে চায়। শেষ পর্যন্ত তা পারে না। পূর্বের অঙ্কে সেকেন্দার বা তক্ষশীল দেখেছে ঐলবিলার অসীম প্রেমভক্তি, পুরুকে না পাওয়ার হতাশা বুকে বয়ে নিয়েও দেশমাতৃতাকে উদ্ধারে একনিষ্ঠ। এখানে তক্ষশীল শেষ চেষ্টা করে। অহংকার দীপ্ত সেকেন্দার যখন ঐলবিলাকে সহানুভূতি দেখাতে আসে তখন সেই সমানুভূতির কৃপার পরিবর্তে দেশীয় রাজকন্যার আঘাত হয়ে তার কাছে ফিরে আসে। নাট্যমন্দী সাধারণ দর্শক পর্যন্ত ঐলবিলার মতো ভারতীয় নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়।

তক্ষশীলের বন্দি ঐলবিলা নির্জন অরণ্যে যেন সম্পূর্ণ একা। একদিকে প্রাণহানীর ভয় অন্যদিকে মানহানির। কিন্তু তবুও নিজের বীরত্বে নিজে অবিচল থেকেছেন। প্রতিহত করেছেন বিরুদ্ধ শক্তির প্রলোভনকে। পুরুরাজকে হারানোর হতাশার যখন নিমগ্ন রানি তখনই সেকেন্দার তাকে পুরুর বেঁচে থাকার সংবাদ দেন। প্রবল প্রতাপী সেই সেকেন্দার পুরুর গর্বে গৌরাবান্বিত দেখিয়ে ঐলবিলার মন পেয়ে কপট উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে আসে। ঐলবিলার বীরত্বের কোনো সন্ধান রাখে না বলেই এমন ধৃষ্টতা দেখাতে সে সাহস পায়। স্বগতোক্তিতে যে নারী বলে –

"ঐলবিলা। আমি শুনছি আজ যবনরাজ আমাকে সান্ত্বনা করবার জন্য এখানে আসবেন, আসুন। যবনের সাধ্য নেই যে আমাকে ভুলায়। পুরুরাজ! তুমি এ বেশ জানবে, আমি তোমার অযোগ্য নই। তুমি যেমন বীরপুরুষের ন্যায় প্রাণ ত্যাগ করেছ – আমিও তেমনি বীরপত্নীর ন্যায় তোমারই অনুগামিনী হব।" [১৫]

(চতুর্থ অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

বীরের প্রতি শ্রদ্ধা, দেশমাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধায় সে এক আদর্শ ভারতীয় রমণীরূপে প্রতিভাত হয়। অথচ কপট সেকেন্দার তার মন পেতেই বলে,

"সেকেন্দর। রাজকুমারি! ক্রন্দন করুন, আমি আপনাকে নিবারণ কত্তে চাই নে। আপনার ক্রন্দনের যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু আপনি যে অশুভ সংবাদ শুনেছেন, তা মিথ্যা হলেও হতে পারে। কারণ জনরবের কথা কিছুই বলা যায় না। পুরুরাজের ন্যায় সাহসী বীরপুরুষ আমি আর কোথাও দেখি নি। যদি আমি তাঁর শত্রু, তথাপি এ আপনার কাছে আমি মুক্তকন্ঠে স্বীকার কচ্ছি। ভারতবর্ষে পদার্পণ করবার পূর্বেই আমি তাঁর নাম শুনেছিলেম। অন্যান্য রাজাদের অপেক্ষাও তাঁর যশ ও কীর্তি –" [১৬]

(চতুর্থ অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

ঐলবিলা তার গুণমুগ্ধকে কটাক্ষ করলে সেকেন্দার নিজের বীরত্বকে তুলে ধরতে অন্য পন্থা নেয়। সে যে পুরুকে আঘাত করতে চাই নি, তার সৈন্যরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে একথা প্রচার করে। একথার যে কোনো সারবত্তা থাকে না ঐলবিলা তা জনে। তবুও সেকেন্দার পুরুকে পরাজিত বলেই মনে করে। ঠিক কাঠালের আমসত্ত্বের মতো পারস্য রাজের মানসিকতা প্রকাশ পায়। তাতে অহংসর্বস্ব, পররাজ্য লোলুপ রাজার যে বীরত্বের পরিবর্তে কাপুরুষতার পরিচয় মেলে তা মুক্ত ও স্পষ্টভাবে মনে করিয়ে দিয়েছেন। তার অতি কাছের তক্ষশীলও তার বীরত্বে সংশয়ী তা এ নিচের সংলাপে প্রকাশ পেয়েছে,

"ঐলবিলা। পরের যশে পরের গুণে আপনার কি তবে ঈর্ষা হয় ? আপনি সেইজন্যই কি এত দেশ অতিক্রম করে তাঁকে নিধন কত্তে এসেছিলেন ?

সেকেন্দর। রাজকুমারি ! তা নয়। তাঁকে বধ করবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। আমি শুনেছিলেম যে, পুরুরাজকে কেহই জয় কত্তে পারে না। তাই শুনেই আমার জয়স্পৃহা উত্তেজিত হয়েছিল। আগে আমি মনে কত্তেম বুঝি আমার কীর্তি-কলাপে বিস্মিত হয়ে সমস্ত পৃথিবীর চক্ষু একমাত্র আমার উপরেই নিপাতিত রয়েছে। কিন্তু যখন শুনলেম, পৃথিবীর লোক পুরুরাজেরও জয়ঘোষণা কচ্ছে, তখন আমি বুঝলেম, পৃথিবীতে আমার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। আমি যত দেশে জয় করবার জন্য গিয়েছি, প্রায় সকল দেশই বিনা যুদ্ধে আমার নামমাত্র শুনেই আমার শরণাপন্ন হয়েছে। কিন্তু ওরূপ সহজ জয়লাভে আমার তৃপ্তি বোধ হত না। যখন পুরুরাজের নাম আমি শুনলেম, তখন ভারতভূমিকে আমার গৌরব অর্জনের উপযুক্ত ক্ষেত্র বলে মনে করলেম ; পুরুরাজের যেরূপ পৌরুষ ও বিক্রমের কথা পূর্বে শুনেছিলেন, কার্যে তার অধিক পরিচয় পেয়েছি। যখন তাঁর সমস্ত সৈন্য যুদ্ধে বিনষ্ট হয়ে গেল, তখন তিনি আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। আমি তাতে সম্মত হয়েছিলেম, আমাদের দুজনে যুদ্ধ হচ্ছিল, এমন সময়ে আমার মূঢ় সৈন্যগণ আমার আজ্ঞার বিপরীতে, পুরুরাজকে আহত করলে। সমস্ত সৈন্যের সহিত তিনি যদিও এখন পরাজিত হয়েছেন, কিন্তু এতে তাঁর গৌরবের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নি।

ঐলবিলা। হ্রাস কি, তাঁর গৌরব বরং এতে আরও বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু আপনি কি তাঁকে এইরূপ অন্যায় যুদ্ধে নিহত করে কিছুমাত্র গৌরব অর্জন কত্তে পারলেন ? আপনি জয়লাভ করেছেন, এই বলে মনকে প্রবোধ দিন। কিন্তু আপনি এ বেশ জানবেন যে, এই কাপুরুষ, পুরুষাধম তক্ষশীলও মনে মনে আপনার বিজয়ী নামে সন্দেহ কচ্ছে।"[১৭]

(চতুর্থ অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

ঐলবিলাকে আবলা রমণী বলে তুচ্ছ জ্ঞান করলে সে যে ভারতের নারীর বীরত্বকেই তুচ্ছ করে তা জানে না। জানে না, এই অবলা রমণীর জোরেই পুরু শক্তিমান এবং অবলা রমণীর তেজস্বীতায় সেকেন্দার ভূ-লুন্ঠিত। তাই তুচ্ছ জ্ঞান করেই সেকেন্দার রাণীকে পরামর্শ দেয় তক্ষশীলের সঙ্গে সুখের নীড় বাঁধতে।

চোরের সঙ্গে চোরের আঁতাত। কপটের প্রতি কপটের [১৮] এ কৃতজ্ঞতা দেশীয় দর্শক মনে স্বদেশপ্রেমকে জাগ্রত করে। দর্শক উদ্দীপিত হয়। এ হেন নরাধম মানুষের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য। এই উদ্দীপনা নতুন মাত্রা পায় তখন তেজস্বী ব্যক্তি স্বাতন্ত্রে উজ্জ্বল রমণী তক্ষশীলকে ভৎর্সনা করে। অপরাধীকে ক্ষমা করতে চায় তার জন্য কৌশল শিখিয়ে দেন। তাঁকে সেই বিদেশি রাজ্য লোলুপ সেকেন্দারের বিরুদ্ধে উদ্দীপিত করেন –

"ঐলবিলা। আমাকে সন্তুষ্ট করাবার যদি আফনার ইচ্ছা থাকে, তা হলে আমি যেরূপ যবনরাজকে ঘৃণা করি, আপনিও তাঁকে ঘৃণা করুন। যবনসৈন্যদের বিরুদ্ধে এখনি যাত্রা করুন। যবন-শোণিতে ভারতভূমি প্লাবিত করুন – মাতৃভূমিকে উদ্ধার করুন – জয়লাভ করুন – রণক্ষেত্রে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করুন।'... আমি এই পর্যন্ত বলতে পারি, তা হলে আমার নিকট আপনি ঘৃণাস্পদ হবেন না। দেখুন, পুরুরাজ নেই, তবু তাঁর সৈন্যগণের উৎসাহ কমে নি, এমন-কি আপনার সৈন্যগণও যবন-বিরুদ্ধে যুদ্ধ কত্তে উৎসুক হয়েছে। আপনি তাদের যুদ্ধে নিয়ে যান, তাদিগকে উৎসাহ প্রদান করুন – পুরুরাজের স্থলাভিষিক্ত হউন – দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন – ক্ষত্রিয়কুলের নাম রাখুন। কি! চুপ করে রয়েছেন যে? আপনার কাছে তবে কি আমি এতক্ষণ বৃথা বাক্য ব্যয় করলেম? যান – তবে আপনি দাসত্ব করুন-গে – আপনার প্রভুর পদসেবা করুন-গে – এখানে কেন আমাকে ত্যক্ত কত্তে এসেছেন?" [১৯]

(চতুর্থ অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

চতুর্থ অঙ্কের শেষে এসে রানি যেমন তক্ষশীলকে বলতে চায় তার শরীর বন্দি হলেও তার মন বন্দি হয় নি, হবে না। হাজারো প্রতিকূলতায় '.... আমার হৃদয়কে আপনি কখনোই বন্দি কত্তে পারবেন না।....' তক্ষশীল এবার অনুধাবন করে তাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া ঐলবিলার পক্ষে অসম্ভব। শুধু তাই-ই নয় রানি যে তার বিশ্বাসঘাতকতাকে ঘৃণা করে তাও বুঝতে পারে।

তাই এবার ভুল বুঝতে পারার পালা। নাট্যকার স্বদেশপ্রেমের সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে স্বদেশদ্রোহীকে ভূ-লুন্ঠিত করতে চান, তা এই অঙ্কে সুন্দর ভাবে তুলে ধরেন। বিশ্বাস ঘাতকরা কখনও কোনো হৃদয় লাভ করতে পারে না। যা পারে তা ঘৃণা, এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এবার তক্ষশীলের অনুশোচনার পালা। সেকেন্দার তাকে প্রলোভিত করলেও সেই প্রলোভনের কারণে তার প্রেমাস্পদের কাছে সে ঘৃণার পাত্র তা বুঝতে পারে। তাই বোনকে ভৎসর্না করেন, "দেখ দেখি ভগ্নি ! তোমার জন্যই তো আমার এই দশা হল। তোমার পরামর্শ শুনেছিলেম বলেই তো ওর নিকট আমাকে ঘৃণাস্পদ হতে হয়েছে, আর আমার সহ্য হয় না। আমি ওর ঘৃণিত হয়ে আর ক্ষণকালও থাকতে পাচ্ছি নে। যাই – আমি ঐ সুন্দরীর পদতলে এখনি গিয়ে পড়ি। আমি তাঁকে বলি-গে যে, আমি সেকন্দর শার বিরুদ্ধে এখনি অস্ত্র ধারণ কত্তে প্রস্তুত আছি – যুদ্ধে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি।" [২০]

(চতুর্থ অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

তাই ঐলবিলার তার প্রতি যে ঘৃণা তা আসলে স্বদেশবাসীর ঘৃণা। সেই ঘৃণা থেকে নিজেকে মুক্ত করে তার হৃদয় পাওয়ার লোভে সেকেন্দারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার পরামর্শ নেয়। ক্ষীন আশা নিয়ে যখন মানসিক প্রস্তুতি চলছে তখন জানতে পারে পুরু বেঁচে আছে। অম্বালিকা আরও ভয়ংকর সংবাদ দিলেন সসৈন্য সজ্জিত হয়ে পুরু ঐলবিলাকে উদ্ধার করতে আসছে। একথা শুনে অবিশ্বাসীর মতো আত্মস্বার্থে আঘাত প্রাপ্ত তক্ষশীল ছুটে যায় যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে।

আত্মস্বার্থে অন্ধ দেশীয়রাজা দেশকে অন্যের হাতে তুলে দিতে দ্বিধা করে না। বিদেশির কাছে ক্রীতদাস হতে আত্মমর্যাদায় ঘা দেয় না। এ পরাধীন ভারতের একমাত্র বীর পুরুর বেঁচে থাকার সংবাদে আহত হয়। দেশদ্রোহী আর কাকে বলে? তক্ষশীল নিজের প্রেমাস্পদকে হারানোর ভয়ে দেশকে বিক্রয় করতে পারে, দেশকে পররাষ্ট্রে তুলে দিতে পারে। তাই তক্ষশীল দেশদ্রোহীর এক মূর্তিমান বিগ্রহ রূপে প্রতিভাত হয়। যে নারী তার বিশ্বাসঘাতকতাকে ঘৃণা করে সেই নারীকে পাবে না জেনেও ধ্বংসের পূর্বে মানুষ যেমন উন্মত্ত হয়ে ওঠে তেমনি তক্ষশীল বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

দেশের স্বাধীনতা যাদের কাছে বড়ো, দেশের গৌরব যাতের কাছে প্রাণাধিক তারা দর্শকমনে জায়গা করে নেয়। প্রতিটি দেশবাসীর মনেই জন্ম সূত্রে নিহিত থাকে স্বদেশ প্রেম। কালাবর্তে তা সুপ্ত থাকে। এহেন নাটক দর্শনকালে সেই সুপ্ত স্বদেশপ্রেম জেগে ওঠে। নাট্যকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। দেশের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তা সাধারণ দর্শকের সামনে উঠে আসে। বিদেশি শক্তির লোলুপ রূপের উন্মোচন হয়। দর্শককে গণআন্দোলনে সামিল হয়ে বিদেশি, ব্রিটিশ শক্তিকে উৎখাত করার জন্য গণআন্দোলনের বার্তা পৌঁছে দেন। এ অঙ্কটি সে উদ্দেশ্য সাধনে চূড়ান্ত ফলপ্রসূ হয়।

‘পুরু বিক্রমের’ পঞ্চম অঙ্কে conculation এসেছে। এ অঙ্কটি তাই সমস্যা সমাধানের পালা। এ দৃশ্যটিতে প্রথম সমস্যাকে সুন্দরভাবে সমাধান করেছেন। যেখানে অপরাধী শাস্তি পেয়েছে। স্বদেশের কাছে স্বদেশদ্রোহীর কোনো স্থান নেই সেই বার্তাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বদেশের সামনে যে সমস্যা সেগুলি হল –

১. তক্ষশীলের বিশ্বাসঘাতকতা।
২. সেকেন্দারের অহংকার।
৩. অম্বালিকার অন্ধপ্রেম।
৪. পুরু ও ঐলবিলার প্রেম।
৫. স্বদেশ উদ্ধার।

প্রথম অঙ্কটিতে পুরুরাজের বিক্রম অপেক্ষা প্রেমিক হৃদয়ের রূপটিকে উৎঘাটন করা হচ্ছে। নাট্যকার কৌশলে যেমন স্বাদেশিকতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন পাশাপাশি প্রেমের ঘাত-প্রতিঘাত দেখিয়ে তার পূর্ণতা এনেছেন। তবে স্বাদেশিকতা বোধে এ অঙ্কের গুরুত্ব পেয়েছে তক্ষশীলের পরিণতিতে।

যে তক্ষশীল বিশ্বাসঘাতকরা করে দেশবাসীর কাছে তার চরম পরিণতি যে মৃত্যু তা দেখিয়ে জন সাধারণের ইচ্ছাকে পূর্ণ ও করেছেন। প্রথমে আহত পুরুকে বন্দি করতে এসেও তার সৈন্যদের

প্রতাপের কারণে তা সমর্থ হয় নি। হঠাৎ এ দেশের অন্যপ্রান্তের রাজা তক্ষশীল এ দেশের আদর্শ বীর সন্তান পুরুকে বিরোধী শক্তিতে বলবান হয়ে বন্দি করতে আসে। বিশ্বাসঘাতকের কুৎসিত, কলঙ্কিত মানসিকতার চরম রূপ প্রদর্শন হয় এখানে। যে পুরুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে এ দেশকে রক্ষা করা উচিত ছিল সেই পুরুকে বিদেশির মনবাসনা পূর্ণ করতে বন্দি করে। পুরুর জ্বলন্তক্ষতে যখন আঘাত করে, 'তোমাকে এত করে বলেছিলেম যে, সেকেন্দারশার সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে যেওনা, তা তো তুমি শুনলে না। এখন তার ফল ভোগ করো।' তক্ষশীলের এতদিনের আচরণ পুরু সহ্য করেছে কিন্তু এ অবস্থায় এ বাক্য আর সহ্য হল না। তার আস্ফালন অর্থাৎ দেশপ্রেম যে কোনো অবস্থাতে ক্ষীন হয়ে যায় না ; কোনোভাবে স্থিমিত হয় না তা প্রমাণ করল। তক্ষশীল পাপের শাস্তি পেল। নৃসংশতার চরম পরিণতি যে অবক্ষয় তা নাট্যকার দেখালেন তক্ষশীলের হত্যার মধ্য দিয়ে। পুরু বীর বিক্রমে যেমন বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সেই বিক্রমে বিশ্বাসঘাতকের উচিত শিক্ষা দিতে পারে।

"পুরু। (স্বগত) আর সহ্য হয় না। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে, গায়ে যেন এখন একটু বল পেলেম, নরাধমকে সমুচিত শাস্তি না দিয়ে থাকতে পাচ্ছি নে।

(হঠাৎ পালঙ্ক হইতে উঠিয়া অসি নিষ্কোষিত করিয়া তক্ষশীলের প্রতি আক্রমণ)

(অসি দ্বারা আঘাত করিয়া) এই নে – এই তোর পাপের উচিত প্রায়শ্চিত্ত, কিন্তু আমার অসি আজ কাপুরুষের রক্তে কলঙ্কিত হল।"[১১]

(পঞ্চম অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

এছাড়া অম্বালিকা প্রেরিত পত্রে পুরুর ঐলবিলা সম্পর্কে সংশয় প্রেমের পথে অভিমানের পালা গাঢ় করেছে। ফলে এ দৃশ্যটি দেশবৈরীকে শাস্তি দেওয়ার মধ্যে গুরুত্ব লাভ করেছে।

স্বাদেশিকতায় যেমন স্বদেশ সম্পর্কে স্বপ্ন থাকে, তেমন থাকে অন্যায়ের প্রতিবাদ। সত্য-মিথ্যার আবর্তে মিথ্যার স্থান যে হয় না তা দেখাতে এ দৃশ্যটি মূল্য পেয়েছে।

পূর্বে আলোচিত নাটকের যে সমস্যা তার দ্বিতীয় ধাপে বিদেশ গর্বী শক্তি সেকেন্দার শাহ। তার সন্ধিতে পুরু সাড়া না দেওয়ায় তার অহংবোধকে আঘাত করে তাই সেই সন্ধির কথা বার বার আসে। এ অঙ্কের দৃশ্যটিতে ও এসেছে। সেই বিদেশি শক্তির বশ্যতা স্বীকার আছে। তৃতীয় সমস্যা সমাধান অম্বালিকার অন্ধ প্রণয়ের অপমৃত্যু কারণ বিশ্বাসঘাতকতা আছে, চতুর্থ সমস্যার সমাধানে পুরু ও ঐলবিলার প্রেমের বাধা হয় নি এবং শেষে যে সমস্যা অর্থাৎ নাটকের যে উদ্দেশ্য স্বদেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠতাও বিজয় ঘোষণা তার ধ্বজা উড়ানো শুরু হয়েছে।

সেকেন্দারের সঙ্গে সন্ধি না করার ক্রোধ – "সেকেন্দার। না – পুরুরাজ আমার নিকট হতে এখন আর কোনো অনুগ্রহ প্রত্যাশা কত্তে পারেন না। আমি তাঁর সঙ্গে প্রথমে সন্ধি করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেম, কিন্তু তাঁর এত দূর স্পর্ধা যে, আমার বন্ধুত্ব অগ্রাহ্য করে তিনি আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলেন। আমি এখন পৃথিবীর যাবতীয় লোককে দৃষ্টান্তস্বরূপ এই দেখাতে চাই যে, যে সেকন্দর শার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে তার অবশেষে কি দুর্দশা উপস্থিত হয়।"[২২] (পঞ্চম অঙ্ক/দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

শেষ মুহূর্তেও অম্বালিকাকে এই রাজা বৃথা আশা দেয়। প্রলোভিত করে, বন্দি পুরুকে তার কাছে এনে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু তার পরিণতি সম্পর্কে নিশ্চিত অম্বালিকা। ঐলের মতো বীর রমণীর প্রেম তার কাপুরুষ ভ্রাতা কখনও পাবে না। অন্যদিকে তার বেঁচে থাকা হয়ে উঠবে কষ্টকর যদি না সেকেন্দার রাজ তার কাছে না থাকে। কিন্তু পুরুরাজ্য লোলুপ রাজার এবার লক্ষ্য গাঙ্গেয় প্রদেশে। অর্থাৎ কপট রাজার কাপটতা ও শেষ লগ্নে উপস্থিত।

ঐলবিলা জানলেন পুরু বেঁচে আছে তবে তক্ষশীলের অনুগ্রহে তার জীবন মৃত্যু নির্ভর করছে। আর এ কথা শুনেই বীরবিক্রমে পূর্ণ, স্বদেশপ্রেমে সিক্ত ঐলবিলা পূর্বেই মতোই তেমন ভাবে বাঁচার থেকে পুরুর মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করেন। আদর্শ ক্ষত্রিয় কখনও বিশ্বাসঘাতক কাপুরুষের অনুগ্রহ আশা করে না। দেশের জন্য মরতে গর্ববোধ করে। অবাঞ্ছিতের মতো বেঁচে সুখ ভোগ করতে পারেনা। তাই এ বীর রমনী বলেন,

"ঐলবিলা। কি বললেন ? রাজা তক্ষশীলের উপর তাঁর জীবন মৃত্যু নির্ভর কচ্ছে ? সেই কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতক, স্বদেশদ্রোহী নরাধমের হস্তে তিনি জীবন লাভ করবেন ? তাঁর এমন জীবনে কাজ নেই। ধিক্ সে জীবনে, বরং আমি তাঁর মৃত্যু সহস্র বার সহ্য করব – তবু এরূপ নীচ জঘন্য মূল্যে তাঁর জীবন ক্রয় কত্তে আমি কখনোই সম্মত হব না। তাঁর সঙ্গে ইহজীবনে যদি আর না দেখা হয়, তো পরলোকে গিয়ে মিলিত হব। আপনি কি তবে তাঁকে দগ্ধে মারবার জন্যই এতক্ষণ বাঁচিয়ে রেখেছেন ? লোকে যে সেকন্দর শার দয়া ও মহত্ত্বের কীর্তন করে, তবে কি সে এইরূপ দয়া ? এইরূপ মহত্ত্ব ? ধিক।"[২৩]

(পঞ্চম অঙ্ক/দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

কিন্তু সত্যই যে স্বদেশের জন্য আত্মনিবেদিত প্রাণ তার কখনও পরাজয় হয় না। পুরুকে অন্যায় যুদ্ধে বন্দি করে সাম্রাজ্যলোভী অহংকারী সেকেন্দার শাহ পুরুর বীরত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। বশ্যতা মেনে না নেওয়ার জন্য চরম শাস্তি দিয়ে তক্ষশীলকে ভারতের অধিশ্বর করে দেবে। কিন্তু সেকেন্দার নিজেকে যতই বীর প্রতিপন্ন করতে যাক না কেন প্রকৃত ক্ষত্রিয় সন্তান পুরুর কাছে যে ধূর্ত শৃগালের মতো। 'শৃগালের ন্যায় অলক্ষিতভাবে আক্রমণ করে যে জয়লাভ হয়, সেরূপ জয়লাভে কোনো বীর পুরুষ কখনোই উল্লসিত হন না।'

পুরুর এ সত্য ভাষন সহ্য করা পারস্যরাজের কঠিন হয়ে পড়ে, চরম ভয়াবৃহ মুহূর্তে, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়েও যে বীর কখনও মাথা নত করে না তা কিছু না হোক ক্ষমতী গর্বী বিদেশি সেকেন্দারের অহংকারকে তুচ্ছ করে দেয়। নাট্যকারের স্বদেশপ্রেম এখানে এক অপূর্ব তেজাস্বিতায় প্রতিভাত। নীতি ও কর্তব্যের মোড়কে দেশের কল্যাণ কামনা স্বদেশবাসীকে আপ্লুত করে। সে কারণে প্রাক গিরিশযুগের সর্বোৎকৃষ্ট নাটক হিসাবে 'পুরু-বিক্রমের' মান্যতা। এমন কি জাতীয়চেতনা উদ্বোধন ও স্বদেশপ্রেমের জাগরণে প্রথম নাটক [২৪] হিসাবে এ নাটকটি বিবেচ্য। ন্যায়-নীতির প্রশ্নর সামনে সেকেন্দার নাট্যকারের সামনে প্রতিভাত হয়। তাই নীতি-কর্তব্য, সত্য-মিথ্যার ধার দিয়ে না দিয়ে

রীতিমতো জল্লাদদের মতো সেকেন্দার বলেন, "সেকেন্দার। কি পুরু! তুমি এখনও নত হলে না? তোমার দেখছি, ভারি স্পর্ধা হয়েছে। এর সমুচিত শাস্তি না দিয়ে আমি তোমাকে কখনোই ছেড়ে দেব না। রাজা তক্ষশীল দেখ দিকি কেমন আমার শরণাপন্ন হয়েছেন? তুমি যদি তাঁর দৃষ্টান্তের অনুগামী হতে তা হলে তোমার পক্ষে মঙ্গল ছিল – দেখে নিও আমি মহারাজ তক্ষশীলকে সমস্ত ভারতবর্ষের অধীশ্বর করে দিয়ে যাব।"[২৫] (পঞ্চম অঙ্ক/দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

বিশ্বাসঘাতক স্বদেশবৈরী তক্ষশীল যে সে অধিশ্বর হওয়ার সুযোগ পাবে না তা পুরু জানিয়ে দেন। "... তোমার সে পরম বন্ধুর মৃতদেহ এখন আমার শিবিরের মধ্যে গড়াগড়ি যাচ্ছে।"

এ সংবাদ নাটকের গতিতে ঝংকার তুলল। বিরোধী শক্তিকে দুর্বল করে দিল। কিন্তু যখন একে স্টিয়নের কাছে এই ভারতবর্ষের স্বদেশপ্রেমী বীরদের বিক্রমের কথা শুনলেন তখন আর সেকেন্দার নিজের অহংবোধকে ধরে রাখতে পারলেন না। এ ভারতের মাটির প্রতি, ভারতের সন্তানদের দেশপ্রীতির প্রতি বিবেকের তাড়নায় নত হলেন। এ উক্তি দুটিতে তার নিদর্শন পাই –

"মহারাজ। তাদের কি বীরত্ব! আমি এমন কখনো দেখি নি। বলব কি, তাদের মধ্যে একজনও বেঁচে থাকতে আমাদিগকে পুরুরাজের গাত্র স্পর্শ কত্তে দেয় নি।

সেকন্দর। ধন্য পুরুরাজের সৈন্যগণ! এমন সৈন্য পেলে আমি সমস্ত পৃথিবী অনায়াসে জয় কত্তে পারি।...?"[২৬]

(পঞ্চম অঙ্ক/দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

নাটকের জাল গোটানোর পালা। বীর বিক্রম সেকেন্দার দেশীয় শক্তির ক্ষমতায় যেমন দুর্বল হয়ে পড়েন, ভ্রাতার মৃত্যুতে অম্বলিকাও তেমনি দুর্বল হয়ে পড়েন। এদুটি চরিত্রেরই বিবেক জাগ্রত হয়, অন্তর কথা বলে। কপটতা করেও যখন নত স্বীকার করতে হয় তখন আর কী থাকে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করার।

ঐলবিলা স্মরণ করিয়ে দেয় অম্বলিকার বিশ্বাস ঘাতকতাকে। ভ্রাতার মৃত্যুর কারণ মৃত্যু পূর্বে শুধু ভ্রাতাই বলে না। ঐলবিলা বীরত্বে সঙ্গেই বলেন, "... উনিই তো পরামর্শ দিয়ে তক্ষশীলকে ভীরু ও কাপুরুষ করে তুলেছিলেন। কিন্তু উনি যে তাঁকে বিপদ হতে রক্ষা করবার জন্য এত চেষ্টা কল্লেন, কিন্তু অবশেষে কি তাঁর প্রাণ রক্ষা কত্তে সমর্থ হলেন? কাপুরুষের মৃত্যু এইরূপেই হয়ে থাকে।"[২৭] (পঞ্চম অঙ্ক/দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক) সুশীল রায় এই দেশদ্রোহীদের চরম পরিণতি প্রসঙ্গে যে উক্তি করেন তাতে সহমত পোষন করি। নাট্যকার সচেতন ভাবেই অঙ্কন করেছেন, "যারা দেশদ্রোহী ও দেশের অকল্যাণ যাদের কাছে তুচ্ছ, আত্মকল্যাণই যাদের কাছে জীবনের পরম কাম্য তার পরিণাম এখানে দেখানো হয়েছে মর্মান্তিকভাবে। তক্ষশীল নিহত হয়েছেন, অম্বালিকা প্রত্যাঘাত হয়েছে। যাদের বিরুদ্ধে ভ্রাতা ও ভগিনীর চক্রান্ত অবেশেষে জয় হয়েছে তাদেরই– পুরু ও ঐলবিলার মিলন ঘটেছে। এঁরা স্বদেশীপ্রেমী, স্বদেশকে রক্ষা করার জন্যে এঁদের প্রচেষ্টা জয়যুক্ত।"[২৮] অর্থাৎ সেই জয়ধ্বজা উড়ানোর দিকেই এখানে প্রধান চরিত্রদ্বয়ের যাত্রা।

একদিকে ঐলবিলার প্রতি পুরুর প্রেমের হতাশা অন্যদিকে শেষ মুহূর্তে সেকেন্দারের সঙ্গে বোঝাপড়া। এই চরম সংকট মুহূর্তে দাঁড়িয়ে দুর্বল হৃদয়ে বাইরে প্রতাপ দেখিয়ে পুরুকে দর্প চূর্ণ করতে বলে। এ অপেক্ষা ভয়াবহ পরিস্থিতিতে যে ভারতীয় রাজা মাথা নত করেন নি ; এখনও যে করবেন না তাই স্বাভাবিক। তাই পুরুকে হত্যা করার জন্য যুদ্ধে অহ্বান করে। আসলে এ পর্যন্ত পুরু সেকেন্দারের ছলনাময়, বিশ্বাসঘাতক বীরত্বকে ঘৃণা করেছে এবং তক্ষশীলকে শাস্তি দিয়েছে তাই সেকেন্দার সত্যকার যুদ্ধ করে নিজের গর্বকে সমুন্নত রাখতে চেয়েছে – আহ্বান করেছে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে। যুদ্ধে পরাজিত হলে তবেই সেকেন্দার এ দেশের বুকে রাজত্ব করতে পারবে অন্য কোনোভাবে নয় – পুরু তা বোঝাবার জন্যই সেই আহ্বানকে বরণ করেছে। ইতিপূর্বে নিজের বন্দির কথা স্মরণ করে সেকেন্দারের বিশ্বাসঘাতকতাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

"পুরু। রাজকুমারি! আপনি চিন্তা করবেন না। আমি দস্যু নই। আমি বিনা কারণে, বিনা উত্তেজনায় কাহাকেও বধ করি নে। বিশেষত যে ব্যক্তি বিশ্বস্তচিত্তে আমার হাতে অসি অর্পণ করে, যুদ্ধে আহূত না হলে, বিশ্বাসঘাতকের ন্যায়, কাপুরুষের ন্যায়, আমি তার প্রতি কখনোই আক্রমণ করি নে।" [২৯]

(পঞ্চম অঙ্ক/দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

এই পরেই নাটকের বিষয় ও চরিত্ররা তাদের লক্ষ্যকে স্পর্শ করে। পুরুর সঙ্গে যুদ্ধ না করা মানে নিজের পরাজয়কে জোর করে জয়ী করার নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। পুরুর বীরত্বে অভিভূত ও শ্রদ্ধাশীল সেকেন্দার জানে সত্যই পুরুকে বন্দি করতে তারা পারেন নি। সেই জয়ী হয়েছে। নিজের অহংকারকে, স্পর্ধাকে সমর্পণ করেছে পুরুর কাছে। অর্থাৎ ভারতের কাছে মাথা নত করেছে। এ দেশীয় রাজার বীরত্ব, ক্ষত্রিয় ধর্মের সচেতনায়, কর্তব্য পরায়ণতায়, স্বদেশ ভক্তিতে ও দৃঢ় মানসিকতায় যে সে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তা বুঝতে পারে, তাই এমন বীরকে শত্রু না মনে করে বন্ধুত্ব আশা করে। অর্থাৎ বীররসে সিক্ত এই নাটক স্বদেশবাসীকে বীর মন্ত্রে দীক্ষা দেয়। সর্বশক্তি দিয়ে শত্রুকে পরাস্ত করার জন্য উজ্জীবিত করে। অথচ অজিতবাবু বলেন, ".... তাঁহার নাটকের ভাষা বীররসাত্মক হয় নাই। কথার বেগে দর্শককে উত্তেজিত না করিয়া যখন তিনি সস্তা ধরণের মাতামাতি দাপাদাপির মধ্যে বীররসের অবতারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তখন তাহা নিতান্ত তরল ও কৃত্রিম হইয়াছে।" [৩০]

কিন্তু বলতে হয়– নাটকটির খ্যাতি তার বীররসের প্রাধন্যের জন্য যেখানে অজিতবাবু বীররসের 'দাপাদাপি' হিসাবে দেখেছেন। রচয়িতার নাম-হীন নাটকটির সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্গদর্শনে লেখেন, "লেখক যে কৃতবিদ্য ও নাটকের রীতি নীতি বিলক্ষণ জানেন তাহা গ্রন্থ পড়িলেই বোধ হয়। গ্রন্থখানি বীররসপ্রধান এবং গ্রন্থে বীরোচিত বাক্যবিন্যাস বিস্তর আছে বটে, কিন্তু সকল স্থানেই যেন বীররসের খতিয়ান বলিয়া বোধ হয়।... যাহা হউক, এইরূপ কৃতবিদ্য এবং মার্জিতরুচি মহাশয়গণ নাটক প্রণয়নের ভার গ্রহণ করেন, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে, নিতান্ত পক্ষে বাঙ্গালা নাটকের বর্তমান অশ্লীলতা এবং কদর্যতা থাকিবে না।" [৩১] এই পত্রেও তার বীররসের অনেক অনুসঙ্গকেই

উদ্ধৃতসহ দেওয়া হয়েছে এবং যুক্তিসহকারে নাট্যকবির স্বদেশপ্রেমকে তুলে ধরা হয়েছে। শত্রু পক্ষের স্বীকারোক্তিতে তা আবারও স্পষ্ট হয়–

"সেকন্দর। পুরুরাজ! তোমার যে দণ্ডাজ্ঞা দিচ্ছি শ্রবণ করো – তুমি যে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেছ – শেষকাল পর্যন্ত বরাবর সমানরূপে তোমার তেজস্বিতা ও বীরত্ব প্রকাশ করে এসেছ – এত ভয় প্রদর্শনেও যে তুমি আমার নিকট নত হও নি, এতে আমি অত্যন্ত চমৎকৃত হয়েছি ও বাস্তবিক মনে মনে তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি স্বীকার কচ্ছি, তোমার উপর আমি যে জয়লাভ করেছিলেম, তাহা বাস্তবিক জয় নয়। তোমার রাজ্য তুমি ফিরে লও, আমি তা চাই নে। লৌহশৃঙ্খল হতে তুমি এখন মুক্ত হলে – এখন রাজকুমারী ঐলবিলার সহিত প্রেম-শৃঙ্খলে বন্ধ হয়ে দুজনে সুখে রাজত্ব ভোগ করো, এই একমাত্র কঠিন দণ্ড তোমাকে প্রদান করলেম। (অম্বালিকার প্রতি) রাজকুমারি! আমার এইরূপ ব্যবহারে আপনি আশ্চর্য হবেন না। সেকন্দর শা এইরূপেই প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন। আপনারও মহৎ বংশে জন্ম, আপনি পূর্বের কথা সমস্ত ভুলে গিয়ে, উদারভাবে পুরুরাজের সমস্ত দোষ মার্জনা করুন।

ঐলবিলা। (অম্বালিকার প্রতি) রাজকুমারি! আমিও আপনার নিকটে এখন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কচ্ছি যে, যে বীরপুরুষকে আপনি হৃদয় দান করেছেন, তাঁর অন্তঃকরণ বাস্তবিক মহৎ ও উদার বটে।

পুরু। (সেকন্দরের প্রতি) মহারাজ! আপনার গুণে আমি বশীভূত হলেম। আপনি যেমন স্বীকার করলেন, আপনি যে জয়লাভ করেছেন, তা বাস্তবিক জয় নয়, আমিও তেমনি আপনার কাছে মুক্তকন্ঠে স্বীকার কচ্ছি যে, আপনার অসাধারণ মহত্ত্ব ও উদারতা দেখে আমি স্বীকার কচ্ছি যে, আপনার অসাধারণ মহত্ত্ব ও উদারতা দেখে আমি অতীব চমৎকৃত হয়েছি। আজ হতে আপনি আমাকে আপনার হিতৈষী বন্ধুগণের মধ্যে গণ্য করবেন।" [৩২]

(পঞ্চম অঙ্ক/দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

ভারতের চরম শত্রুকে বন্ধুত্বপদে অভিষিক্ত করে স্বদেশের মহৎ হৃদয়ের জায়গাটিকে দেখানো হল। যাতে স্বদেশের গৌরব বর্ধিত হয়। দেশবাসী গর্ব অনুভব করে নিজেকে ভারতবাসী ভেবে। স্বদেশ চেতনা জাগ্রত করতে যার মূল্য অপরিসীম।

অর্থাৎ দ্বিতীয় সমস্যাকে সমাধান করা গেল সেকেন্দারের অহংকারের পতন হল। পাশাপাশি অম্বালিকা তার রক্তাক্ত হৃদয়ে ক্ষত বিক্ষত। তার অপরাধবোধ তাকে গভীর ট্রাজেডির সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সূত্রাকারে সাজালে সে অপরাধগুলি দাঁড়ায় –

১. দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে দিয়ে বিদেশিকে প্রণয় রূপে পাওয়ার বাসনা।
২. নিজ স্বার্থ পূর্ণ করতে স্বদেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা।

৩. সেকেন্দারকে লাভ করার জন্য ভ্রাতাকে কু-পরামর্শ দেওয়া।
৪. ভ্রাতার প্রেমাস্পদকে কাছে আনতে ঐলবিলাপুরুর প্রেমে বাধা দেওয়া।
৫. ভ্রাতাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া।
৬. সর্বোপরি আপন প্রেমস্পদকে না পাওয়া।

বিবেকের তাড়নায় সেকেন্দার বুঝেছেন এ দেশে থাকা তার পক্ষে আর মোটেই গৌরবের নয়। তাই অম্বালিকার কাছে বিদায় নিয়ে গাঙ্গেয় প্রদেশেদের দিকে নতুন রাজ্য বিস্তার করতে এদেশ ছেড়ে চলে গেছে। তাই অম্বালিকার শেষ আশা ও ব্যর্থ হল। এখন শুধু কৃতকর্মের অনুশোচনায় দগ্ধ অম্বালিকা ঐলবিলা ও পুরুর কাছে ক্ষমা চাইতে উদ্দগ্রীব হয়েছ। কারণ হৃদয়ের যন্ত্রণা লাঘব করার অন্য উপায় নেই। জানিয়েছে এরপর তার মৃত্যুই হবে শেষ ইচ্ছা।

কিন্তু অম্বালিকা সমস্যা এই অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে থেকেই গেছে। অন্যদিকে অম্বালিকা প্রেরিত পত্র ঐলবিলাও পুরুর দূরত্বকে বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই তারাও সমস্যাদীর্ণ থেকে গেছে এ দৃশ্যে। তাই নাটকের এ দৃশ্যটি খুবই গুরুত্ব পূর্ণ। সমস্ত অশুভ শক্তিকে ধ্বংস করে শুভ শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। নাটকের লক্ষকে স্পর্শ করতে সাহায্য করেছে। তবুও কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে গেছে বলে মনে হয়।

এক। সেকেন্দারের প্রতাপও অহংকার এতই প্রবল যে এত সহজে পুরুর বশ্যতা স্বীকার করেছে সামান্য দুটি কারণে –

ক. পুরুর হাতে তক্ষশীলের মৃত্যু শুনে।
খ. এফেস্টিয়নের কাছে পুরু সেনার বীরত্ব শুনে।

অথচ এ বীরত্ব সেকেন্দার আগে চাক্ষুস করেছে। তবে বশ্যতা স্বীকার করার জন্য নাট্যকার যে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন তা ভারততনয় পুরুর আত্মমর্যাদা ও চরম প্রতিকূলতার সামনে মাথা নত না করার জন্য, স্বদেশের প্রতি প্রেমের জন্য। হয়ত নাট্যকারের উদ্দেশ্য সিন্ধ হয়েছে। তথাপি গর্ভাঙ্ক ভাগ করে যদি এমন কোনো পরিস্থিতির সামনে সেকেন্দারকে বাধ্য করতো পুরুর কাছে মাথা নত করতে তবে তা সঙ্গত হোতো। এবং ভারতবাসী পাপীকে ও যে ক্ষমা করতে পারে তা দেখানো যেত অন্যভাবে। অর্থাৎ মহত্ত্বোর পরিচয় পেত তাকে হত্যার মধ্যে নয় তাকে ক্ষমার মধ্যেই। তাহলে দর্শক মনও আরও তৃপ্ত হত। প্রতারকের উচিত শিক্ষায় বিদেশি শক্তির সামনে সংগ্রাম করতে অনেক বেশি প্রেরণা পেত।

দুই। যে অম্বালিকা সেকেন্দারকে পাওয়ার জন্য ক্ষত্রিয় রমণী হয়েও দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ ; ভ্রাতাকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে তাতে তারও শাস্তি প্রাপ্য ছিল। তবে তারও মনোভাবের পরিবর্তন হঠাৎ করে হয়েছে। কোনো সূচনা ছাড়াই হঠাৎ করে তা হয়েছে। দেশমাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধায়, স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে যদি চরিত্রটি সংশোধন হোতো তবে স্বদেশপ্রেমকে অনেকবেশি উজ্জীবিত

করতে পারত। দেশের প্রতি ভালোবাসা ব্যক্তি প্রেম অপেক্ষা অনেক মর্যাদার ও আত্মসম্মানের তা দেখানোর সুযোগ ছিল। নাট্যকার যেন হঠাৎ করেই Conculation এর দিকে ঝোঁক দিয়ে ফেলেছেন।

তিন। যে স্বদেশপ্রেমে জারিত করে চরিত্রগুলিকে নাট্যকার এগিয়ে আনছিলেন তার গতি কিছুটা হলেও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে এ অঙ্কটিতে।

সর্বোপরি নাটকটির প্লট নির্মাণেও চরিত্র বিন্যাসে নাট্যকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। নাটকটির আগাগোড়া স্বদেশপ্রেমে পূর্ণ। ইংরেজ মোহমুক্তির যুগে স্বদেশবাসীকে জাতীয়তাবোধে উন্নীত করতে, গণজাগরণ সৃষ্টিতে সফল হয়েছে।

এছাড়াও ব্রিটিশ শক্তির অত্যাচারী রূপটিকে যবনরাজের আলোকে এ নাটকে কোথাও সেভাবে দেখানো হয়নি। দেখানোর অনেক সুযোগ ছিল। নাট্যকার তার সদ্ব্যবহার করেন নি। আসলে নাট্যকারের মধ্যে ব্রিটিশি শক্তির প্রতি কোথাও আনুগত্য ছিল। একটি পত্রে সে মানসকিতার প্রকাশ দেখি। প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে একটি পত্রে লেখেন, "আমাদের সভ্যতার যাহা ভালো তাহা বজায় রাখিতে হইবে এবং ইউরোপীয় সভ্যতার যাহা ভালো তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। এই মধ্যপন্থাই সমাজ সংস্কারের প্রকৃষ্ট পন্থা।" [৩৩]

এ নাটকটি রঙ্গমঞ্চে অভিনয়কালে বাঙালি মনকে উজ্জীবিত করতে পেরেছিল। স্বদেশপ্রেমকে স্বদেশবাসীর রক্তের মধ্যে অন্বিষ্ট করেছিল। উদ্দেশ্য সাধনে সার্থক হলেও সমাজবাস্তবতা থেকে তা অনেক দূরে। বীর চরিত্রগুলি এতই বড়ো হয়ে প্রতিভাত যে তাকে শ্রদ্ধা করে প্রেরণা পাওয়া যায় কিন্তু স্পর্শ করে তৃপ্তি পাওয়া যায় না।

'পুরু বিক্রম' নাটকের গানে স্বাদেশিকতা ঃ-

নাটকটির বিষয় বস্তুকে শুধু বীরত্বের প্রকাশ আছে তা নয়, নাটকে সন্নেবেশিত গানগুলিও কাহিনির ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে দারুণভাবে একাত্ম হয়ে গেছে। গানের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র 'রিলিফ' তা না হয়ে নাট্য কাহিনির অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

এ নাটকে মোট গান – তিনটি।

এক।। মিলে সবে ভারত সন্তান, একতান - মন - প্রাণ
গাও ভারতের যশো গান। (প্রথম অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্গ)

দুই।। আগে করিয়া যতন কেন মজাইলে মন।
প্রেমফাঁসি গলে দিয়ে বাধিলে জীবন।। (পঞ্চম অঙ্ক/দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

তিন।। যাবত জীবন রতে করো ভালোবাসিব না।
ভালোবেসে এই হল, ভালোবাসার কি লাঞ্ছনা।। (পঞ্চম অঙ্ক/দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

এবং একটি স্তোত্র – ওঠ! জাগ! বীরগণ! দুর্দান্ত যবনগণ
গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ। (তৃতীয় অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

তবে প্রথম গানটি তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে, প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে এবং তৃতীয় অঙ্কের প্রথমও দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে। প্রথমবার গানটি সম্পূর্ণ, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ার আংশিক। দ্বিতীয়বার গানটি নেপথ্য থেকে গীত হয়েছে। তবে শুধু একটি চরণ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গানটি প্রেমের। সেখানে স্বদেশের কোনো স্তুতি নেই। এবং স্তোত্রটিতে স্বদেশবন্দনা আছে।

প্রথম গানটি যার কন্ঠে গীত হয়েছে সেই উদাসিনীও স্বদেশের বাৎসল্যে পূর্ণ। তার জীবন বৃত্তান্তও চমৎকার। সে অনাথিনী, তার পাঁচ ভাই যারা রাজকুমারী ঐলবিলার সৈন্যদলের সেনানী। সে নিজে একজনকে ভালোবাসে প্রতারিত হয়েছে। তাই সে ব্যক্তি প্রেমের সংকীর্ণতাকে কাটিয়ে দেশপ্রেমে উদ্বেলিত। সেও বীর রমণীর মতো বলে,

"গায়িকা। রাজকুমারি! আমি একজনকে প্রাণের সহিত ভালোবাসতেম, কিন্তু সে নির্দয় হয়ে আমাকে পরিত্যাগ করেছে। সেই অবধি আমি এই প্রতিজ্ঞা করেছি, মানুষকে আর আমি ভালোবাসব না। সেই অবধি আমি স্বদেশকে পতিত্বে বরণ করেছি, আমি দেশকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি। আমি দেশের জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতে পারি। আমার আর কোনো কাজ নাই, আমি এই গানটি (মিলে মনে ভারত সন্তান) সকল জায়গায় গেয়ে গেয়ে বেড়াই, এই আমার একমাত্র ব্রত হয়েছে। আমার যে পাঁচ ভাই আপনার সৈন্যদলের মধ্যে নিবিষ্ট আছেন, তাঁদের প্রত্যেককেই এই গানটি আমি শিখিয়ে দিয়েছি ও তাঁদের আমি বলে দিয়েছি যে, এই গানটি গেয়ে যেন তাঁরা সকল সৈন্যগণের মধ্যে দেশানুরাগ প্রজ্বলিত করে দেন।"[৩৪]

(প্রথম অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

তারই কন্ঠে অত্যন্ত খাপ খেয়েছে এ গানটি। স্বদেশপ্রেম যে কীভাবে মানুষকে নেশা ধরায় তা দেখানো হয়েছে এখানে। গানের বিষয়বস্তু নাট্যকাহিনিকে সংপৃক্ত করেছে। পৃথিবীতে ভারতভূমির মতো কোনো স্থান নেই। তাই ভয়হীন কন্ঠে সেই ভারতের জয়গান গাওয়া হোক। রূপবতী সাব্বীমতীর দেশ এই ভারত দেশ, ভীষ্ম অর্জুন প্রমুখ বীরদের ও বীরভূমি তাকে রক্ষা করতে ভয় কীসের। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা ভারতের জয় সূচিত করবে– এ বাণী এখানে প্রতিষ্ঠিত। নাটকেও গানটির সন্নিবেশ ঘটেছে দারুণ এক সময়ে। দেশীয় রাজাদের অনৈক্যভাবে ভাবিত রাণী ঐলবিলা যখন পাঞ্জাব প্রদেশে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তখন এ গান শুনে বীর রাজকন্যা নিজের অবেগকে ধরে রাখতে পারেন নি,

"*ঐলবিলা।* *তোমার গান শুনলে কোন হৃদয়ে না দেশানুরাগ প্রজ্বলিত হয়? কে না দেশের জন্য* অনায়াসে প্রাণ দিতে পারে? ধন্য সেই কবি, যিনি এ গানটি রচনা করেছেন। তুমি কি সকল জায়গায় এইরকম গান পেরেই বেড়াও?.... আমরা যে স্ত্রীলোক, আমাদেরই মন যখন এই গানে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, তখন যে বীরপুরুষগণের মন উত্তেজিত

হবে, তার আর কোনো সন্দেহ নাই। যাও, তুমি ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে, নগরে নগরে, গ্রাম গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে গিয়ে এই গানটি গাওগে। যতদিন না হিমালয় হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমস্ত ভারতভূমি এক উৎসাহানলে প্রজ্বলিত হয়, ততদিন তোমার কার্য শেষ হল, এরূপ মনে কোরো না, ভগবান করুন, যেন তোমার এই মহৎ সংকল্পটি সুসিন্ধ হয়।

গায়িকা। রাজকুমারি ! এই কার্যে আমি প্রাণ সমর্পণ করেছি, ভগবান অবশ্যই আমার সংকল্প সিন্ধ করবেন। সেই শুভদিনের অভ্যুদয় আমি আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা কচ্ছি।'' [৩৫]

(প্রথম অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক

রানির মনের কথা শোনা যায় উদাসিনীর কন্ঠে। তাঁর ও লক্ষ্য স্বদেশের স্বাধীনতা। দেশের যুবকেরা যখন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শত্রুকে পরাজিত করার সংকল্প নেয় ; তখন এই নারীর গান সেই সংগ্রামী যুবকদের শক্তি জোগায়। অর্থাৎ উদ্দেশ্য পূরণে স্বদেশের প্রতি এই ভিন্নমুখী দিক নাটকটিকে স্বদেশচেতনার নাটক হিসাবে চরম মাত্রা দান করেছে। স্বদেশের প্রতিএই নিঃস্বার্থ অনুরাগ চরিত্রটিকে বীরত্বের মহিমা দান করেছে। স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত বলেই, লক্ষ্য পূরণে সচেষ্ট বলেই এ গানটি উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত সময়ে গীত হয়ে দেশপ্রীতি বোধকে উচ্চাসনে নিয়ে গেছে।

গানটি রচনা করেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিগ্রন্থে 'সাহিত্য চর্চা ও সমাজ সংস্কার' অংশ বলেছেন, ''সত্যেন্দ্রনাথের 'গাও ভারতের জয়' গানটি 'পুরু বিক্রমে' সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছিল। হিন্দুমেলার সময়ে বিষ্ণুবাবু এই গানটিতে একটা চলিত খাম্বাজ সুর বসাইয়া দিয়াছিলেন – সে সুরে যেন তেমন জোর ছিল না। পরে গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ গানটির বেশ জোরালো সুর দিয়াছিলেন, সেই সুরেই ইহা এখনও গীত হয়।'' [৩৬]

গানটির রচনাকাল ও জাতীয়তাবাদ উন্মেষের চরম মুহূর্তে। ঐ গ্রন্থের টীকা অংশে উল্লেখানুসারে, গানটি সতেন্দ্রনাথ রচনা করেন ১৮৬৮ সালে, হিন্দু মেলার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে। নাট্যকার ও উচ্চমানের গীতিকার ছিলেন তাই গানটিকে সার্থকভাবেই তা নাটকে সন্নিবেশিত করেছেন। গানের প্রতিটি ছত্রে স্বদেশের জয়গান, স্বদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য, ভারতীয় পুরাণের কথা এসেছে। এবং সে সময় এই গানটাই ছিল বাঙালির অন্যতম জাতীয় সংগীত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখিত বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উদ্ধৃত ও গ্রহণযোগ্য, ''এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয়- কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্ম্মদা গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক। পূর্ব-পশ্চিম সাগরের গভীর গর্জ্জনে মন্ত্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটী ভারতবাসীর হৃদয়-যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।'' [৩৭] বঙ্কিমচন্দ্রের মতো স্বদেশপ্রেমি মহাপুরুষও এ গানে আপ্লুত হয়েছেন। তিনি এ গানকে জাতীয় সংগীতের মর্যদা দিয়েছেন।

এ গানটি নাটকে আরও দু'বার চরম সময়ে গীত হয়ে দেশপ্রেমের গতিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে যখন পুরুরাজ সেকেন্দারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার জন্য সৈন্যসহ প্রস্তুত

ঠিক তখনই নেপথ্য থেকে এ গান একবার গীত হয়েছে। তবে নাট্যকার একাট চরণকে, একবার মাত্র গীত হওয়ার কথা বলেছেন।

আসলে স্বদেশের সম্মানরক্ষায় যারা আজ সংগ্রামে ব্রতী তাদের বহুশ্রুত এই গান। এ গান থেকে সৈন্যদের জাতীয় বন্দনা তাই প্রথম চরণটি গেয়েই সম্পূর্ণ গানের শক্তি তাদের রক্তকে উজ্জীবিত করেছে। যে সময় আত্মশক্তির প্রয়োজন, যে সময় দেশমাতৃকার গৌরব গাথাকে স্মরণ করা দরকার তখনই এ গান গীত হয়, অন্যদিকে পুরুর প্রেরণা – এই দুই শক্তিতে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী হয়ে ওঠে ভরপুর স্বদেশপ্রেমী।

তৃতীয়বার গানটি শোনা যায় এই অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে। এখানেও উদাসিনী গেয়েছে। বন্দি ঐলবিলা যখন যুদ্ধের ফলাফল নিয়ে উদগ্রীব ; যখন লেখা পত্রখানি পুরুরাজকে পাঠানো খুব জরুরি। চারপাশে এমন কোনো হিতাকাঙ্খী নেই যে এ কাজ করে তখনই এ গানের সুরে প্লাবিত হয় সেই বন্দিপুরীর পরিবেশ। উদাসিনীকে দেখে আশ্বস্ত হন রাজকুমারী। আপাত হীন শক্তি ঐলবিলাকে আবার নতুন করে স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত করে এই চরিত্রটি।

এই দৃশ্যে উদাসিনীর দেশভক্তি আবারও প্রস্ফুটিত হতে দেখি। নরাধম তক্ষশীলের সৈনদেরকে সে গানের সুরে আপ্লুত করে। তক্ষশীলের মতো দেশবৈরীকে ভর্ৎসনা করে। দেশের জন্য যে সে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে তা স্বীকার করে।

“উদাসিনী।	কি রাজকুমারী! আপনি এখানে বন্দী হয়েছেন? রাজা তক্ষশীল, আমাদের দেশের একজন প্রধান রাজা, তিনি স্বদেশকে পরিত্যাগ করে শত্রুগণের সহিত যোগ দিয়েছেন? তি আশ্চর্য। ভারতভূমি এরূপ নরাধমকেও গর্ভে ধারণ করেন? হা ভারতভূমি! এখন, জানলেম, বিধাতা তোমার কপালে অনকে দুঃখ লিখেছেন। রাজকুমারি! আপনাকে আমি এখন কি করে উদ্ধার করি, ভেবে পাচ্ছি নে! (চিন্তা করিয়া) রাজা তক্ষশীলের সৈন্যগণ আমার গানে অনেকে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। দেখি, যদি তাদের দ্বারা আপনাকে উদ্ধার করতে পারি।
ঐলবিলা।	তোমার আর-কিছু কত্তে হবে না, যদি এই পত্রখানি তুমি পুরুরাজের হস্তে দিয়ে আসতে পার, তা হলে আমি এই কারাগার হতে মুক্ত হলেও হতে পারি।
উদাসিনী।	রাজকুমারি! আমাকে দিন না। তিনি যদি এখন ভীষণ সমরতরঙ্গের মধ্যেও থাকেন, আমি নির্ভয়ে সেখানে গিয়ে আপনার পত্রখানি দিয়ে আসব। আপনার জন্য, দেশের জন্য, আমি কি না কত্তে পারি?
ঐলবিলা।	এই নেও, তুমি আমার বড়ো উপকার কল্লে। (পত্র প্রদান)।
উদাসিনী।	ও কথা বলবেন না রাজকুমারি! আমার ব্রতই এই। আমি চললাম।”[৩৮]

(তৃতীয় অঙ্ক/দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

আর এখানেই উদাসিনী শুধু গানের প্রয়োজনে একজন গায়িকা থাকে না। হয়ে ওঠে বীর রমণীদের, বীর রাজাদের সমকক্ষ। যার হৃদয়ে এত স্বাদেশিকতা সেও একশ্রেণির দর্শককে আপ্লুত করে। ফলে বলা যায়, নাটকে সন্নিবেশিত শুধু এই গানটিই নাটকটির মূল বাণী হয়ে ধরা দিয়েছে। স্বদেশচেতনা জাগ্রত করার ক্ষেত্রে এই একটি গান নাট্যকারের উদ্দেশ্যকে একাই সফল করে।

পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে সন্নিবেশিত হয় দুটি গান। গীত হয় অম্বালিকার কন্ঠে। প্রথমটি হল – 'আগে করিয়া যতন কেন সাজাইলে মন'। দ্বিতীয়টি 'যাবত জীবন রবে যারে ভালোবাসিনা'। গান দুটি অম্বালিকার পরিণতি সাধনকে সমর্থন করাও কপোট প্রেমের ফলকে দেখানোর জন্য গান দুটির প্রয়োগে সরাসরি স্বদেশের কোনো অনুসঙ্গ এখানে আসেনি।

প্রথম গানটি নাট্যকারের নিজের রচনা। দ্বিতীয়টি শ্রীধর কথক-এর রচনা। আবার এও জানা যায়, "পুরু বিক্রমের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৭৯ / ১২৮৬, পৃ- ৮৮-৮৯) নাট্যকার সংযোজন করেন অনুজ রবীন্দ্রনাথের গান, 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন।' অবশ্য পরবর্তী সংস্করণে (১৯০০ / ১৩০৭) গানটিকে আবার বাদ দেওয়া হয়।" [৩৯]

এ গান ছাড়াও স্বদেশীভাব জাগ্রত করতে এ নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে দেশাত্মবোধক স্তোত্র। এটি তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্গে উদাসিনীর গানের পরেই সন্নিবেশিত হয়। পুরুও তাঁর সৈন্যরা মিলে এ স্তোত্র উচ্চারণ করে আপন তেজও বীরত্বকে একবার শানিয়ে নেয় যুদ্ধ যাওয়ার প্রস্তুতি মুর্হূতে।

এই স্তোত্র ও স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করতে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মতো ব্যবহৃত হয়েছে। গানের প্রতিটি ছত্রে স্বদেশবাসীকে উদ্দীপিত করার শব্দ আছে। বীরগণকে জাগ্রত করার আহ্বান, যবনকে উৎখাত করার মন্ত্র আছে। বীর প্রসবিনী ভারতের জয়ধ্বনি আছে। পুরু গেয়েছেন, সেই সঙ্গে সুর মিলিয়ে সৈন্যরাও গেয়েছেন। যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠেছে স্বদেশমন্ত্রে মন্দ্রিত। এখানে স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনে নিজের প্রাণ বিসর্জনের অঙ্গীকার আছে। এক কথায় এই বন্দনাতে সমগ্র নাটকের সার কথাকে তুলে ধরা হয়েছে।

"পুরু। ওঠ! জাগ! বীরগণ! দুর্দান্ত যবনগণ,
গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ
হও সবে একপ্রাণ, মাতৃভূমি কর ত্রাণ,
শত্রুদলে করহ নিঃশেষ॥
বিলম্ব না সহে আর, উলঙ্গিয়ে তলবার
জ্বলন্ত অনলসম চল সবে রণে।
বিজয়নিশান দেখ উড়িছে গগনে॥
যবনের রক্ত ধরা হোক প্লবমান,
যবনের রক্তে নদী হোক বহমান,
যবন-শোণিত-বৃষ্টি করুক বিমান,
ভারতের ক্ষেত্র তাহে হোক ফলবান।

সৈন্যগণ। (উৎসাহের সহিত)
যবনের রক্ত ধরা হোক প্লবমান,
যবনের রক্তে নদী হোক বহমান,
যবন-শোণিত-বৃষ্টি করুক বিমান,
ভারতের ক্ষেত্র তাহে হোক ফলবান।

পুরু। এত স্পর্ধা যবনের, স্বাধীনতা ভারতের
অনায়াসে করিবে হরণ ?
তারা কি করেছে মনে, সমস্ত ভারতভূমে
পুরুষ নাহিক একজন ?
"বীর-যোনি এই ভূমি যত বীরের জননী,"
না জানে এ কথা তারা অবোধ যবন।
দাও শিক্ষা সমুচিত, দেখুক বিক্রম॥
ক্ষত্রিয়-বিক্রমে আজ কাঁপুক মেদিনী,
জ্বলুক ক্ষত্রিয়-তেজ দীপ্ত দিনমণি,
ক্ষত্রিয়ের অসি হোক জ্বলন্ত অশনি,
চৌদ্দ লোক কেঁপে যাক শুনি সেই ধ্বনি।

সৈন্যগণ। (উৎসাহের সহিত)
ক্ষত্রিয়-বিক্রমে আজ কাঁপুক মেদিনী,
জ্বলুক ক্ষত্রিয়-তেজ দীপ্ত দিনমণি,
ক্ষত্রিয়ের অসি হোক জ্বলন্ত অশনি,
চৌদ্দ লোক কেঁপে যাক শুনি সেই ধ্বনি।

পুরু। পিতৃপিতামহ সবে ছাড়ি দুঃখময় ভবে
গিয়াছেন চলি যাঁরা পুণ্য দিব্যধাম
রয়েছেন নেত্রপাতি, দেখো যেন যশোভাতি
না হয় মলিন — থাকে ক্ষত্রকুল নাম॥
স্বদেশ উদ্ধার তরে মরণে যে ভয় করে
ধিক সেই কাপুরুষে, শত ধিক তারে,
পচুক সে চিরকাল দাসত্ব-আঁধারে।
স্বাধীনতা বিনিময়ে কি হবে সে প্রাণ লয়ে ?
যে ধরে এমন প্রাণ ধিক বলি তারে॥
যায় যাক প্রাণ যাক, স্বাধীনতা বেঁচে থাক,
বেঁচে থাক চিরকাল দেশের গৌরব।

বিলম্ব নাহিক আর, খোলো সবে তলবার,
ঐ শোনো ঐ শোনো যবনের রব।
এই বার বীরগণ ! করো সবে দৃঢ় পণ,
মরণশরণ কিম্বা যবননিধন,
যবননিধন কিম্বা মরণশরণ,
শরীরপতন কিম্বা বিজয়সাধন।
সৈন্যগণ। (উৎসাহের সহিত)
মরণশরণ কিম্বা যবননিধন,
যবননিধন কিম্বা মরণশরণ,
শরীরপতন কিম্বা বিজয়সাধন।"[৪০] (তৃতীয় অঙ্ক/দ্বিতীয় গর্ভাঙ্গ)

ফলে নাটকের চরিত্রগুলিকে দুটি দলে ভাগ করে যে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল। তার মধ্যে দেশীয় শক্তি শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য স্থানে পৌঁছে যেতে পেরেছে। আর সেই লক্ষ্য স্পর্শ করতে অনবরত সাহায্য করেছে এই গানও স্তোত্রগুলি। দেহে রক্ত সঞ্চারের মতো এই গানগুলির সুর তাদেরকে শক্তি যুগিয়েছে। তাই স্বদেশ চেতনাকে জাগ্রত করতে, স্বদেশকে বিদেশির হাত থেকে রক্ষা করতে গানের গুরুত্ব অপরিসীম হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মধ্যপন্থা অবলম্বন করেও নাটকটিতে স্বদেশচেতনাকে জাগ্রত করতে পেরেছেন তা প্রমাণিত হয়েছে। সে চেতনা খুব উগ্র নয়, তবে শান্ত হলেও দাবি পূরণে সক্ষম। স্বদেশপ্রেমি নাট্যকারের এ নাটক তাই স্বদেশবাসীর বেদস্বরূপ বিবেচিত।

অধ্যাপক অজিত কুমার ঘোষ এ নাটকের পরিণতি সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তা সত্য নয়। তাঁর বক্তব্য, "স্বাধীন ভারতের সৌর্য বীর্য প্রদর্শন করা নাট্যকারের অভিপ্রেত হইলেও নাটকের শেষের দিকে পুরু-ঐলবিলা তক্ষশীল-অম্বালিকা ঘটিত প্রেম এবং ঈর্ষামূলক ঘটনাবলাই বেশি প্রধান্য লাভ করিয়াছে।"[৪১]

নাটকের শেষের দিক বলতে যদি চতুর্থ অঙ্ক থেকে পঞ্চম অঙ্কের মধ্যে আলোচনা সীমাবন্ধ রাখি, তবে বলব নাটকটির তৃতীয় অঙ্কে Climax এখানে দ্বন্দ্ব চরম মাত্রা ধারণ করে। চতুর্থ অঙ্কে Falling Action শুরু। অর্থাৎ নাটকে উত্থিত দ্বন্দ্বের অবসান না ঘটলে তো নাট্যকারের মুক্তি নেই। এ নাটকে সুস্পষ্ট দুটি দ্বন্দ্ব।

(এক) দেশীয় শক্তির সঙ্গে বিদেশি শক্তি আর বিদেশি শক্তির সহায়ক দেশিয় রাজার।

(দুই) পুরু, ঐলবিলা ও তক্ষশীলের ত্রিভুজ প্রণয় আর সেকেন্দার ও অম্বালিকার প্রণয়।

নাট্যকার কৌশলে চতুর্থ অঙ্কে কোনো দৃশ্য বিভাজন না ঘটিয়ে ত্রিভুজ প্রাণ দ্বন্দ্বের সমাধানের পথ করে নিলেন তক্ষশীল প্রেমাস্পদকে না পাওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে। পাশাপাশি সেকেন্দার নিজ অহংকারে ভর করে ঐলবিলাকে 'এক্সপ্লয়েট' করতে চেয়েছ। যবন রাজের এ হেন হীন মানসিকতার

প্রতিবাদ এখানে আছে। আর সবচেয়ে বেশি কিছু যদি থেকেই থাকে তা হল দেশদ্রোহীর প্রতি দেশপ্রেমিকের ঘৃণা। আর শেষবারের মতো বাঁচার জন্য মানুষ যেমন খড়কুটোকে অবলম্বন করে তেমনই মৃতপ্রায় বীরকে বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছেন যা তার স্বদেশ প্রেমেরই দ্যোতক। নিচের সংলাপে তা স্পষ্ট হবে –

"ঐলবিলা। আমাকে সন্তুষ্ট করবার যদি আপনার ইচ্ছা থাকে, তা হলে আমি যেরূপ যবনরাজকে ঘৃণা করি, আপনিও তাঁকে ঘৃণা করুন। যবন সৈন্যদের বিরুদ্ধে এখনি যাত্রা করুন। যবন শোনিতে ভারতভূমি প্লাবিত করুন – মাতৃভূমিকে উদ্ধার কুরন – জয় লাভ করুন – রণক্ষেত্র প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করুন।... ঐলবিলা। আমি এই পর্যন্ত বলতে পারি, তা হলে আমার নিকট আপনি ঘৃণাস্পদ হবেন না। দেখুন, পুরু রাজ নেই, তবু তাঁর সৈন্যগণের উৎসাহ কমেনি, এমন কি আপনার সৈন্যগণও যবন বিরুদ্ধে যুদ্ধ কত্তে উৎসুক হয়েছে। আপনি তাদের যুদ্ধে নিয়ে যান, তাদিগকে উৎসাহ প্রদান করুন– পুরুরাজের স্থলাভিষিক্ত হউন – দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন – ক্ষত্রিয় কূলের নাম রাখুন।...."[৪২]

(চতুর্থ অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

পঞ্চম অঙ্কের দুটি দৃশ্যে কিন্তু নাট্যকার স্বদেশ ভূমিরই জয়ধ্বজা উড়িয়েছেন। দেশবৈরীর শাস্তি প্রদান ও বিশ্বাসঘাতক অম্বালিকাকে পরাদেশিকে বিশ্বাস করার পরিণতি দেখিয়ে 'নির্গুণ স্বজন শ্রেয় পর পর সদা।' অর্থাৎ স্বদেশ চেতনাকেই জয়ী করিয়েছেন। Conculation -এর জন্য যতটা না দিলেই নয় ততটাই 'প্রেম ও ঈর্ষা' প্রাধান্য পেয়েছে তবে বীররস লঙ্ঘিত হয়নি। তবে অজিতবাবুর মন্তব্য একেবারে অস্বীকার করার নয় 'প্রেম ও ঈর্ষা ঘটনাবলী' এখানে আছে অবশ্যই তবে নাট্যকার স্বদেশ চেতনার যে উদ্দেশ্য নিয়ে নেমেছেন তাকেই প্রধান করেছেন।[৪৩] দ্বন্দ্বের অবসানে নাটকের পরিণতি সম্বন্ধে এ অংশ টুকুর প্রয়োজন অবশ্যই ছিল। ফলে ঐলবিলার হৃদয়বত্তার লীলাদ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ার অভিযোগও টেকে না।

বরং রানি ঐলবিলা প্রানাধিক প্রিয় প্রেমাস্পদের মৃত্যু সংবাদে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে অর্থাৎ স্বদেশপ্রাণতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তা তো বার বার দেখানো হয়েছে। তবে শেষ দিকে যখন ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে তখন তার হৃদয়ের কথা এসেছে। ইতপূর্বে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে কিন্তুনিজের বীরত্বকে ম্লান হতে দেয়নি একবারও। স্বদেশচেতনার পাশাপাশি রোমান্টিকতা পরিস্ফুটনে ঐলবিলার হৃদয়ের কথা আছে ঠিকই তবে তা তার স্বদেশভক্তিকে ছাড়িয়ে নয়।

যাই হোক সমালোচকের কিছু মতকে সমর্থন করা যায় তা আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্বেই বলা হয়েছে। তবুও সমর্থন যোগ্য কথাগুলি হল –

এক॥ "তক্ষশীলের মুখে সামান্য শ্লেষবাক্য শুনিয়া পুরু ক্রোধে দিশাহারা হইয়া তাহাকে হত্যা করিয়া বসিলেন – ইহা যেমন পুরুর বীরত্ব ও মহত্ব ধুলিসাৎ করিয়া দিয়াছে, তেমনি তক্ষশীলের

চরিত্র আকস্মিক এবং অপূর্ণভাবে শেষ করিয়াছে। এখানে পুরুরাজের মহত্ব একেবারে ধূলণ্ঠিত হয়নি। তবে কিছুটা কালিমালিপ্ত হয়েছে একথা মেনে নেওয়া যায়।...

দুই॥ অম্বালিকার প্রেমমুগ্ধ সেকেন্দারের চরিত্রের মধ্যে বিরাট মহত্ব এবং সংহত গাম্ভীর্য ফুটিয়া উঠে নাই।...

তিন॥ অম্বালিকার বিষাদান্ত পরিণতিতে পুরু এবং ঐলবিলার মিলনের আনন্দম্লান হইয়া গিয়াছে।" [৪৪]

এতৎসত্ত্বেও 'পুরুবিক্রম' স্বদেশ প্রেমেরই নাটক। নবগোপালমিত্রের উদ্যোগে ১৮৬৭ সালে সংগঠিত হিন্দু মেলার ফলস্বরূপ স্বদেশপ্রেমের এই নাটক "জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির উদ্যোগে হিন্দুমেলার মধ্য দিয়া যে দেশানুরাগের উৎসাহ জাগিতেছিল, সাহিত্যে তাহার মুখ্য অভিব্যক্তি হইল পুরুবিক্রম।... পুরুবিক্রমের বীররস অবাস্তব, যুদ্ধের ও দ্বন্দ্বযুদ্ধের বর্ণনা থিয়েটারি ধরণের। কিন্তু সমগ্রভাবে দেখিলে পুরুবিক্রমে যে অকৃত্রিম দেশানুরাগ রস উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। লেখকের মধ্যম অগ্রজ সতেন্দ্রনাথ রচিত 'মিলে সবে ভারত সন্তান' গানটিতে নাটকের মর্ম কথাটি গুঞ্জরিত হইয়াছে। নাটকে অপর যে দুইটি স্বদেশ সঙ্গীত আছে সেগুলিও সেকালে খুব চলিত হইয়াছিল।" [৪৫]

নাটকটির কদর প্রসঙ্গে অমৃতলাল বসু স্মৃতি কথায় লিখেছেন – "তিনি (গিরিশচন্দ্র) নাট্যপ্রধান, অভিনয়কলার সাধনাই তাঁহার ধ্যান, অনুবর্ত্তী নট আমরা ঐভাবে নাটক অভিনয় করবার পিপাসায় একখানি ভাল নাটকের জন্য হাহা করে বেড়িইছি ; প্রমাণ, যেই সংবাদ পেলাম যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'পুরুবিক্রম' নাম দিয়ে একখানি নাটক লিখেছেন, অমনি নগেনেতে আমাতে ছুটে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে সবিনয়ে অভিনয়ের অনুমতি এনেছি।" [৪৬]

স্বয়ং নাট্যকার ও এই নাটক রচনার কারণ ও অভিনয় প্রসঙ্গটি জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন – "পিতৃদেব স্বহস্তে আমাকে জমিদারি-সংক্রান্ত অনেক কাজকর্ম শিখাইয়াছিলেন। জমিদারি পরিদর্শন উপলক্ষে একবার গুণুদাদার সঙ্গে আমাকে কটক যাইতে হইয়াছিল। হিন্দুমেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত – কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব-গাথা ও ভারতের গৌরবগাহিনী কীর্তন করিলে হয়তো কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলওে হইতে পারে। এই ভাবে অণুপ্রাণিত হইয়া কটকে থাকিতে থাকিতেই আমি "পুরু-বিক্রম" নাটকখানি রচনা করিয়া ফেলিলাম। লিখিয়াই গুণুদাদাকে বইখানি আদ্যোপান্ত শুনাইলাম। তাঁহার এ নাটকখানি খুব ভালো লাগিল। তিনি ছাপাইতে বলিলেন। 'পুরু-বিক্রম' প্রকাশিত হইল বটে, কিন্তু প্রথম সংস্করণে এবারেও আমি নাম গোপন করিলাম।... 'পুরু-বিক্রম' শেষে গুজরাটি ভাষাতেও অনূদিত হয়। ইউরোপের বিখ্যাত সমালোচক ও সংস্কৃতবিদ্যায় পারদর্শী Sylvin Levi সাহেব গুজরাটি-সাহিত্যের সমালোচনাপ্রসঙ্গে 'পুরু-বিক্রমের' বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখানি যে আমারই বাংলা 'পুরু-বিক্রমের' অনুবাদ তাহা তিনি জানিতেন না।...

'পুরু-বিক্রম' প্রকাশিত হওয়ার পর, একদিন Great National Theatre -এর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু প্রভৃতি কয়েকজন অভিনেতা এই নাটকখানির অভিনয় করিবার জন্য আমার অনুমতি লইতে আসিয়াছিলেন। তখন তরুণ অমৃতলাল সামান্য একজন অভিনেতা মাত্র, কিন্তু তখনই তাঁহার উজ্জ্বল মুখমণ্ডলে আমি এক অপূর্ব প্রতিভার আলোক দেখিতে পাইয়াছিলাম।''[৪৭]

অর্থাৎ সিন্ধান্তে বলা যায়, 'পুরু-বিক্রম' নাটক রচনার পূর্বে নাট্যকার যে মানসিকতা পোষণ করেন, ইতিহাসের বীর চরিত্রাবলম্বনে স্বদেশবাসীর বীরত্বকে জাগিয়ে তোলা তার সফল চেষ্টা এখানে হয়েছে। পুরু-ঐলবিলার প্রণয় সূত্রে দেশোন্ধারের অভিনব যে চিত্র নাট্যকার এখানে দেখালেন তাতে শেষ পর্যন্ত স্বদেশের গৌরবকেই প্রতিষ্ঠা করলেন। ঐলবিলার প্রণয় প্রীতিকে স্বদেশপ্রীতিকে আচ্ছাদিত করেনি যেমন পুরুর বীরত্ব তেমনই কোনো প্রতিকূলতার সামনে নত হয়নি। অম্বালিকা তক্ষশীল রাজপুত বংশজ হয়েও যে দেশদ্রোহীতা করেছেন, আপন স্বার্থ-পূর্ণ করতে দেশের গৌরব ও সম্মানকে খাটো করেছে তাতে ভিন্ন বাঙালি দর্শককে উত্তেজিত করে তুলেছে। বিশ্বাসঘাতকার চরম দণ্ড যে ধ্বংস নাট্যকার দর্শকমনে তা গ্রথিত করতে চেয়েছে তক্ষশীল চরিত্রাঙ্কনের মধ্যে। সেকেন্দরের অহংকারকে কোনোভাবে প্রশ্রয় না দিয়ে নাট্যকার স্বদেশের অহংকারকে তার উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন। সর্বোপরি, এ হেন জাতীয়চেতনার নাটক অভিনীত হয় জাতীয় রঙ্গালয়ে এবং সাধারণ দর্শক অবাধ ও ইচ্ছে মতো নাটকটির অভিনয় দেখে জাতীয়ভাবের উন্মাদনায় বিচলিত হয়। নাট্যকারের জীবনদর্শন নাটকটিতে পূর্ণ মাত্রায় প্রতিফলিত হয়ে তা স্বদেশপ্রেমের নাটক হিসাবেই যে পরিচিত হয়েছে তা স্বীকার করতে হয়। আর এই সফলতা জন্ম দেয় আরও বেশ কিছু অনুসারী নাটক। একদিকে রোমান্স অন্যদিকে দেশপ্রীতি এই দুয়ে মিলে নাট্যকারের নাটক হয় ওঠে নাট্যকারের জীবনের দুটি দিক। কারণ নাট্যকার বাল্যকাল থেকে যেমন দেশীয় গৌরবকে লালন করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন, আপন স্ত্রীর প্রণয়কে পরিপূর্ণ মর্যাদা দিতে ততটাই নিমগ্ন ছিলেন। তাই তাঁর এই 'পুরু-বিক্রম' রোমান্টিক স্বদেশপ্রেমের রোমাঞ্চধর্মী নাটক হিসাবে স্বদেশচেতনার পর্যালোচনায় চিরকালীন মহত্ত্ব অর্জন করে থাকবে।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ ঃ

১. দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্র নাটক সমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৭

২. ঐ, পৃ. ৯

৩. ঐ, পৃ. ১২

৪. সুশীল রায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ', কলিকাতা, ১৩৭০, পৃ. ১৪৪

৫. দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১৫

৬. ঐ, পৃ. ৬

৭. অজিত কুমার ঘোষ, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৩৫
৮. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ', কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৪৬
৯. দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১৯
১০. ঐ, পৃ. ২০-২১
১১. ঐ, পৃ. ২২
১২. সুশীল রায়, 'জোতিরিন্দ্রনাথ' কলিকাতা, ১৩৭০, পৃ. ১৪৪
১৩. দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ২৩-২৪
১৪. ঐ, পৃ. ২৬
১৫. ঐ, পৃ. ২৭
১৬. ঐ, পৃ. ২৮
১৭. ঐ, পৃ. ২৮
১৮. সুশীল রায় এ প্রসঙ্গে বলেছেন এ দু'জনের একজন দেশদ্রোহী অন্যজন পররাজ্যলোভী। দেশের প্রতি এই কপটতার ও শাস্তি স্বরূপ নাট্যকার তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি দেশকে ভালোবাসলে তার পরিণতি ও নাট্যকার তুলে ধরে নাট্যকার তার স্বদেশ প্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। দ্র. সুশীল রায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কলিকাতা, ১৩৭০, পৃ. ১৪৪
১৯. দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ২৯
২০. ঐ, পৃ. ৩০
২১. ঐ, পৃ. ৩২
২২. ঐ, পৃ. ৩৩
২৩. ঐ, পৃ. ৩৪
২৪. হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বাঙলা নাটকের ইতিবৃত্ত, কলকাতা, ১৩৫৪, পৃ. ১১২
২৫. দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৩৫
২৬. ঐ, পৃ. ৩৫
২৭. ঐ, পৃ. ৩৭
২৮. সুশীল রায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ', কলকাতা, ১৩৭০, পৃ. ১৪৪
২৯. দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্র নাটক সমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৩৬
৩০. অজিত কুমার ঘোষ, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১৩৫
৩১. বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮১ সংখ্যা, দ্র. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১১৯

৩২. দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৩৬-৩৭

৩৩. প্রবাসী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১১৩২

৩৪. দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৫

৩৫. ঐ পৃ. ৫

৩৬. বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৪৭

৩৭. বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৭৯ সংখ্যা, দ্র. দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্র নাটক সমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ২১-২২

৩৮. দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্র নাটক সমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ২২

৩৯. ঐ, পৃ. ২২

৪০. ঐ, পৃ. ১৮-১৯

৪১. অজিত কুমার ঘোষ, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৩৫

৪২. দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্র নাটক সমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ২৯

৪৩. সুশীল রায় ও এ সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, "নাটকে প্রেম প্রীতি ও প্রেম প্রণয়ের সংঘাত আবশ্যক ; তা এখানে আছে। কিন্তু নর-নারীর প্রেমকেই মুখ্য করা হয় নি, সে প্রেমকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি ; অথচ সেই প্রেমের দ্বন্দ্ব ও জটিলতা দিয়ে নাটকের কাহিনী রমণীয় করা হয়েছে। কিন্তু নাটকটিকে এ সত্ত্বেও প্রেম প্রণয়ের বয় বিরহ-মিলনের ঘাত-প্রতিঘাতের উপর নির্ভরশীল রাখা হয় নি। এর কেন্দ্রীয় কথা স্বদেশপ্রেম। দ্র. সুশীল রায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কলিকাতা, ১৩৭০, পৃ. ১৪৪

৪৪. অজিত কুমার ঘোষ, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৩৫-১৩৬

৪৫. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (তয়), কলকাতা, ১৪০৬, পৃ. ৩২১-৩২২

৪৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', কলিকাতা, ১৪০৫, পৃ. ২৪২-২৪৩

৪৭. বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় (স), 'জোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি', কলিকাতা, ২০০২, পৃ. ৪৬

স্বদেশপ্রীতির আলোকে 'সরোজিনী'র প্রতিফলন

এই নাটকটি ছয়টি অঙ্কে চৌদ্দটি গর্ভাঙ্কে বিন্যস্ত। প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে দুটি করে চতুর্থ অঙ্কে তিনটি পঞ্চম অংশে চারটি এবং ষষ্ঠ অঙ্কে একটি মাত্র গর্ভাঙ্ক বিভাজন আছে। নাটকটির প্রেক্ষাপট ও ভারতীয় ইতিহাস। তবে অন্য রচনার প্রভাব কিছুটা আছে পূর্বে তা বলা হয়েছে। স্বদেশচেতনা জাগ্রত করাই যে এই নাটকটির উদ্দেশ্য তা নাটকের কাহিনি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়। এ নাটকের অন্তরে প্রেমের কাহিনি। তবে প্রেমের কাহিনি 'স্বদেশ' অপেক্ষা গৌণ। পুরুবিক্রমে প্রেম ও স্বদেশপ্রেমের আবহ পাশাপাশি এগিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত স্বদেশমাতৃকার গৌরবকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখানেও তেমনটি হয়েছে। পূর্ববর্তী নাটকের যে ত্রুটি তা এখানে সংশোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ আগের নাটকে বর্ণনার প্রাধান্য ছিল এ নাটকে এসেছে ক্রিয়ার প্রাধান্য।

ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে স্বাদেশিকতা বোধ। এখানেও চিতোররাজ লক্ষণ সিংহ ভারতের তথা স্বদেশের প্রতিনিধি। বিদেশি শক্তি আলাউদ্দিন হল ব্রিটিশ শক্তির প্রতিনিধি। আলাউদ্দিন প্রত্যক্ষভাবে এসেছে অনেক কম। তার অঙ্গুনি হেলনেই সমাধা হয়েছে তার অত্যাচার।

এ নাটকেও পূর্বের মতো দেশীয় সম্মিলিত শক্তির মধ্যে ফাটল ধরিয়ে দিল্লিশ্বর নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করতে চেয়েছে। এখানে বাদলাধিপতি বিজয় সিংহের সঙ্গে লক্ষণ সিংহের বন্ধুত্বকে নষ্ট করে দেশীয় শক্তিকে দুর্বল করার কুটকৌশল অবলম্বন করে দিল্লিশ্বর। আর তার জন্য গুপ্তচর হিসাবে মহম্মদ আলিও ফতেকে চিতোরে ছদ্মবেশে পাঠানো হয়। তারা পুরোহিতের পুজারীর বেশে প্ররোচিত করে লক্ষ্মণ সিংহকে, এ প্রসঙ্গে উঠে আসে বিজয় সিংহের সঙ্গে দ্বন্দ্ব। কিন্তু দেশের জন্য আত্ম-নিবেদিত, পৌরুষে, বীরত্বে বিজয় সিংহ সেই প্ররোচনাতে পা দেওয়ার আগে শত্রুশক্তির কৌশল বুঝতে পারে। স্বদেশকে রক্ষা করা তার সহজ হয় ঠিকই ; কিন্তু প্রেমের কাহিনি পায় ট্রাজেডির রূপ। ফলে চিত্রে এ নাটকের দুটি পক্ষকে দেখানো যেতে পারে।

১। প্রধান ঃ রাজা লক্ষ্মণ সিংহ, বিজয় সিংহ —— আলাউদ্দিন

২। অপ্রধান ঃ বিজয় সিংহ → সরোজিনী, বিজয় সিংহ → রশোনারা

পূর্ববর্তী নাটকের সমালোচনাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে হয়ত নাট্যকারের এমন কৌশল। প্রধান কাহিনিরূপে দেশের ঐক্য রক্ষা করে শত্রু শক্তিকে দমন এবং অপ্রধান কাহিনিরূপে বিজয়সিংহ সরোজিনীও রোশেনারার ত্রিভুজ প্রেমের সমীকরণ। তবে কোথাও এ নাটকে প্রেমের জোয়ারে কোনো চরিত্রই ভেসে যায় নি। বরং আত্মমর্যাদা রক্ষায় দেশীয় চরিত্রগুলি সচেষ্ট থেকেছে।

অনুরূপ আর একটি দ্বন্দ্বকে তুলে ধরা হয়েছে লক্ষণ সিংহ চরিত্রের মধ্যে। একদিকে সরোজিনীকে বলি দেওয়ার প্রস্তুতিতে পিতৃত্বের যন্ত্রণা, অন্যদিকে বিদেশির হাত থেকে স্বদেশকে রক্ষা করা-ই রাজার

ব্রত। এই দ্বন্দ্বে পিতৃত্ব অপেক্ষা রাজার কর্তব্য গুরুত্ব পেয়েছে। পিতৃত্বের যন্ত্রণাকে মেনে নিয়েও স্বদেশ কল্যাণ একনিষ্ট হয়েছে দর্শক মনে, ফলে এই কাহিনি যে স্বদেশের অভিমুখী করবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সরোজনীনির প্রাণ বলিদান ←——— লক্ষণ সিংহ ———→ পরাধীন ভারতকে রক্ষা

এর পাশাপাশি আর একটি প্রসঙ্গকে আনতে হয় তাহল নাটকের ট্রাজিক পরিণতি। এ লক্ষ্যকে পূরণ করতে গিয়েই নাট্যকার ট্রাজেডির মানদণ্ড মেনে এগিয়ে গেছেন। ট্রাজেডির সংজ্ঞায় অ্যারিস্টটন বলেন, "A tragedy then, is the imitation of an action that is serious and also, as having magnitude, complete in itself ; in language with pleasurable accessories, each kind brought in separately in the parts of the work ; in a dramatic, not in a narrative from, with incidents arousing pity and fear, where with to accomplish its eatharsis of such emotions." [১] তাই বর্ণনা অপেক্ষা ক্রিয়াকে যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি চরিত্রের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বকে মাত্রা দেওয়া হয়েছে। দর্শক মনেও যে সে ট্রাজিড়ির সার্থকতা এসেছে তা পূর্বে বলা হয়েছে।

নাটকের শুরুটাই চমৎকার। কোনো অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নয় একেবারে যুদ্ধযাত্রার মুহূর্তে নাটকের সূচনা। লক্ষ্মণসিংহ যবনরাজ আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার পূর্বে সসৈন্যে দেবী ভৈরবীর কাছে পূজা দেবার জন্য আসীন হন। দেবী ভৈরবীর কৃপা নিয়ে লক্ষ্মণ সিংহ, '... মা, যাতে যবনদের উপর জয়লাভ হয়,' বলে যাত্রা করতে চায়। এই যুদ্ধযাত্রার চরম মুহূর্তে দেবীর আকাশবাণী হয় আর এই আকাশবাণীই নাটকের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। আকাশবাণীর রহস্য উন্মোচনে নাটকের পরিসমাপ্তি হয়। 'অয়দিপাউস' নাটকে রাজা লিয়ায়ুসও এমন ভবিষ্যৎ বাণীতে প্ররোচিত হয়ে ট্রাজিক কাহিনির বাহক হন। শেক্সপীয়রের 'ম্যাকবেথ' নাটকেও ডাইনিদের বার্তা নাটককে পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। তবে পাশ্চাত্য এ কাহিনিতে দৈবশক্তির কোনো ছলনা নেই। এ নাটকে বিদেশিদের ছলনাকে তুলে ধরা হয়। স্বাদেশিকতা বোধ জাগ্রত করতে যা খুব সহায়ক হয়েছে। দেববাণীটি হল –

"মূঢ় ! বৃথা যুদ্ধ-সজ্জা যবন-বিরুদ্ধে।
রূপসী ললনা কোনো আছে তব ঘরে,
সরোজ-কুসুম-সম ; যদি দিস পিতে
তার উত্তপ্ত শোণিত, তবেই থাকিবে
অজেয় চিতোর-পুরী, নতুবা ইহার
নিশ্চয় পতন হবে, কহিলাম তোরে।
আর শোন্ মূঢ় নর ! বাপ্পা-বংশজাত
যদি দ্বাদশ কুমার রাজছত্রধারী
একে একে নাহি মরে যবন-সংগ্রামে,

না রহিবে রাজলক্ষ্মী তব বংশে আর।
পুনর্বার বলি তোরে, শোন মূঢ় নর।
ইতর বলিতে মোর নাহি প্রয়োজন,
রাজবংশপ্রবাহিত বিশুদ্ধ শোণিত
যদি দিস পিতে মোরে– তবেই মঙ্গল।”[২]

লক্ষণ সিংহের স্বদেশপ্রেমের কারণেই এ দৈববাণী বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে নিজের জীবনের ক্ষুদ্র আশা অপেক্ষা দেশোদ্ধারের ইচ্ছা অনেক বেশি প্রবল হয়ে ওঠে। সেকারণে নাটকের হঠাৎ পট পরিবর্তন। দৈববাণীতে স্পষ্ট হলা হয়, 'সরোজকুসুমসম' ও 'রূপসী ললনা'র রক্ত যদি ভৈরবীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয় এবং সে রূপসী অবশ্যই তার ঘরের তবে যবনকে উৎখাত করে চিতোর পুরীকে অজেয় রাখা যাবে। এই কয়েকটি শব্দবন্ধ রাজাকে ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতির সমানে দাঁড় করিয়ে দেয়। আকাশবাণীতে বাপ্পারাও বংশের দ্বাদশপুত্রের মৃত্যুকে তিনি ভয় পাননা। কারণ তা রাজধর্ম পালন করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ স্বাভাবিক। তবে এটা তখনই স্বাভাবিক যদি সত্য-সত্যই থাকে দেশের প্রতি অনুরাগ। কিন্তু কে সেই রমণী ? এ প্রশ্নে রাজা একেবারে যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালেই দুর্বল হয়ে পড়েন।

নাট্যকার চমৎকারভাবে এই দৃশ্যেই দেখিয়েছেন, যবনরাজের কপটতাকে। দৈববানীর হোতা আসলে আলাউদ্দিনের প্রেরিত ছদ্মবেশি মুসলমান মহম্মদ আলি। আর তার চ্যালা ফতে উল্লাও তারই দোসর। যবনরাজের পরিকল্পনা হল,– দেশভক্ত চিতোররাজ দেশোদ্ধারের জন্য দৈববাণীকে বিশ্বাস করে কন্যা সরোজিনীকে হত্যা করবেন। বিজয় সিংহ তার এই প্রণয়ীর জন্য প্রতিবাদ করলে চিতোর রাজের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হবে। সেই সুযোগে আক্রমণ করা সহজ হবে। এই বিজয় সিংহের কারণেই পূর্বে চিতোর রক্ষা পায়। তাই বীর বিজয় সিংহ তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র না ধরলে চিতোর লাভ করা বাদশার সহজ হবে।

এ হীন চক্রান্তকে কার্যকরী করার জন্য দেখি ভৈরবাচার্য খড়ি পেতে সরোজিনীকে হত্যা করার উপদেশ দেন। পিতৃত্ব আঘাত পায়। এহেন নিষ্ঠুরতার বশবর্তী হয়ে নিজের রাজ্যকে রক্ষা করতে তার মনে কষ্ট হয়। কিন্তু তার দেশভক্ত সেনাপতি এই সংকীর্ণ স্বার্থ থেকে বেরিয়ে এসে রাজাকে উদ্দিপিত করেন– দৈববাণীকে পালন করার জন্য। এই সেনাপতি বাজার শুভানুধ্যায়ী কিন্তু দেশপ্রেম তার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বের। তাই তাকে বলতে দেখি,

“রণধীর। জীবন চরিতার্থ হল। মহারাজ ! চিতোর রক্ষার জন্য দেবী আপনার নিকট যে দৈববাণী করেছেন, তা শীঘ্র পালন করুন – দেবীর অনুগ্রহ থাকলে কার সাধ্য চিতোর-পুরী আক্রমণ করে ? ... মহারাজ ! প্রবৃত্তিস্রোতে একেবারে ভাসমান হবেন না। একটু স্থিরভাবে বিবেচনা করে দেখুন, কর্তব্য অতিশয় কঠোর হলেও তথাপি তা কর্তব্য। যদি অন্য কোনো উপায় থাকত তা হলে মহারাজ, আমি কখনোই এই নিষ্ঠুর কার্য

অনুমোদন কত্তেম না। ... মহারাজ! আপনার প্রশ্নের উত্তরটি যদি কিঞ্চিৎ রূঢ় হয় তো আমাকে মার্জনা করবেন। আচ্ছা, আমি মানলেম যে, সন্তানের জীবন রক্ষা করা পিতার কর্তব্য। কিন্তু আমি আবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি বলুন দেখি, প্রজার প্রতি রাজার কি কর্তব্য? শত্রুর আক্রমণ হতে প্রজাগণ যাতে রক্ষা পায়, তার উপায় বিধান করা কি রাজার কর্তব্য নয়।... কেন মহারাজ! কর্তব্যের গুরুলঘুতা তো অতি সহজেই স্থির হতে পারে। দুইটি কর্তব্যের মধ্যে যেটি পালন না কল্লে অধিক লোকের অনিষ্ট হয়, সেইটিই গুরুতব কর্তব্য। আপনার কন্যার বিনাশে শুধু আপনার ও আপনার পরিবারস্থ আত্মীয়স্বজনেরই ক্লেশ হতে পারে, কিন্তু দেখুন, যদি যবনগণ চিতোর-পুরী জয় কত্তে পারে তা হলে সমস্ত রাজ্যের লোক বংশ পরম্পরাক্রমে চিরদাসত্ব-দুঃখ ভোগ করবে।"[৩]

(প্রথম অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

এই রণধীর রাজাকে তার পূর্ব-পুরুষের ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেন এবং রাজাও তা মেনে নেন। তাঁর কথামতো সরজিনীকে এই মন্দিরে আনার ব্যবস্থা করেন। রণধীর এই সেনাপতি সত্যই যে নিজ কর্তব্যে অবিচল, স্বদেশবাসীকে রক্ষা করার জন্য যে একনিষ্ঠ তা এ উক্তিগুলিতে উঠে আসে। পাশাপাশি মাতৃভূমির প্রতি তার প্রেম দর্শককে জাতীয়তাবাদে উদ্বুন্ধ করে বৈকি।

কপট বিদেশির কপট সখা ফতে সে খবর নিয়ে দিল্লি রওনা দেয়। টানটান উত্তেজনায় নাটকের পথ চলা শুরু হয়। প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে এসে চিতোর রাজের দোলাচলতা যেমন প্রকট আকার নেই তেমনই বাদলাধিপতি বিজয় সিংহের বীরত্ব, স্বদেশপ্রেম কে তুলে ধরা হয় তার কর্ম অনুকৃত দ্বারা। পিতার একমাত্র আদরের দুলালী সরোজিনীকে লক্ষণ সিংহ কোনোভাবে হত্যা করতে চায় না। তাই প্রেরিত পত্রে চিতোর থেকে সরোজিনী যাতে না আসে তা জানানো হয় এবং কন্যাকে অন্যায় মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে মিথ্যায় আশ্রয়ে বিজয় সিংহের বিশ্বাসঘাতকতার প্রসঙ্গ জানিয়ে পত্র লিখলেন। অথচ কিছুপূর্বেই সেনাপতির বাক্যে উজ্জীবিত হয়ে যে পত্র লিখেছিলেন, তাতে তাঁকে বিজয় সিংহ বিবাহ করবে এই কারণে আসতে বলা হয়েছে। পূর্বোক্ত পত্রের জনরবে বিজয় সিংহ রাজার কাছে সত্যতা জানতে চাই। কিন্তু এই রাজা জানেন না রাজা লক্ষ্মণসিংহের হৃদয়ের কথা। তবুও রণধীর যখন রাজাকে বিবাহ প্রসঙ্গ না এনে যুন্ধযাত্রার জন্য প্রেরণা দেন তখন বিজয় সিংহ এবার গর্জে ওঠেন, সৈনিকের কর্তব্যকে দৃঢ় বাক্যে প্রতিস্থাপিত করেন রণধীরের কথার মূল্য থাকে যদি যুন্ধক্ষেত্রে সে স্বদেশানুরাগের প্রমাণ মেলে।

দৈববাণী যে নিছক বাণী মাত্র, তা প্রথম বিজয় সিংহ ঘোষণা করে। রাজা দোলাচলতায় স্থির করতে পারে না তার কর্তব্যকে। তার এবার যেন কন্যাকে বধ করে স্বদেশকে রক্ষা করার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ওঠেন। কিন্তু বিজয় 'মাতৃভূমির দৈব্যবাক্যই আমাদের দৈববাণী' বিশ্বাসে রাজাকে সচেতন করে।

বিজয় সিংহের প্রতিটি কথা যে বীররসের প্রাধান্য তাতে তার স্বদেশানুরাগ দেখে দর্শক কূলে সাড়া পড়ে যায়। বিশেষ করে বিজয় সিংহের তীব্র আকাঙ্খা স্বদেশকে রক্ষা করা। তার এই উক্তিগুলি যেন দর্শকদের জ্বালা ধরায়, বিদ্রোহী করে তোলে, প্রতিটি দর্শকের আপন স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত হয়।

“বিজয়। মহাশয়! কথায় কেবল উৎসাহ প্রকাশ কল্লে কোনো কার্য হয় না। মাতৃভূমির প্রতি কার অধিক অনুরাগ, যুদ্ধক্ষেত্রেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে। আপনি বলিদান দিয়ে দেবতাদিগকে পরিতুষ্ট করুন – কবে শুভগ্রহ উপস্থিত হবে, তারই প্রতীক্ষা করুন – কিন্তু বিজয় সিংহ এ সকলের উপর নির্ভর করে না। এ সমস্ত গণনা করা ভীরু ব্রাহ্মণের কার্য, পুরোহিত ভৈরবাচার্যের কার্য, আপনার ন্যায় ক্ষত্রিয় বীরপুরুষের উপযুক্ত নয়। (লক্ষ্মণ সিংহের প্রতি) মহারাজ! আমাকে অনুমতি দিন। আমি এখনি যবনদের বিরুদ্ধে যাত্রা কচ্ছি – বিলম্বের কোনো প্রয়োজন নাই।... মহারাজ, আপনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হতে হতেই কেন এরূপ বৃথা সন্দেহ কচ্ছেন? প্রাণপণে যুদ্ধ কল্লে বিজয়লক্ষ্মী স্বয়ং এসে আমাদিগকে আলিঙ্গন করবেন। মহারাজ! আমি দেবদ্বেষী নই – আমার বলবার অভিপ্রায় এই যে, শুভকার্যে দেবতারা কখনোই বিঘ্ন দেন না। ... মহারাজ! সর্বদাই দৈবের মুখাপেক্ষা করে থাকলে মনুষ্য দ্বারা কোনো মহৎ কার্যই সিদ্ধ হয় না। আমাদের কার্য তো আমরা করি। তার পর যা হবার তা হবে। ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি কত্তে গেলে আমাদের পদে পদে ভীত হতে হয়। না মহারাজ! ভবিষ্যদ্‌বাণী দৈববাণীর কথা শুনে যেন আমরা কতকগুলি অলীক বিঘ্নের আশঙ্কা না করি। যখন মাতৃভূমি আমাদিগকে কার্য কত্তে বলছেন তখন তাই যথেষ্ট, আর-কোনো দিকে দৃষ্টিপাত করবার প্রয়োজন নাই। মাতৃভূমির বাক্যই আমাদের একমাত্র দৈববাণী। দেবতারা আমাদের জীবনের একমাত্র হর্তা-কর্তা সত্য, কিন্তু মহারাজ! কীর্তিলাভ আমাদের নিজেদের চেষ্টার উপরেই নির্ভর করে। অতএব অদৃষ্টের প্রতি দৃক্‌পাত না করে পৌরুষ আমাদিগকে যেখানে যেতে বলছে – চলুন, আমরা সেইখানেই যাই। আমি যবনদিগের বিরুদ্ধে এখনি যেতে প্রস্তুত আছি। ভৈরবাচার্যের দৈববাণী যাই হউক-না মহারাজ, আমি তাতে কিছুমাত্র ভীত নই।”[৪]

(প্রথম অঙ্ক/দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

শেষ পর্যন্ত বিজয় সিংহও বুঝলেন রাজা ও চান দৈববাণীকে মেনে নিয়েই যুদ্ধযাত্রা করতে। তাই যে-কোনো মূল্যে যে তিনি তার দেশের শত্রুকে নিধন করতে চান তা বীরের মতোই ঘোষণা করলেন,

“বিজয়। মহারাজ! পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে, যা মাতৃভূমির জন্য অদেয় থাকতে পারে? আমার জীবন বলিদান দিলেও যদি তিনি সতুষ্ট হন, ... তাতেও আমি প্রস্তুত আছি। ... যদি আর কেহই যুদ্ধে না যান – আমি একাকীই যাব। আমার এই অসি যদি লম্পট

আল্লাউদ্দিনের মস্তক ছেদন কত্তে পারে তা হলেই আমার জীবনকে সার্থক জ্ঞান করব।”[৫]

(প্রথম অঙ্ক/দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

এমন সময় সেনাপতি আবার তাকে কন্যা বলির জন্য প্রস্তুত হতে বলেন কিন্তু রাজা আবার পিছিয়ে আসেন। কিন্তু জানতে পারেন প্রথম পত্রের কারণে মন্দিরের দিকে সরোজিনী আগত প্রায়। পিতৃহৃদয়ের শেষ আশা নির্বাপিত প্রায়। নাট্যকার কৌশলে এখানে যবন কন্যা বন্দি রোসওনারাকে সরোজিনীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে নাটকে সন্নিবেশ করলেন। পিতৃ হৃদয়ের অসহায়তা ও রাজ কর্তব্যের চরম দ্বন্দ্ব এখানে, '... জগতে তার মতো হতভাগ্য আর কে আছে যার ক্রন্দনেও স্বাধীনতা নাই।' তবুও কথা রাখতে এবার আপন স্বদেশের চরণে নিজ কন্যাকে অঞ্জলী দিতে প্রস্তুত হন। নিজের পিতৃত্বকে স্বীকার দেন। “একদিকে দেশ, অন্যদিকে দুহিতা ; রাজার কাছে দেশ, পিতার কাছে কন্যা। কিন্তু পিতা ও রাজা একজনই ; অথচ দেশ ও কন্যা দুটি পৃথক সত্তা। এই দুই দিকে রক্ষা করার জন্য চিত্তের বিচলিত অবস্থার বিন্যাস সুন্দর হয়েছে।”[৬] তথাপি বলতে হয়, রাজা দু'পা এগিয়ে গিয়ে এক পা পিছিয়ে আসছেন বারবার। ক্ষত-বিক্ষত পিতৃহৃদয়কে বেশি প্রাধান্য দিতে গিয়ে তার রাজা চরিত্রটি নিস্প্রভ হয়েছে। রাজার ন্যায় দৃঢ় মানসিকতা, বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে লক্ষণ সিংহ ব্যর্থ হয়েছে। শুধু দৈববাণীকে দেশোদ্ধারের একমাত্র উপায় হিসাবে বেছে নিয়ে নিজের বীরত্বকে ছোট করেছে।

কিন্তু বিজয় সিংহ রাজার ন্যায়ই প্রতিটি পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে। বিজয় চরিত্রটির স্বদেশানুরাগ ও লক্ষণের স্বদেশানুরাগ শেষ পর্যন্ত একটা বিন্দুতে মিলেছে ঠিকই কিন্তু একজন দুর্বলভাবে যেন রণবীরের চাপে এ স্বদেশানুরাগ উজ্জীবিত হয়েছে অপরজন আপন পৌরষে উজ্জীবিত হয়েছে। ফলে নাটকের প্রথম অঙ্কের তিনটি প্রধান ধারা দিয়ে সূচনা করেছেন –

১. রাজা লক্ষণ সিংহের বাৎসল্যপ্রীতি ও স্বদেশপ্রীতির দ্বন্দ্ব।
২. বিদেশি বাদশার কপট ও নিষ্ঠুর ভাবে রাজ্য লাভের পন্থা।
৩. রাজা বিজয় সিংহের বীরত্বও স্বদেশানুরাগ।

নাটকে ট্রাজেডি সৃষ্টিতে ও গতি প্রকৃতি নিধারনে প্রথম ধারাটি খুবই প্রয়োজনীয় তা পরে জানতে পারব। দ্বিতীয় ধারাটিতে বিদেশি শত্রুর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনে স্বদেশচেতনা জাগ্রত করতে এবং তৃতীয় ধারাতে দেশীয় রাজার বীরত্বও স্বদেশপ্রেমে প্রাণিত হয়ে দেশবাসীকে স্বদেশচেতনার উদ্বুন্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ফলে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করার অপেক্ষা ট্রাজেডিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রথমটি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথম ধারাটিতে যে দ্বন্দ্ব তা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকে রূপলাভ করতে দেখি। এই ধারাটি শুধু অনুসৃত হয়ে মানবতাও সংস্কারের দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তোলে। রবীন্দ্রনাথের নির্মিত রঘুপতি বলির জন্য যে উন্মাদনায় মত্ত তাতে শুধু তার ব্রাহ্মণ্য অহংকারই কারণ। প্রচলিত দীর্ঘ

সংস্কারের ধারাকে অব্যাহত রাখতে চায় রঘুপতি, গোবিন্দমাণিক্য সেই সংস্কার ভেঙে মানবতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

'সরোজিনী' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কটির প্রথম দৃশ্যে দিল্লির চিত্র দ্বিতীয় দৃশ্যে চিতোরের চিত্র। প্রথম দৃশ্যে সম্রাট আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাই ছদ্মবেশি ভৈরবাচার্যের জন্য অপেক্ষামান হঠাৎ ফতে এসে জানায় সঠিক সময়ে চিতোর আক্রমণ করার জন্য। পাশাপাশি হিন্দু সম্পর্কে রাজার মনোভাব অংশটুকু স্বদেশবোধ জাগ্রত করার জন্য প্রয়োজনীয়। উজির হিন্দু বীরত্বের কথা বললে প্রতাপের সঙ্গে অহং সর্বস্ব বাদশা বলেন,

'সে যা হোক্, দেখো উজির! হিন্দুদের যত মন্দির, সব ভূমিসাৎ করে দিতে হবে। তার চিহ্নমাত্রও যেন পরে কেউ দেখতে না পায়।' এখানে পররাজ্য লাভ করে, পরনারীকে হরণ করে নিজ স্বীয় স্বার্থ লাঘব করতে চায়। দিল্লিশ্বরের এমন উক্তিতে যে স্বদেশবাসী ব্যাথিত হবেই তা স্বীকার্য। এ ছাড়া দৃশ্যটিতে স্বদেশিকতার তেমন, কোনো বার্তা নেই।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্গে বিজয় সিংহ দ্বারা যবন কন্যা রোশেনারা বন্দি হয়। সরোজিনীর সঙ্গেও তার ভগ্নির সম্পর্ক হয়। রোশেনারার হৃদয়ানুরাগ ও পিতৃ সম্পর্কে তার কৌতূহল স্থান পেয়েছে। বিজয় সিংহের প্রতি অনুরাগের কারণে সরোজিনীর সঙ্গে তার বিবাহকে মেনে নিতে পারে না। অর্থাৎ বিজয়-সরোজিনীর মধ্যে তৃতীয় পক্ষের অনুপ্রবেশ দেখানো হয়েছে।

পাশাপাশি সরোজিনী-বিজয় সিংহ-রোশেনারার ত্রিভুজ প্রণয়ের প্রকাশও এখানে দেখি। অন্তর্দ্বন্দ্বে আহত লক্ষণসিংহ কন্যার সামনে এসে নিজের ব্যর্থতার কারণে চকিতের মতো চলে যায়। সরোজিনী তা বুঝতে না পারলে রোশেনারা তাকে প্রবোধ দেয়। চকিতের মতো এবার নাটকীয় ঘটনা মোড় নেয় অন্য দিকে। পূর্বে রাজার দ্বিতীয় পত্র পেয়ে সরোজিনী জানতে পারে বিজয় সিংহ তাকে বিবাহ করতে চান না। রোশেনারা শুনে আনন্দ পায়। রোশেনারা বোধ করে বিজয় সিংহ তাকে হয়ত বিবাহ করবে কিন্তু তাতেও সংশয় তৈরি হয়।

যাই হোক এই অঙ্কটিতে স্বদেশের প্রতি বিশেষ কিছু বলা হয় নি। কেবলমাত্র স্বদেশ সম্পর্কে তার মনোভাবের কথা একটিমাত্র উক্তি পায় বিজয় সিংহের কন্ঠে। রোশেনারা নিজেকে তার বন্দি বললে বিজয় সিংহ বলে সে তার শত্রু নয় তবে তার দেশের শত্রু। বন্দিকে কোনোপ্রকার আঘাত না করেই নিজের স্বদেশানুরাগ প্রকাশ করেন,

''বিজয়। তোমার শত্রু না হতে পারি কিন্তু আমি যে তোমার দেশের শত্রু তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

রোশেনারা। আপনি আমার দেশের শত্রু সত্যি কিন্তু আমি আপনাকে আমার শত্রু বলে মনে করি নে।

বিজয়। যে তোমার দেশের শত্রু তাকে কি তুমি শত্রু বলে জ্ঞান করে না ? তোমার দেশের প্রতি কি তবে অনুরাগ নাই ?"[৭]

(দ্বিতীয় অঙ্ক/দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

নাটকের স্বদেশানুরাগকে উজ্জীবিত করতে গিয়ে প্রেমের যে উপকাহিনি ও নাট্যকার নির্মাণ করেছেন, সেই প্রণয় কাহিনির প্রয়োজনে এই অঙ্কটির অবতারণা।

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কটিতে বাদশার চর যাতে রাজপুত রক্ষকদের হাতে ধরা পড়ে ; অর্থাৎ দিল্লির সম্রাটের রাজ্যসিদ্ধির জন্য বিছানো জালের হদিশ পাওয়ার ইঙ্গিত পায় চিতোর। কিন্তু সে দিকে নাটকটি না এগিয়ে তার ধরা পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তৃতীয় অঙ্ক। পূর্বের সমস্যার সমাধান হয়। বিজয় সিংহ সরোজিনীর কাছে স্পষ্ট করেন সে তাকেই ভালোবাসে। ফলে বিবাহের আয়োজন হয়। লক্ষণ সিংহ কিন্তু এই সুযোগে কন্যাকে ভৈরবী মন্দিরে এনে বলি দিতে চান। তাই মহিষীকে না থাকার জন্য অনুরোধ করেন। রোশেনরাকে বন্দি দশা থেকে মুক্তি দিতে বলে সরোজিনী। মন্দিরে আসার সময় আগত প্রায় ঘটনার কথা চিন্তা করে মানবিক মূল্যবোধে পূর্ণ পরিষদ রামদাস বলেই ফেলেন, 'আজ তো শত সহস্র ছাগ বলিদান হবে না – আজ মহারাজ রাজকুমারীকেই –' সরোজিনী জ্ঞান হারায়। বিজয় সিংহ এলে রাজার এই নির্দয়তা জানতে পারে। বিবাহের নামে তাকে প্রতরণা করার জন্য বিজয় সিংহ ক্রোধান্বিত হয়। লক্ষণসিংহ সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। প্রতিশোধ নিতে ব্যস্ত হয়ে উঠলে সরোজিনী পথরোধ করে। কারণ সরোজিনী জানেন তার পিতা অন্যের কথায় এই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন মেয়ের প্রতি অবিচার করতে পারেন না।

এই অঙ্কটিতে প্রেমের পরিণতিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেবলমাত্র সরোজিনীর মতো ভারতীয় নারী বিদেশি বিধর্মী নারী রোশেনারাকে যে মুক্তি দিতে চায় সেখানে দেশের গৌরবই বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্ক প্রণয়কে পরিণতি ও ঘাত-প্রতিঘাত দেখানোর প্রয়োজনে অঙ্কিত হয়েছে। তথাপি একথা স্বীকার্য যে রাজার সঙ্গে বিজয়সিংহের দ্বন্দ্ব, সরোজিনীর বলি, সব কিছুর মধ্যে অন্তঃ সলিলা নদীর মতো রাজার মধ্যে দেশপ্রেমের স্রোত বয়ে গেছে। যবন হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার বাসনায় নিজ কন্যার বলিদান এবং রাজার ভূমিকায় দোলাচলতা[৮] তার পিতৃহৃদয়কে যন্ত্রনাদীর্ণ হয়েছে।

রাজা এখানে পুরুরাজের মতো শুধু দেশপ্রেমের সংলাপই বলে যান নি ; তার কর্মবৃত্তির মধ্যে তার অব্যক্ত যন্ত্রণাকেই তুলে ধরেছেন। তার বিশ্বাস ভুল হতে পারে, রাজকীয় দৃঢ়তার অভাব থাকতে পারে কিন্তু দেশের প্রতি তার যে অকুন্ঠ প্রেম আছে তা তার কর্মবৃত্তির মধ্যে বোঝা যায়।

চতুর্থ অঙ্কটিতে চরম মাত্রা অর্থাৎ 'ক্লাইমেক্স' হয়েছে। একদিকে স্বদেশপ্রেমও স্বদেশ রক্ষার্থে বীরত্বের লড়াই, অন্যদিকে বিরোধী শক্তির একজন নারী বন্দিনী ; তার মানসিকতার যে ভয়ংকর প্রতিচ্ছবি সেখানেই হবে স্বদেশিকতার উৎস। রোশেনারা চরিত্রটি হঠাৎ করে এমনভাবে চলে আসে যে তার আচরণ থেকে বোঝা যায়, সেও চাই তার দেশের গৌরবকে উজ্জ্বল করতে ভারতের ধ্বংস

অর্থাৎ চিতোরের আক্রমণ। ইতিপূর্বে দেখেছি নিজের প্রেমাস্পদকে লাভ করার জন্য সরোজিনীর মৃত্যু কামনা করেতে অথচ সেই সরোজিনী তাকে ভগ্নি স্নেহে রক্ষা করেছে, বিজয় সিংহের কাছে তার মুক্তি কামনা করেছে। দুটি নারী দুটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি। ভারতীয় বংশদ্ভুত সরোজিনীর মহৎ হৃদয়ের পরিচয় আসলে এ দেশের মহত্বকে প্রকাশ করে। অন্যদিকে রোশেনারার হীন মানসকিতা বিদেশি শক্তির কদর্যতাকে তুলে ধরে।

বিজয় সিংহ রোশেনারাকে গ্রহণ করুক বা না করুক সে সরোজিনীর মৃত্যু কামনা করে। তাই সৈনিকদের মধ্যে দেবীর আজ্ঞা প্রচার করতে উদ্যত হয়। মোনিয়া তার সহচরী তাকে সাবধান করতে গেলে সে যা বলে তাতে যে কোন নাগরিকের তার স্বদেশ সম্পর্কে এমন শুনলে ক্রোধে উন্মত্ত হবেই। দর্শক মনে স্বদেশচেতনা জাগ্রত করতে এই চরিত্রাঙ্কন নাট্যকারের উদ্দেশ্যকে যে সিদ্ধ করবেই তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রোশেনার সেই উক্তি হল –

“রোশেনারা। মোনিয়া! তুমি বোঝ না – এতে আমাদের দেশের ভালো হবে। রাজপুত সৈন্যরা আর মহারাজ যদি বলিদানের পক্ষে হন, আর তাতে যদি বিজয় সিংহের মত না থাকে তা হলে তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই খুব একটা ঝগড়া বেধে উঠবে – কোথায় ওরা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে – না হয়ে ওরা আপনা-আপনিই কাটাকাটি করে মরবে। হিন্দুরা যে আমাদের এখানে বন্দী করে এনেছে, তখন তার বিলক্ষণ প্রতিশোধ হবে, আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে। অবিশ্বাসী হিন্দুদের নিশ্চয়ই পতন হবে। সখি! এ কথা মনে কল্লে কি তোমার আহ্লাদ হয় না? এ বলিদানে আমারও মঙ্গল, আমাদের দেশেরও মঙ্গল।”[৯]

(চতুর্থ অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

এই চরিত্রটি দর্শকমনে কিছুটা স্নেহের জায়গা করে নিলেও নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন, অত্যাচারের বশে যেমন যবনদের পরাভূত হওয়া স্বদেশবাসীর অনুচিত তেমনি স্নেহের বশে যবন কন্যাকে স্বদেশবাসী ভেবে নেওয়া অনুচিত। চিতোর রাজ তাকে বন্দি করেছে ঐতিহ্য ও স্বাধীনতা রক্ষার স্বার্থে কিন্তু কোনোভাবে তার অসম্মান করেনি। অথচ আমরা দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে আল্লাউদ্দিনের মুখে পদ্মিনী সম্পর্কে শুনেছি, ‘এবার দেখব পদ্মিনী-বেগম কেমন তার সতীত্ব রাখতে পারে?... পদ্মিনী-বেগমকে আমার হস্তে সমর্পণ কল্লেই চিতোর-পুরী নিরাপদ হবে।’ এখানে দেখি, বিদেশি শাসকের কদর্যতা ও দেশীয় রাজন্যবর্গের বিদেশি যবনকন্যার প্রতি আচরণ। এহেন ঘটনাবর্তে স্বাদেশিকতাবোধ আপনা থেকেই জেগে ওঠে।

অন্যদিকে রাজা লক্ষণ সেনের মানসিক দ্বন্দ্ব, বিজয়সিংহের সঙ্গে সম্পর্কের দূরত্ব, রানির হাহাকার আবর্তিত হয়েছে স্বদেশকে যবনরাজের হাত থেকে রক্ষা করার পট-ভূমিতেই। লক্ষণ সিংহ যখন কন্যাকে বলিদান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত তখন মহিষী সব জানতে পারেন বলে লক্ষণ সিংহ বুঝতে পারলেন। মহিষী স্বামীর প্রতি ভৎর্সনা শুরু করলেন। চিতোর-রাজ একদিকে স্বদেশ আর

একদিকে কন্যাকে রক্ষার দ্বন্দ্বে যখন যন্ত্রণাকাতর তখনই তাতে যোগ হয়েছে সর্বপেক্ষা আপন জনের ভৎর্সনা। মানসিক যন্ত্রণাকে যা তীব্রতর করে। এই তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পায় সরোজিনী যখন পিতার প্রতি সব জেনেও দেবতার মতো ভক্তি প্রদর্শন করে। কন্যা যে পিতার কথা মতো সব কিছু করতে প্রস্তুত— তা সরণ, ছলনাহীনভাবে জানায় — রাজা কন্যার এই অসীম ভক্তির কাছে পরাস্ত হয়, 'এর প্রত্যেক কথা যেন সুতীক্ষ্ণ বাণের ন্যায় আমার হৃদয় ভেদে কচ্ছে। আর সহ্য হয় না। না, দেবী চতুর্ভুজার কথা আমি কখনোই শুনব না' (চতুর্থ অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

সরোজিনীর পিতৃভক্তি ও মাতৃভূমির প্রতি যে প্রেম তা এই সূত্র ধরে চলে আসে। ক্ষত্রিয় রাজকন্যার মতোই বীরত্বে প্রোজ্জ্বল হয়ে সে দেশের জন্য মৃত্যু বরণ করতে চায়। তার মৃত্যুর ফলে যদি স্বদেশ যবন সৈন্য থেকে রক্ষা পায় তবে মরতে কোনো কষ্ট নাই কিন্তু পিতার নিকট কোনো অপরাধ করে থাকলে কন্যার দাবি নিয়ে সে মার্জনা চাই। একদিনে পিতার কন্যা সরোজিনী ও অন্যদিকে ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব রাজার কন্যার প্রকাশ। সরোজিনীর এই স্বদেশপ্রেম উজ্জীবিত করে দেশকে, দেশবাসীকে। যখন বলে,

"সরোজিনী। পিতঃ! আমি মৃত্যুর ভয়ে এ কথা বলছি নে — আমি ভীরুতা প্রকাশ করে কখনোই বাপ্পা রাওর বংশে কলঙ্ক দেব না ; আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণ যদি আপনার কাজে — আমার দেশের কাজে আসে তা হলে আমি কৃতার্থ হব। কিন্তুপিত! (সরোদনে) যদি না জেনে-শুনে আপনার নিকট কোনো গুরুতর অপরাধে অপরাধী হয়ে থাকি আর সেইজন্যেই যদি আমার এই দণ্ড হয় তা হলে মার্জনা চাই —"[১০]

(চতুর্থ অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

চিতোর রাজও 'এক দিকে স্নেহ মমতা, আর একদিকে কর্তব্য কর্ম' এর মাঝে পড়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়। লক্ষণ সিংহ যেন এবার পরাভূত হয়। স্বদেশকে রক্ষা করার জন্য এ কঠোর সিদ্ধান্ত তাকে নিতে হয়েছে আর তাতে প্রেরণা জুগিয়েছে রণধীর তা জানিয়ে দেয়। মহিষী ভৎর্সনা করেন, '... তোমার কন্যার জীবন অপেক্ষা তোমার রাজত্ব বড়ো হল ?...' কিন্তুরাজা যবন হাত থেকে চিতোরকে রক্ষা করতেই যে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা জানান, বিধাতার 'নিবন্ধনে' তাকে রক্ষা করার কোনো উপায়ই তার হাতে নেই।

দুর্বল ক্ষত-বিক্ষত চিত্তে রাজা সরোজিনীর বলিদান চান। এমন সময় নাটকের আরেকটি পর্যয়ে 'ক্লাইম্যাক্স' সূচিত হয়। বিজয় সিংহ এই বলিদানের বিষয় জানতে পেরে চিতোর রাজের কথার সত্যাসত্য জানতে চায়। লক্ষ্মণ সিংহ তা সত্য বলে জানালে বিজয় সিংহ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। আপন প্রেমাস্পদকে রক্ষা করার জন্য চিতোররাজকে 'চ্যালেঞ্জ' জানায়।

ইতিপূর্বে মহিষী সরোজিনীকে বিজয় সিংহের হাতে সমর্পণ করেছেন। ফলে সরোজিনীর অধিকার বিজয়ের। একথা বলতেই দুই রাজার দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। চিতোররাজ জানায় সরোজিনীর এ মৃত্যুর জন্য বিজয়ই দায়ী। কারণ

"লক্ষ্মণ। হাঁ তুমিও। তুমিও সরোজিনীর মৃত্যুর কারণ। আমি যখন বলেছিলেম যে, মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করে কাজ নাই তখন তুমি মহা উৎসাহের সহিত আমাকে যুদ্ধে প্রবর্তিত কল্লে – তা কি তোমার মনে নাই? তুমিই তো আমাকে বলেছিলে, 'মহারাজ! পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে, যা মাতৃভূমির জন্য অদেয় থাকতে পারে?' সরোজিনীর রক্ষার জন্য আমি একটি পথ খুলে দিয়েছিলেম, কিন্তু তুমিও সে পথে গেলে না – মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ ভিন্ন তুমি আর কিছুতেই সম্মত হলে না – সেই যুদ্ধক্ষেত্রের পথ রোধ কত্তে আমি তখন কত চেষ্টা কল্লেম, কিন্তু তুমি আমার কথা কিছুতেই শুনলে না, এখন যাও তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করো-গে – এখন সরোজিনীর মৃত্যু তোমার জন্য সেই যুদ্ধক্ষেত্রের পথ উন্মুক্ত করে দেবে।"[১১]

(চতুর্থ অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

এখানে চিতোর রাজের এই উক্তি স্বদেশবাসীকে ব্যাথিত করে। কন্যার মৃত্যুর জন্য এই রাজা-পিতা যতটা বেপোরয়া হয়ে উঠেছেন তাতে মনে হয়েছে সরোজিনীই যেন বিদেশি রাষ্ট্রের বাদশা মনে হয়েছে, সরোজিনীর মৃত্যু হলেই আর যুদ্ধের প্রয়োজন থাকবে না। দেবীর আকাশবাণী তার চিন্তনে, মননে এতই গুরুত্ব পেয়েছে যে– স্বদেশানুরাগ গৌণ হয়ে তার কাছে দেবতা সত্য হয়ে উঠেছে। প্রজাপালক, সত্য সন্ধানীও ন্যায়ের প্রতিনিধি রাজার এই আচরণ স্বদেশবাসীকে আহত করে ; স্বদেশহীতকারী বীরদের অহং অপমানিত করে। সরোজিনীকে হত্যার জন্য বার বার রাজাকে দেখেছি মিথ্যার আশ্রয় নিতে, দেখেছি ছলনার আশ্রয় নিতে। তাই এ আচরণ রাজচরিত্রকে কলঙ্কিত করে। এই প্রতিকূলতার সমানে দাঁড়িয়েও বিজয় সিংহ দৈববাণীকে আমল না দিয়ে চিতোররাজকে ধীক্কার দিয়ে সরোজিনীকে রক্ষা করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

চিতোর রাজের অহংকারে বিজয় সিংহের এই স্পর্ধা আঘাত করে। এখন সরোজিনীকে বলিদান না দিলে, বিজয় সিংহের বীরত্ব পূরণে তা সার্থক হবে। নিজের অবস্থান হবে কাপুরুষোচিত। তাই সরোজিনীকে রক্ষার করার আর কোনো উপায়ই নেই। তবুও বিজয় সংহকে শাস্তি দিতেই হয়তা সরোজিনীকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন বোধ করলেন রাজা।

সরোজিনী যে বিজয় সিংহকে বিবাহ করতে পারবে না এই শর্তে স্ত্রী-কন্যাকে নিরাপদস্থানে গোপনভাবে পাঠিয়ে দিলেন। অর্থাৎ রাজার এতক্ষণ পর্যন্ত যে লক্ষ্য ছিল দেবীর আদেশ পালন তা ঘটনাবর্তে পরিবর্তিত হল বিজয় সিংহের অহংকার চূর্ণ। এ ধরণের দোলাচল সিদ্ধান্ত ও আপন কন্যাকে নিয়ে বার বার ইচ্ছাপূরণ চরিত্রটিকে স্বস্থান থেকে স্খলিত করেছে। কন্যা সরোজিনী বিজয় সিংহকে না পাওয়ার চেয়ে মৃত্যু অনেক শ্রেয়, মনে করে। তাই যে মৃত্যু ছিল এতক্ষণ পিতৃ আজ্ঞা ও স্বদেশের প্রতি নিবেদেন সেই মৃত্যু পরিণতি হল কিছুটা যেন পিতার হীন মানসিকতার প্রতি প্রতিবাদ। যে রাজা একদিন দেবীর বাণীকে সত্যরূপ দেওয়ার জন্য ছিলেন সচেষ্ট সেই রাজায় বলেন, 'তোমার কিসে মঙ্গল আর কিসে অমঙ্গল তা আমি তোমার চেয়ে ভালো জানি।' যদিও রাজা শেষ পর্যন্ত বলির পথ থেকে সরে আসেননি।

উত্তেজিত রণধীরকে সরোজিনীর চিতোর পালিয়ে যাওয়ার সংবাদ জানিয়ে দেয় রোশেনারা। প্রতি মুহূর্তে সে এমন কাজ করতে চেয়েছে যাতে সরোজিনীর বিপদ হয়। সরোজিনীকে অন্য পথে পাঠিয়ে দিয়ে রাজমহিষী ও সুরদাস অন্য পথে যান কিন্তু রণধীরের আদেশক্রমে মহিষীকে ধরে ফেলেন তারই সৈন্যরা।

চতুর্থ অঙ্কে দেশীয় রাজাদের বিরোধ বিরোধী শক্তিকে পুষ্ট করে। সম্রাট আলাউদ্দিন যেমনটি ভেবেছিলেন, যে মত পরিকল্পনা করেছিলেন অস্থির চিত্ত চিতোর রাজের কারণেই সেই পরিস্থিতির সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। যে সময় ঐক্যবন্ধ হয়ে বাদশার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা উচিত সে সময় নিজেরা নিজেদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত। দেশীয় শক্তি যে কীভাবে বিনষ্ট হয়, দেশের ঐক্য যে কীভাবে অনৈক্যে পরিণত হয় তা যেন নাট্যকার দেখানে চেয়েছেন। আর দেশবাসীকে বার্তা দিতে চেয়েছেন ঐক্য বন্ধনে আবন্ধ হতে। চিতোররাজের মতো প্ররোচিত হয়ে নিজেদের শক্তিকে বিচ্ছিন্ন না করতে। বিদেশি পররাজ্য লোলুপ যবন অর্থাৎ তৎকালীন সময়ে ব্রিটিশরা নানান ছলনায় নানান কৌশলে এভাবেই স্বদেশের শক্তিকে খণ্ড-বিখণ্ড করবে। সচেতন থাকতে হবে স্বদেশবাসীকে নিজের স্বদেশ, নিজের মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে হলে এ ধরণের প্ররোচনায় পা যাতে না পড়ে দেশবাসীকে তা জানিয়ে নাট্যকার স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন।

পঞ্চম অঙ্ক প্রণয়ের কাহিনি প্রধান স্থান পেলেও তার অনুসঙ্গে স্বদেশপ্রেম এসেছে। দেশের কল্যানের জন্য আত্মনিবেদিত প্রাণ সরোজিনীকে পিতা বাঁচাতে চাইলেও বিজয় সিংহকে না পেলে সে বেঁচে থাকা অর্থহীন। তাই গোপনভাবে পালাতে গিয়ে চিতোর সৈন্যরা তাদের ঘিরে ফেলে। বিজয় সিংহ তাকে রক্ষা করতে চাইলেও বার বার এ জীবন মৃত্যুর হাতছানিতে সরোজিনী বাঁচতে চান না। সৈনিকরা ও তার মৃত্যু চাই। সরোজিনী নিজের স্বদেশকে রক্ষা করতে এ মৃত্যু যে খুবই প্রয়োজন তা বলেন,

"সরোজিনী। হবে না। তা দেখুন, আমার মৃত্যু ভিন্ন দেশ উন্ধারের আর কোনো উপায়ই নেই। সমস্ত রাজপুত সৈন্যও এইজন্যে আমার মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা কচ্ছে। তা রাজকুমার! আমাকে আর বাঁচাতে চেষ্ট করবেন না। মুসলমানদের হাত থেকে সমস্ত রাজস্থানকে আপনি উন্ধার করবেন বলে পিতার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন – তাই এখন পালন করুন। রাজকুমার! আমি যেন মনের চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি যে, যেই আমার চিতা প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে – অমনি আলাউদ্দিনের বিজয়লক্ষ্মী ম্লান হবে – তার জয়-পতাকা দিল্লির প্রাসাদশিখর হতে ভূমিতলে স্খলিত হবে – তার সিংহাসন কম্পমান হবে – রাজকুমার! এই আশায় আমার মন উৎফুল্ল হয়েছে – এই আশা-ভরে আমি অনায়াসে প্রাণত্যাগ কত্তে পারব, তাতে আমি কিছুমাত্র কাতর হব না, আপনি নিশ্চিন্ত হোন। আমি মলেম তাতে কি, আমার মৃত্যু যদি আপনার অক্ষয় কীর্তির সোপান হয় – দেশ উন্ধারের উপায় হয়, তা হলেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। রাজকুমার, আমাকে এখন জন্মের মতো বিদায় দিন –"[১২]

(পঞ্চম অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

অর্থাৎ দেশপ্রেমে ভাস্বর সরোজিনী ক্ষত্রিয়ধর্ম পালনে এতটাই বেপোরোয়া যে কোনো যুক্তি তাকে বিরত করতে পারে না। তাই শেষ পর্যন্ত তাকে ভৈরবী মন্দিরে সৈন্যরা ধরে নিয়ে যায়।

পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক নাট্য বিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ভৈরবাচর্য এবার আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। চিতোর আক্রমণের সমস্ত সুযোগ হাতের মুঠোয়। দেশীয় রাজারা পারস্পরিক দ্বন্দ্বে মত্ত – রাজ্যের এক অস্থির অবস্থা, ভৈরবী মন্দির পরিপূর্ণ, চিতোর ফাঁকা তাই ভৈরবাচর্য সম্রাটকে সংবাদ প্রেরণের উদ্যোগ নেন। সূত্রাকারে যদি চিতোরের অন্তঃদ্বন্দ্ব বা অস্থিরতা গুলি সাজানো যায় তাহলে হতে পারে –

১. রাজা লক্ষ্মণ সিংহের সঙ্গে বিজয় সিংহের বিরোধ।
২. লক্ষ্মণ সিংহ কন্যা সরোজিনীর প্রশ্নে ক্ষত-বিক্ষত।
৩. বিজয় সিংহ ও সরোজিনীর প্রণয় সম্পর্কের শিথিলতা।
৪. মহিষী কন্যাকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্টতা।
৫. দেশীয় সৈনিকদের দেশোদ্ধার অপেক্ষা সরোজিনীর বলিদানের প্রতি অধিক আগ্রহ।
৬. রোশেনারার চিতোর আক্রমণের প্রতি ইন্ধন।

সর্বোপরি, ফতেকে মুক্তি।

নিজ রাজ্যের মধ্যে এমন সব দুর্বলতাকে, অনৈক্যকে দিল্লিশ্বর যাতে কাজে লাগাতে পারে – ভৈরব ফতেকে দিয়ে সে সংবাদ প্রেরণ করে ভৈরবের উক্তিতে –

"ভৈরব। (সংক্রমণ করিতে করিতে স্বগত) এখনি তো হিন্দুদের মধ্যে বেশ ঝগড়া বেধে উঠেছে, বলিদানের সময় দেখছি আরো মুল হয়ে উঠবে। চিতোরপুরী তো এখন একপ্রকার অরক্ষিত বললেও হয়, সেখান থেকে প্রায় সমস্ত সৈন্যই এখানে পূজা দেবার জন্যে চলে এসেছে ; এই ঠিক আক্রমণের সময়। এ দিকে হিন্দুরা আপনাদের মধ্যে কলহ করে সময় অতিবাহিত করবে– ও দিকে আল্লাউদ্দিন চিতোরপুরী আক্রমণের বেশ অবসর পাবেন।... চিতোরের সিংহাসন চিরকালের জন্য আমাদের অধিকৃত হবে। লক্ষ্মণ সিংহের তেজস্বী পুত্রগণ বেঁচে থাকতে আমাদের সে আশা কখনোই পূর্ণ হবার নয় কিন্তু তারও এক উপায় করেছি।" [১৩]

(পঞ্চম অঙ্ক/দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

এ দিকে মন্দির প্রাঙ্গনে রাজা লক্ষ্মণসিংহের অসহায়তাকে তুলে ধরা হয়। তার নিজের কোনো অস্তিত্বই নেই। সব কিছু চলে গেছে রণধীর, সৈন্যকূল, ভৈরবাচর্যের উপর। সরোজিনী যেন মরতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। শেষ বলিদানের সব প্রস্তুতি শেষ তখন অস্থির মতি চিতোর রাজ কন্যার মৃত্যুতে যে কোনোভাবেই সমর্থন নেই তা বাঁধা ভাঙা কান্নায় তুলে ধরে, সরোজিনী দেশমাতৃকার জন্য, পিতার মান রক্ষার জন্য প্রস্তুত আবার রণবীর রাজাকে সেই সুযোগে নানান ভাবে উত্তেজিত করে তোলে। ঘনিয়ে আসে চরম সংকট।

"লক্ষ্মণ। (ক্রন্দন) না মা, আমি তোমাকে কিছুতেই বিদায় দিতে পারব না। বৎসে! তুমি আমকে ছেড়ে যেও না, যদিও আমি তোমার পিতানামের যোগ্য নই। তুবও বৎসে, মনে কোরো না আমার হৃদয় একেবারেই পাষাণে নির্মিত। রণধীর, তুই তো আমার সর্বনাশের মূল। কি কুক্ষণেই আমি তোর পরামর্শ শুনেছিলেম! কতবার আমি মন পরিবর্তন করেছি – আর কতবার তুই আমাকে ফিরিয়ে এনেছিস। না, আমি এ কাজে কখনোই অনুমোদন করব না। রণধীর, না, আমার এতে মত নেই – আমার রাজত্বেরই লোপ হোক, আর মুসলমানদেরই জয় হোক, বা দেশই উৎসন্ন হয়ে যাক, তাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।...

সরোজিনী। পিতঃ! আপনি কেন আমার জন্যে অপমানের ভাগী হচ্ছেন? আমার জন্যে আপনি কিছু ভাববেন না। এ কথা যেন কেউ না বলতে পারে যে, আমার পিতার জন্যে দেশ দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হল, বাপ্পা রাওর বিশুদ্ধ বংশ কলঙ্কিত হল, বরং এর চেয়ে আমার মৃত্যুও শতগুণে প্রার্থনীয়।...

রণধীর। মহারাজ! যতক্ষণ রাজা দেশের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, ততক্ষণই তিনি রাজা নামের যোগ্য।... মহারাজ! এই কি আফনার ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা? এই কি আপনার দেশানুরাগ? এই কি আপনার দেশভক্তি? এইরূপে কি আপ নি সূর্যবংশাবতংস রাজা রামচন্দ্রের বংশ বলে পরিচয় দেবেন? আর, চতুর্ভুজা দেবীর এই পবিত্র মন্দিরে দণ্ডায়মান হয়ে তাঁর সমক্ষেই আপনি তাঁর অবমাননা কত্তে সাহসী হচ্ছেন?"[১৪]

(পঞ্চম অঙ্ক/তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)

শেষ পর্যন্ত সরোজিনীকে যখন হত্যার জন্য খড়্গ তোলা হয় তখন বিজয় সিংহ এসে (ক্লাইমেক্স) ভৈরবাচার্যের গতি রুদ্ধ করে। রাজার আজ্ঞার বিরুদ্ধে এই বলিদানের প্রতিবাদ করে। ভৈরবাচর্য ভয় পায়। আবার গণনা করে। গণনা মতো– 'মহাশয়েরা একটু ক্ষান্ত হোন, বাস্তবিকই দেখছি আমার গণনায় ভুল হয়েছিল।' রণধীর কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাই।

বিনোদিনী দাসী এ প্রসঙ্গে দর্শক উত্তেজনা সম্পর্কে বলেছেন, "সে সময় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর মহাশয়ের অশ্রুমতী ও সরোজিনী নাটকের অভিনয় হ'য়েছিল। সরোজিনী নাটকখানির অভিনয় ভারি জমত। অভিনয় করতে করতে আমরা একেবারে আত্মহারা হয়ে যেতাম। শুধু আমরা নয়, যাঁরা দেখ্‌তেন সেই দর্শকবৃন্দও আত্মহারা হ'য়ে যেতেন। একদিনকার ঘটনার উল্লেখ করলেই কথাটা পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। আমি সরোজিনী সাজতাম। সরোজিনীকে বলি দেবার জন্যে-যূপকাষ্ঠের কাছে আনা হ'ল, রাজমহিষীর সমস্ত অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা ক'রে রাজা স্বদেশের কল্যাণ কামনায় কন্যার বলিদানের আদেশ দিয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রোদন করেছেন, উত্তেজিত রণজিৎ সিংহ শীঘ্র কাজ শেষ করবার জন্য তাগিদ দিচ্ছেন। কপট ব্রাহ্মণ বেশধারী ভৈরবাচার্য্য তরবারি হস্তে সরোজিনীকে যেমন কাট্‌তে এসেছে, এমন সময় বিজয়সিংহ যেমন সেখানে ছুটে এসে বল্‌লেন, 'সব মিথ্যে সব মিথ্যে, ভৈরবাচার্য ব্রহ্মণ নয়, মুসলমান, সে মুসলমানের চর,' অমনই সমস্ত দর্শক এতে বেশী

উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিলেন যে তাঁরা আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না, ফুটলাইট ডিঙিয়ে মার মার করতে করতে একেবারে ষ্টেজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তখনই ড্রপ ফেলে দেওয়া হল, তাঁদের ষ্টেজের উপর থেকে তুলে ভেতরে নিয়ে সকলে শুশ্রূষা করতে গেলে গেল! তাঁরা যখন প্রকৃতিস্থ হ'লেন তখন আবার অভিনয় আরম্ভ হ'ল।" [১৫] আর এমন অভিনয়েও দর্শক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সমাচার চন্দ্রিকায় (২ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৪) লেখা হয় ঃ "গ্রেট ন্যাশনালে সরোজিনীর অভিনয় মনোহারী ইহায়ছিল, এমন কি অভিনয় দর্শনে দর্শকগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিল। ফলকথা বলিতে কি এরূপ অভিনয় বোধ হয় ইতিপূর্ব্বে আর কখন হয় নাই।" [১৬]

আর্ট কলেজের শিক্ষক অন্নদাপ্রসাদ বাগচী কৃত সরোজিনীর শেষ দৃশ্যের চিত্র অঙ্কন করেন। বাজারে তা বিক্রি হয় সমাদরে। হাওড়ার অভিনয়ে নাট্যকারকে যেভাবে অভিনন্দন জানানো হয় তা প্রানিধানযোগ্য – "হাওড়ায় একদিন একটা থিয়েটারে 'সরোজিনী'র অভিনয় হয়, জ্যোতিবাবুও তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। যে দৃশ্যে বিজয়সিংহ কর্তৃক সরোজিনীর উন্ধার সাধিত হয়, সেই দৃশ্যে কিয়ৎক্ষণের জন্য সমগ্র রঙ্গালয় মুখরিত করিয়া দর্শকগণ উচ্ছ্বসিতকন্ঠে ঘনঘন চিৎকার করিয়াছিল, 'Thanks, thanks to the young authour.'।" [১৭] বিনোদিনী তাঁর স্মৃতি কথাতেও তা বলেছেন। গান প্রসঙ্গে তা বলা হবে।

এতক্ষণ রণধীরকে মনে হচ্ছিল সরোজিনীকে বলি দেওয়ার জন্য যতটা সে উদগ্রীব, হয়ত ততখানি দেশপ্রেমি নন। কিন্তু এই পটপরিবর্তনে দেখা গেল স্বদেশকে বিদেশিদের হাত থেকে রক্ষার জন্যই তার এত সচেষ্টতা, স্বদেশের মঙ্গল কামনায় যে তার উদ্দেশ্য সে জানায় দর্শক চিত্তে দেশপ্রেমিক হিসাবে তার স্থান হয়। বণধীর বলে –

"রণধীর। আমি যে গণনায় ধ্রুব বিশ্বাস করে কেবল স্বদেশের মঙ্গলকামনায় ও কর্তব্যবোধে এতদূর পর্যন্ত করেছিলেম, একটি অবলা বালাকে নিরপরাধে বল দিয়ে, আর একটু হেলই সমস্ত রাজপরিবারকে শোকসাগরে নিমগ্ন কচ্ছিলেম – এমন-কি, রাজদ্রোহী হয়ে আমাদের মহারাজের প্রতি কত অত্যাচার, কত অন্যায় ব্যবহারই করেছি, সেই গণনায় বিশ্বাস করেই আপনার সহিত যুন্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেম।" [১৮]

(পঞ্চম অঙ্ক/তৃতীয় গর্ভঙ্ক)

গণনার ভুলকে বিশ্বাস করেই সে সরোজিনীর মৃত্যু প্রার্থনা করে বলে জানায়, সে মৃত্যু আসলে স্বদেশের কল্যাণে তাই তার স্বদেশপ্রেমের কথা বলতে হয়। স্বদেশকে রক্ষার বাসনা বোঝা যায়। নাটকীয় পট পরিবর্তনের উত্থিত সমস্যার সমাধানের পালা শুরু হয়। রণধীর সংশোধিত হল। সরোজিনী প্রাণ পেল। মহিষী ও বিজয় সিংহ স্থির হল।

ভৈরবাচার্যের আদেশমত রোশেনারার মৃত্যু হল। সরোজিনী যে পবিত্র নারী, সত্যের আশ্রয়ী, স্বদেশপ্রেমে উজ্জ্বল তার মৃত্যু স্বদেশবাসীকে ব্যথিত করতো অবশ্যই কিন্তু তার বৈপরীত্যে অঙ্কিত রোশেনারা হীনমানসিকতা ও বিজয় সিংহকে না পাওয়ার জন্য মৃত্যুবরণ – স্বাভাবিক হয়েছে। সে যে

এই দেশের পতন চায়, যে দেশ তাকে সম্মান দিয়েছে, যে রাজ কন্যা তাকে বোনের স্নেহ দিয়েছেন; সেই রোশেনারা আপন দেশের গৌরব বৃদ্ধির জন্য এ দেশের দরজা খুলে দিয়েছে। সরোজিনীর মৃত্যু কামনা করেছে। এককথায় সে এ দেশের শত্রু। তাই কপট শত্রুর মৃত্যু নাট্যকারের স্বদেশ প্রেমেরই বার্তা আনে। সুশীল রায় মহাশয়ও একই কথা বলেন, ‘‘এই চরিত্রটি পুরুবিক্রম নাটকের অম্বালিকা চরিত্রের অনুরূপ। কিন্তু পার্থক্য এই যে, অম্বালিকা জীবিত অবস্থায় দুরূহ শোক ভোজ করল, কিন্তু রোষেনারা মৃত্যুর দ্বারা বীতশোক হয়ে গেল।’’ [১৯]

এ প্রসঙ্গে আরও একটি সমস্যা সমাধানের দিকে নাটকটি এগিয়ে গেছে। যে কপটার আশ্রয় নিয়ে ভৈরবাচার্য হিন্দু ধর্মকে আঘাত করেছে, রাজ্যবাসীর ধর্মীয় দুর্বলতার সুযোগে আপন স্বার্থ সিদ্ধ করেছে তারও প্রায়শ্চিত্য সূচিত হয়েছে। পররাজ্য হরণ করার চৌর্যবৃত্তির শাস্তি স্বরূপ এমন এক পন্থা নিয়েছেন যা সত্যই প্রশংসা যোগ্য।

লক্ষ্মণ সিংহের বুক থেকে কন্যা কেড়ে নিয়ে বাদশাকে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ করে দেয় মহম্মদ আলি ওরফে ভৈরবাচর্য। পিতৃহৃদয়ের করুণ কান্না ভৈরবাচর্যকে টলাতে পারে নি। ভৈরবও উপলব্দ্ধি করে নি একজন পিতার সন্তান হারানোর যন্ত্রনা। তাই ঐ একই যন্ত্রণা তাকে দিয়ে যেন তার পাপস্খলন করা হয়েছে। রোশেনারা আসলে তারই কন্যা। ভৈরবাচর্যের হাহাকার আসলে দেশের শত্রুর হাহাকার। স্বদেশপ্রেমে সিক্ত দেশবাসীর এরূপ ছলের এমন ট্রাজেডিই প্রার্থনা করে। ভৈরবের হাহাকার ছড়িয়ে পড়ে। চারিদিকে সন্তান হারানোর যন্ত্রণায় দর্শখ লক্ষণ সিংহের মর্মবেদনাকে ভুলতে চায়। ঠিক ভিলেনের শাস্তিতে দর্শক যেমন তৃপ্তি পায়, ভৈরবের এমন হাহাকারে স্বদেশপ্রেমি প্রত্যেকটি মানুষ স্বদেশের এ হেন শত্রুর অন্তঃদ্বন্দ্বের জ্বালাতে তৃপ্তি পাবে। স্বদেশানুরাগ জন্মলেবে স্বদেশবাসীর চিত্তে। নাটকীয় এই মুহূর্তে যখন উত্থিত সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়। অস্থির রাজ্য স্থির হয়। চিতোরের ভিতরে ঘটে যাওয়া নানা দ্বন্দ্বের অবসান হয় তখনই যখন চিতোর আক্রমণ করতে আসে আলাউদ্দিন সৈন্য।

পঞ্চম অঙ্কে রোমান্টিক প্রণয় আখ্যান ও মাতৃভূমি রক্ষার ব্রত পরস্পরে সংপৃক্ত ধারায় বর্ণিত হয়েছে। ইংরেজ মোহমুক্তির এই কালে যখন নাট্যাভিনয়, জনগণকে চেতনা দেওয়ার একমাত্র মাধ্যম হয়েছে, যখন সমগ্র জাতিকে ঐক্যবন্ধ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সেখানে এ নাটক সে উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করেছে। অর্থাৎস্বদেশের প্রতি মমত্ব, কর্তব্য জাগিয়ে তুলতে সার্থক হয়েছে।

ষষ্ঠ অঙ্কএমন মাত্রায় পৌঁছে গেছে যে, নাটকের সমস্ত যাত্রা, চিতোর যুবকদের স্বদেশরক্ষার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বিদেশি যবনদের অত্যাচারের মাত্রাকে কর্ম-ক্রিয়ার মধ্যে এমন ভয়ংকর ভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে স্বদেশবাসীর হৃদয় যেমন সিক্ত হয়েছে তেমনি ব্রিটিশ শক্তির ভাবি অত্যাচারও তার পরিণতির কথা চিন্তা করে স্বদেশমন্ত্রে স্বদেশবাসী দীক্ষিত হয়েছে।

দিল্লির সম্রাটের ভয়ংকর রূপের আড়ালে নাট্যকার ইংরেজ শাসনের কদর্য দিকটিকে এভাবে দর্শক সামনে উপস্থাপন করেছেন। আলাউদ্দিনের সৈন্যরা চিতোর আক্রমণ করে ফেলে। গৈরিক বস্ত্র

পরিহীতা মহিষীও রাজকন্যা অগ্নিকুণ্ডে আত্মগোপন করেছে। লক্ষ্মণ সিংহ এখনও আকাশবাণীর উপর বিশ্বাস করে তার দ্বাদশপুত্রের মৃত্যুর নির্দেশ দেন। স্বদেশকে রক্ষা করতে এ পদক্ষেপ তাকে নিতে হয়। 'যুদ্ধে প্রাণ তো রাজপুতের প্রধান ধর্ম' বলে মহিষীকে প্রবোধ দেয়। অন্যদিকে ভৈরবাচার্যের ছদ্মবেশি রূপ ধরা পড়লে আর কিছুই করার থাকে না। ভৈরবাচার্যের কৃত আকাশবাণীই চিতোরের পরিণতির মূল কারণ। রাজা এবার অনুশোচনা করেন–

''লক্ষ্মণ। সে মুসলমান! তবে কি সেই যবন কুমারী বাস্তবিকই তারই কন্যা? ওঃ এখন আমি বুঝতে পাচ্ছি। তা সম্ভব বটে। কি আশ্চর্য! এতদিন সে ধূর্ত যবন আমাদের প্রতারণা করে এসেছে? আমরা কি সকলেই অন্ধ হয়েছিলেম?... ও! কি শঠতা! কি ধূর্ততা! চলো, আর না – ঐ ধূর্ত যবনদের এখনি সমুচিত শাস্তি দিতে হবে – অজয় সিংহকে নগর হতে এখনি প্রস্থান করতে বলো – সেই আমার বংশ রক্ষা করবে। আমি এখন যুদ্ধে চললেম। এই হস্তে যদি শত সহস্র যবনের মুণ্ডপাত কত্তে পারি তা হলেও এখন কতকটা আমার ক্রোধের শান্তি হয়। ওঃ! কি চাতুরী! কি প্রতারণা! কি শঠতা! মহিষি! আমি বিদায় হলেম, যদি যুদ্ধে জয়লাভ কত্তে পারি – চিতোরের গৌরব রক্ষা কত্তে পারি তা বলেই পুনর্বার দেখা হবে, নচেৎ এই শেষ দেখা।''[২০]

(পঞ্চম অঙ্ক/ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক)

বিজয় সিংহ নেপথ্যে হুঙ্কার দেয়। এক চরম অস্থিরতা তৈরি হয়। শেনা যায় চিতোররাজ পরাজিত হয়েছে। আপন সতীত্বকে যবনদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মহিষী অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন। সরোজিনী বিজয় সিংহকে দেখার জন্য উগ্রগীব হয়ে উঠলেন। নেপথ্যে শোনা গেল চিতোর রাজ্যের অবসান, 'চিতোরের সূর্য চিরকালের জন্য অস্ত হল।' (দূরে যবনদের জয়ধ্বনি) বাইরে বিজয়ের বীরত্ব সূচক হুঙ্কার, স্বদেশকে রক্ষা করার ঐকান্তিক মরনপণ চেষ্টা, 'তোরা কখনোই অন্তঃপুরে প্রবেশ কত্তে পারবি নে।' বা 'যতক্ষণ আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাকবে, ততক্ষণ আমি তোদের কখনোই ছাড়ব না।' সরোজিনীকে একমাত্র দর্শন করে যবনদের আঘাত মৃত্যুবরণ করলেন। চিতোর যখন একদিকে ক্ষত-বিক্ষত; চিতোরের বীররা যখন একে একে নিহত হচ্ছে একমাত্র জীবিত পবিত্র কোমল সরোজিনী তখন আলাউদ্দিনের নির্লজ্জ উক্তি এদেশের বাসিন্দাদের রক্তে জ্বালা ধরায়। সরোজিনীকে পদ্মিনী ভেবে সম্রাটের উক্তি –

''আল্লা। (সরোজিনীকে দেখিয়া স্বগত) এই কি সেই পদ্মিনী বেগম? কি চমৎকার রূপ! কেশ আলুলায়িত – পদ্মনেত্র হতে মুক্তাফলের ন্যায় বিন্দু বিন্দু অশ্রুবিন্দু পড়ছে, তাতে যেন সৌন্দর্য আরো দ্বিগুণতর হয়েছে। (প্রকাশ্যে) বেগম! তুমি কেন বৃথা রোদন কচ্ছ? আমার সঙ্গে তুমি দিল্লীতে চলো, তোমাকে আমার প্রধান বেগম করব, তোমার নাম পদ্মিনী? তোমার জন্যেই আমি চিতোর আক্রমণ করেছি। যে অবধি একটি দর্পণে তোমার প্রতিবিম্ব আমার নয়নপথে পতিত হয়, সেই অবিধির আমি

তোমার জন্য উন্মত্ত হয়েছি। ওঠো– অমন কোমল দেহ কি কঠোর মৃত্তিকাতলে থাকবার উপযুক্ত? ওঠো! (হস্তধারণ করিবার উদ্যম)

সরোজিনী। (সত্বর উঠিয়া কিঞ্চিৎ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া) অস্পৃশ্য যবন! আমাকে স্পর্শ করিস নে।

আল্লা। বেগম। তুমি আমার প্রতি অত নির্দয় হোয়ো না, এসতো, আমার কাছে এসো, তোমার কোনো ভয় নেই। আমি তোমাকে কিছু বলব না। (নিকটে অগ্রসর)

সরোজিনী। নরাধম! ঐখানে দাঁড়া, আর-এক পাও অগ্রসর হোস নে –

আল্লা। বেগম! তুমি অবলা স্ত্রীজাতি, তোমার এখানে কেহই সহায় নেই, আমি মনে কল্লে কি বলপূর্বক তোমাকে নিয়ে যেতে পারি নে?

সরোজিনী। তোর সাধ্য নেই।

আল্লা। দেখো বেগম, সাবধান হয়ে কথা কও – আমার ক্রোধ একবার উত্তেজিত হলে আর রক্ষা থাকবে না।

সরোজিনী। রাজপুতমহিলা তোর মতো কাপুরুষের ক্রোধকে ভয় করে না।

আল্লা। দেখো বেগম, এখনও আমি তোমাকে সময় দিচ্ছি, একটু স্থির হয়ে বিবেচনা করো, যদি তুমি ইচ্ছাপূর্বক আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর, তা হলে তোমাকে আমি অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বরী করব নচেৎ –

সরোজিনী। যবন-দস্যু! তোর ওকথা বলতে লজ্জা হল না? সূর্যবংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সিংহের দুহিতাকে তুই ঐশ্বর্যের প্রলোভন দেখাতে আসিস।

আল্লা। বেগম! তুমি অতি নির্বোধের মতো কথা কচ্ছ। আমি পুনর্বার বলছি, আমার ক্রোধকে উত্তেজিত কোরো না। তুমি কি সাহসে ওরূপ কথা বলছ বলো দিকি? আমি বল-প্রকাশ কল্লে কে এখানে তোমাকে রক্ষা করে? এখানে কে তোমার সহায় আছে?

সরোজিনী। জানিস নরাধম, অসহায়া রাজপুতমহিলার ধর্মই একমাত্র সহায়।

আল্লা। তবে আর অধিক কথার প্রয়োজন নেই। অনুনয় মিনতি দেখছি তোমার কাছে নিষ্ফল। এইবার দেখব, কে তোমায় রক্ষা করে – দেখব কে তোমার সহায় হয়? (ধরিতে অগ্রসর)

সরোজিনী। এই দেখ্ নরাধম! আমার সহায় কে?

অগ্নিকুণ্ডে পতন"[২১]

(পঞ্চম অঙ্ক/ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক)

সরোজিনীর প্রতিটি কথায় যবন অর্থাৎ বিদেশিদের প্রতি ঘৃণা বর্ষিত হয়েছে। চারিদিকে যখন যুদ্ধের ভয়ংকর কোলাহল, আপন প্রেমাস্পদকে চোখের সামনে মরতে দেখেছে তখন বাদশার এই উক্তি তার নোংরা, আত্মসর্বস্ব নারীলোলুপতাকে প্রদর্শন করিয়েছে। কিন্তু ক্ষত্রিয় বীর শেষ রক্ত বিন্দু দিয়েও স্বদেশকে রক্ষা করতে জানে। তাই অগ্নিকুণ্ডে মৃত্যু বরণ করে। আলাউদ্দিনের এই নারীলোলুপতার

উদ্দেশ্যে পররাজ্য আক্রমণ, সে রাজ্যের সুখ-সমৃদ্ধ হরণ যখন মঞ্চে দর্শক দেখে তখন বিদেশি শক্তিকে উৎখাত করার জন্য তাদের মনেও গাঢ় স্বদেশপ্রেমের জাগরণ হয়।

সম্রাট জানতে পারে এ পদ্মিনী নয় তাই তার উদ্দেশ্যে নারী মাংস ভক্ষনের জন্য অন্তঃপুরে যাত্রা করে। কিন্তু সেও আগুনে পুড়ে মারা যায়। ভারতীয় নারীর কাছে আপন স্বদেশ, আপন সতীত্বের মতো। তাই নাট্যকার সতীত্বকে এতো বড়ো করে নাট্যকার দেখিয়েছেন। কোনো কিছুর বিনিময়ে, প্রলভনে, ভয়ে সে সতীত্ব বিসর্জন দেওয়ার আগে অর্থাৎ নিজের স্বদেশকে পরহাতে তুলে দেওয়ার আগে মৃত্যুবরণ করতে পারে। নগরের সমস্ত নারী অর্থাৎ যারা ভারতীয় ঐতিহ্যমণ্ডিত সীতা-সাবিত্রীর বংশধর সকল নারীরা আগুনে ঝাঁপ দিয়েছে। কোনোভাবেই যবনস্পর্শ করতে দেয়নি। সমস্ত চিতোরে শ্মশানের দৃশ্য, যাই হোক স্বদেশিকতার জাগরণে গানটির সংযোজন নাট্যকারের অভিষ্টকে সিদ্ধ করেছিল। 'ঘরোয়া' তে-এর জনপ্রিয়তার কথা পাই – ''জ্যোতিকাকামহাশয়ের 'সরোজিনী' নাটকের যাত্রা হয়েছিল, যাত্রাওয়ালারা সেই যাত্রা করে। আমাদের বাড়ির উঠোনে একদিন যাত্রা দেখানো হয়েছিল। আমার মনে আছে, চিতোরের পদ্মিনী আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে –

জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
আগুনে সঁপিবে বিধবা বালা।

আর ভৈরবী যখন দু হাত তুলে খাঁড়া হাতে 'ম্যয় ভুঁখা হুঁ' বলে বের হত তখন আমাদের বুকের ভিতর গুর্ গুর্ করে উঠত। জ্যোতিকাকামশায়ের সরোজিনী নাটকের পদ্মিনীর অগ্নিপ্রবেশের ছবি আর্ট স্টুডিয়ো থেকে লিথোগ্রাফ প্রিন্ট্ হয়ে বেরিয়েছিল, ঘরে ঘরে সেই ছবি থাকত। ... তখন জ্যোতিকাকামশায় নাট্যজগতে অদ্বিতীয়, অপ্রতিহত প্রতাপ তাঁর বইয়ের। বাজার ছেয়ে গিয়েছিল তাঁর বইয়ে বইয়ে। জায়গায় জায়গায় তাঁর নাটক অভিনয় হত। রবিকাকা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) তখন কোথায়। তখনো তিনি আসরে কল্কে পাননি।''[২২] এখানেও দেখি শেষ পর্যন্ত শত্রুও আতঙ্কিত হয়।

''আল্লা। তাই তো! এ কি! সমস্ত চিতোর নগরই যেন একটি জ্বলন্ত চিতা বলে বোধ হচ্ছে। পথঘাট ধূমে আচ্ছন্ন, কিছুই আর দেখা যায় না, পথের দুই পার্শ্বে সারি সারি চিতা জ্বলছে – ওঃ! কি ভয়ানক দৃশ্য – ও কি আবার? ও দিকে আগুন লেগেছে নাকি?''[২৩]

(পঞ্চম অঙ্ক/ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক)

ভয়ংকর এক চিত্র এখানে বর্ণিত। স্বদেশচেতনা জাগ্রত করতে এর জুরি পাওয়া ভার। ঠিক সেসময় নেপথ্যে ভেসে আসে গান – 'জ্বল জ্বল, চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ' আহত নারী ও পুরুষ কন্ঠে এই গীত শুনে সম্রাট ভারতীয়দের তেজ আর মহিলাদের সতীত্বকে জয়গান করেছে। এই দুই শক্তির কাছে তার পরাজয় হয়েছে। ফিরে গেছে দিল্লিতে বাদশার এই উক্তি –

''আল্লা। ওখান থেকে ঐ আহত রাজপুতগণ আবার কি বলে উঠল – ওরা মৃতপ্রায় হয়েছে, তবু দেখছি এখনও ওদের মনের তেজ নির্বাণ হয়নি।... আশ্চর্য! আশ্চর্য ধন্য হিন্দুমহিলাদের সতীত্ব! হায়! এত কষ্ট করে যে জয়লাভ কল্লেম তা সকলই নিষ্ফল হল। চলো, এখন আর এ শূন্য শ্মশানপুরীতে থেকে কি হবে?''[২৪]

শেষ পর্যন্ত চিতোরকে যবন হাতে পড়তে হয় নি। স্বদেশবাসীকে গৌরবান্বিত করেছে। চিতোরবাসী নিজেদের জীবনের বিনিময়ে চিতোরকে শৃঙ্খলমুক্ত করেছে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে পরাজিত হয়েও শুধু স্বদেশ সম্পর্কে সেন্টিমেন্ট ও আত্মৎসর্গই এই স্বদেশকে রক্ষা করেছে। বিদেশি শক্তির প্রতাপ, কপটতা নারীলোলুপতা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে গেছে। যদিও ষষ্ঠ অঙ্কটি যে কেবল নাটকটিকে ট্রাজিক মহিমাদানের জন্য তা নয়, দর্শকমনে স্বদেশের এই পরিণতিতে ব্যথিত হই বৈকি। অজিত কুমার ঘোষ বলেছেন – "... পরে ষষ্ঠ অঙ্কের যে অগ্নিকুণ্ড-দৃশ্য দেখান হইয়াছে, নাটকের দিক দিয়া তাহার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। বিজয়সিংহ এবং সরোজিনীর মৃত্যু ট্র্যাজিক হয় নাই। কারণ এই রকম মৃত্যুর সম্ভাবনা তাহাদের চরিত্রবিকাশের অভ্যন্তরে বিদ্যমান ছিলনা। শেষ অঙ্কের মৃত্যুদৃশ্য অত্যাচারীর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ অভিযোগ এবং দুঃখপূর্ণ নির্বেদ দর্শকের মনকে আচ্ছন্ন করে বটে, কিন্তু তবুও উহা ট্র্যাজেডি হয় নাই, কারণ প্রকৃত ট্র্যাজেডি চরিত্রের মধ্য দিয়া বিকশিত হইয়া উঠে।"[২৫]

বাংলা নাটকে স্বদেশচেতনা আনার যে চেষ্টা নাট্যকার করেছেন তা সম্পূর্ণ সফল হয়েছেন। এখানে কিছু কথাও বীরত্ব সূচক উক্তিতেই স্বদেশপ্রীতি নাট্যকার আনেন নি। এনেছেন বক্তব্য অপেক্ষা অনেক ক্রিয়া ও কর্ম বৃত্তির অনুকরণের দ্বারা। তাছাড়া শেষে যে ট্রাজেডি তার স্বদেশবাসীর পক্ষে সহ্যের অতীত। পররাষ্ট্রের ভয়ংকর এই অত্যাচারে লক্ষ্মণ সিংহের পরিবার শুধু ধ্বংস হয়নি। ধ্বংস হয়েছে সরোজিনী বিজয় সিংহের প্রেম, আর তা এমনভাবে যে প্রতিটি সহৃদয় ব্যক্তিকে স্তম্ভিত করেছে।

নাট্যকার নাটকের শেষ দৃশ্য এত মৃত্যু এনেছেন তাতে দর্শক হয়ত ব্যথিত হবে কিন্তু চিতোর রক্ষার একমাত্র উপায় যে এই মৃত্যু তা দেখাতে নাট্যকারকে এ আশ্রয় নিতে হয়েছে। তাছাড়া রোমান্টিক প্রেক্ষাপটের আশ্রয়ে নাট্যকার দেশপ্রীতি জাগাতে চেয়েছেন। তাই সেই সুন্দর পবিত্র দুটি হৃদয়ের মিলনে বিদেশি শক্তির হস্তক্ষেপও তার করুণ পরিণতি দর্শকদের অস্থির করে তুলেছে। প্রেমের পরিণতিতে তারা বেঁচে থাকলে বিদেশি শত্রুদের সম্পর্কে তিক্ত ধারণা যেমন অল্পক্ষণেই নিভে যেত তেমনই স্বদেশ অপেক্ষা প্রেমের সম্পর্ক রক্ষা গুরুত্ব পেত। কিন্তু দর্শকমনে স্বদেশচেতনাকে দীর্ঘস্থায়ী করতে এ পরিণতির প্রয়োজন ছিল। "ভৈরবাচার্য এবং রণধীর সরোজিনীকে বলি দিবার যে সুশৃঙ্খল এবং শক্তিশালী আয়োজন করিয়াছিল তাহা ফাঁসিয়া যাইবার পর নাটক সুপরিণত সম্পাতিতে পৌঁছিয়াছে। বিজয় এবং সরোজিনীর মধ্যে যে বিচ্ছেদ দুর্নিবার হইয়া উঠিয়া নাটকখানিকে বিষাদান্ত ট্র্যাজিক পরিণতির দিকে ঠেলিয়া অনিতেছিল, রহস্যোদ্‌ঘাটনের পর তাহা মিলনের শান্তিতে আসিয়া সমাপ্ত হইয়াছে, সুতরা পঞ্চমাঙ্কে প্রকৃতপক্ষে নাটকের শেষ হইয়াছে।"[২৬]

রাজা লক্ষ্মণ সিংহ প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা উচিত। নাটকের সূচনায় হল আলৌকিক একটি দৈববাণীকে ভরসা করে। প্রজাপালক রাজার জানা উচিত ছিল মানব ধর্ম সম্পর্কে। বিজয় সিংহ সহজেই সেখানে বলতে পারেন,

"বিজয়। ওঃ কি ভয়ানক কথা! শুন্ধ অত্যাচার নয় – অত্যাচারের পর আবার মিথ্যা কথা! আমি কি এই বলিদানের কথা শুনেছিলাম? আর শুনলেও কি তাতে আমি অনুমোদন কত্তেম? কখনোই না। আমার যদি সহস্র প্রাণ থাকে, তাও আমি দেশের জন্য অনায়াসে অকাতরে দিতে পারি, তাই বলে একজন নির্দোষী অবলার প্রাণবধে আমি কখনোই সম্মত হতে পারি নে। আর দেবতারা যে এরূপ অন্যায় আদেশ করবেন তাও আমি কখনো বিশ্বাস কত্তে পারি নে। যে এরূপ কথা বলে, সে দেবতাদের অবমাননা করে – সেই দেব-নিন্দুকের কথা আমি শুনি নে।"[২৭]

(চতুর্থ অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

সেকথা বিশ্বাস করেন না চিতোর রাজ। তাই নিজ রাজ্যকে রক্ষা করতে দৈববাণীকে ফলপ্রসু করার জন্য উদ্যত হন। এ হেন অস্থির চিত্ত একজন রাজার শোভা পায় না। পাশাপাশি তার দোলচলতা নাটকটিকে এক ট্রাজেডির সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

বিদেশি আক্রমণ থেকে চিতোর রক্ষা করার যেন মূল কারণ শুধু রাজ্যলোভ রাজত্ব কথা। দেশের পরাধীনতার করা, দেশবাসীর কথা তিনি ভাবেননি বেশি। রাজ্য হারানোর ভয় তাকে বার বার তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে।

"লক্ষ্মণ। (স্বগত) ওঃ কি বিষম সংকট! এক দিকে স্নেহ মমতা, আর-এক দিকে কর্তব্য-কর্ম! এতদূর অগ্রসর হয়ে এখন কি করে নিরস্ত হই? আর তা হলে রণধীরের কাছেই বা কি করে মুখ দেখাব? সৈন্যগণই বা কি বলবে? রাজত্বই বা কি করে রক্ষা করব? তোমার কন্যার জীবন অপেক্ষা তোমার রাজত্ব বড়ো হল?....."[২৮]

(চতুর্থ অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

এছাড়া নিজ কন্যাকে বলিদান দেওয়ার জন্য রাজার আগ্রহ এত বেশি, অসাধ্যকে সাধন করার তীব্র চেষ্টা। সেখানে তার স্বদেশপ্রেম অনেকাংশে গৌণ হয়ে গেলে। সর্বোপরি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কারো না কারো দ্বারা তিনি পরিচালিত হয়েছেন। তার চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলি স্বদেশপ্রেম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাটকে কন্যার মৃত্যু, মহিষীর মৃত্যু সর্বোপরি চিতোরের আক্রমণের জন্য রাজার দুর্বলতা মূলত দায়ী। দেশীয় শক্তিকে ঐকবন্ধ করার পরিবর্তে ব্যক্তিগত সংস্কার বিশ্বাসও চাওয়া পাওয়াকে বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে এক ট্রাজিক পরিণতি ডেকে এনেছেন।

সরোজিনী কাষ্ঠপুত্তলির মতো চালিত হয়েছে। তার মধ্যেও স্বদেশ সম্পর্কে তার বোধ, স্বদেশ রক্ষার জন্য তার ব্রত দেখেছি স্বদেশপ্রেমকে উজ্জীবিত করেছে।

বিজয়সিংহ এ নাটকে স্বদেশ প্রেমে সিক্ত এক চরিত্র। বীরের ন্যায় দৃঢ় মানসিকতা, স্বদেশের গৌরবকে রক্ষা করার সচেষ্টতা চরিত্রটিকে বীর রাজার মহিমা দান করেছে। তার ক্রিয়া কলাপও আচরণে স্বদেশপ্রেম ফল্গু ধারার মতো বয়ে চলেছে। নাট্যকার এই চরিত্রটির মধ্যেই মূলত স্বাদেশিকতার বিস্তার ঘটাতে চেয়েছেন।

পূর্ববর্তী দু'টি নাটকেই দেখেছি যবনের সঙ্গে রাজপুত সেনার দ্বন্দ্ব। সম্প্রদায়িক এই ইতিহাস অনুসঙ্গকে নাট্যকার ইংরেজ ও ভারতীয়দের আলোকে অঙ্কন করতে চেয়েছেন। নাট্যমোদী দর্শকের কাছে এ যবন কিন্তু এ দেশীয় যবন নয়, তারা বিদেশি তাদের অত্যাচার ও শোষণই সেখানে বড়ো হয়ে উঠেছে। ফলে বিদেশিদের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টি করতে এ যবনকূল কোনো বাধার সৃষ্টি করেনি। এ দেশীয় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়েছে।

পূর্বে বলা হয়েছে, এমন নাট্য রচনায় স্বাধীনতাকামী মানুষের জাগরণে ব্রিটিশ শক্তি নড়ে বসে। নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনজারিতে, ভারতীয়দের স্বদেশপ্রেমকে বাধা দিতে ইংরেজ শক্তি যে কৌশল নেয় তাতে এই নাটকের গুরুত্ব অপরিসীম। যদি নামকরণের মধ্যে নাট্যকার দর্শককে রোমান্টিক কাহিনির লোভ দেখিয়েছেন, তথাপি স্বদেশপ্রেমই এর মূল বিষয়।

নাটকের নাম 'সরোজিনী' হলেও তাতে যে স্বদেশপ্রেমের শক্তিই লুকিয়ে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না – ''সরোজিনী নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র বটে, কিন্তু এই নাটকের কেন্দ্রাভিকর্ষণী শক্তি সমূহের সংগ্রামই মূল বিষয়।''[২৯]

সরোজিনী নাটকে গান প্রসঙ্গ

নাটকে ব্যবহৃত মোট গানের সংখ্যা হল চার ঃ–
সেগুলি হল –

১. সমরো তেগ অদা কো জরা শুনাতো সহি,	(দ্বিতীয় অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)
২. তারে ভুলিব কেমনে?	(দ্বিতীয় অঙ্ক/দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)
৩. সখি! সে কি তা জানে।	(দ্বিতীয় অঙ্ক/দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)
৪. জ্বল, জ্বল, চিতা! দ্বিগুণ দ্বিগুণ	(ষষ্ঠ অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

প্রথম গানটি বাদশার নিকট নর্তকীগণ কর্তৃক গীত হয়। এটি তৎকালে প্রচলিত একটি ঠুংরী। বিনোদনের জন্যই এই গানের গুরুত্ব। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গানটি রোশেনারা কর্তৃক গীত। প্রথম গানটি রচনা করেন নিধু বাবু। বিজয় সিংহের প্রতি প্রেমের উপলব্ধিতে এ গানগুলি গীত। দ্বিতীয় গানটি রচনা করেন শ্রীধর কথক। তাও রোমান্টিক অনুসঙ্গে। অর্থাৎ তিনটি গান নাট্যকারের নিজের রচনা নয় এবং স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো ভূমিকা নেয় না। তবে চতুর্থ গান 'জ্বল, জ্বল, চিতা। দ্বিগুণ, দ্বিগুণ' গানটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন। এ গানটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে নতুন উন্মাদনার সূচনা হয়। জীবনাস্মৃতিতে পাই –

'রবীন্দ্রনাথ তখন বাড়িতে রামসর্বস্ব পন্ডিতের নিকট সংস্কৃত পড়িতেন। আমি (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) ও রামসর্বস্ব দুইজনে রবির পড়ার ঘরে বসিয়াই 'সরোজিনীর' প্রুফ সংশোধন করিতাম। রামসর্বস্ব খুব জোরে-জোরে পড়িতেন। পাশের ঘর হইতে রবি শুনিতেন ও মাঝে মাঝে পন্ডিত মাহশয়কে উদ্দেশ্য করিয়া কোন স্থানে কি করিলে ভালো হয় সেই মতামত প্রকাশ করিতেন। রাজপুত মহিলাদের চিতাপ্রবেশের যে একটা দৃশ্য আছে, তাহাতে পূর্বে আমি গদ্যে একটা বক্তৃতা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম।

যখন এই স্থানটা পড়িয়া প্রুফ দেখা হইতেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। গদ্য-রচনাটি এখানে একেবারেই খাপ খায় নাই বুঝিয়া কিশোর রবি একেবারে আমাদের ঘরে আসিয়া হাজির। তিনি বলিলেন– এখানে পদ্যরচনা ছাড়া কিছুতেই জোর বাঁধিতে পারে না। প্রস্তাবটা আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না – কারণ, প্রথম হইতেই আমারও মনাট কেমন খুঁত-খুঁত করিতেছিল। কিন্তু এখন আর সময় কৈ ? আমি সময়াভাবের আপত্তি উত্থাপন করিলে রবীন্দ্রনাথ সেই বক্তৃতাটির পরিবর্তে একটা গান রচনা করিয়া দিবার ভার লইলেন এবং তখনই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' এই গানটি রচনা করিয়া আনিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন।

'সরোজিনী' প্রকাশিত হইবামাত্রই কলিকাতার সাধারণ থিয়েটারে বইখানি অভিনীত হইয়া গেল। পুরু-বিক্রম ও সরোজিনী দুইখানিই জনসমাজে খুব প্রশংসালাভ করিল। জ্যোতিবাবুর নাট্যকার বলিয়া একটা খ্যাতিও প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। বিশেষত 'সরোজিনী' অভিনয়ের পর বাংলাদেশে জ্যোতিবাবুর যশের বিজয়দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। সকলেই একটা অভূতপূর্ব অমৃতস্বাদনের তৃপ্তিসুখে বিভোর হইয়া গেল। এক কথায়, 'সরোজিনী' তখন বাংলানাটকে এক নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছিল।"[৩০]

নাটকের এই দৃশ্যে যবন সৈন্যরা যখন চিতোর আক্রমণ করে ফেলেছে। বিজয় সিংহ, লক্ষ্মণ সিংহ মারা গেছেন। মহিষী ও সরোজিনী নিজ সতীত্ব রক্ষার জন্য অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়েছেন, চিতোর যখন অগ্নিপুরী তখন গীত হয় এই গান। বিনোদিনী দাসীও এই গানের স্মৃতি চারণা করেন –

"একটা কথা আমি না বলে থাক্‌তে পাচ্ছি না। আমরা সেজে গুজে যখন ষ্টেজে নামতাম, তখন আমরা আত্ম-বিস্মৃত হ'য়ে যেতাম। আমাদের নিজেদের সত্তা অবধি ভুলে যেতাম। সে সব কথা মনে হ'লে এখনও গা শিউরে উঠে।

'সরোজিনী' নাটকের একটি দৃশ্যে রাজপুত ললনারা গাইতে গাইতে চিতারোহণ করছেন। সে দৃশ্যটি যেন মানুষকে উন্মাদ করে দিত। তিন চার জায়গায় ধূ ধূ করে চিতা জ্বলছে, সে আগুনের শিখা দু'তিন হাত উঁচুতে উঠে লক্‌লক্ করছে। তখন ত বিদ্যুতের আলো ছিল না, ষ্টেজের ওপর ৪।৫ ফুট লম্বা টিন পেতে তার ওপর সরু সরু কাট জ্বেলে দেওয়া হ'ত। লাল রঙের শাড়ী পরে কেউ বা ফুলের গয়নায় সেজে, কেউ বা মালা হাতে নিয়ে এক এক দল রাজপুত রমণী, সেই

'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা॥
দেখ্‌রে যবন দেখ্‌রে তোরা
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালাবি সবে।
সাক্ষী রহিলেন দেবতা তার
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে॥'

গাইতে গাইতে চিতা প্রদক্ষিণ করছে, তার ঝুপ করে সেই আগুনের মধ্যে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে পিচকারী করে সেই আগুনের মধ্যে কেরোসিন ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে, তাতে কারু বা চুল পুড়ে যাচ্ছে, কারু বা কাপড় ধরে উঠছে – তবুও কারু ভ্রুক্ষেপ নেই – তারা আবার ঘুরে আসছে, আবার সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তখন যে কি রকমের একটা উত্তেজনা হ'ত তা লিখে ঠিক বোঝাতে পারছি না।"[৩১]

এ গানের জনপ্রিয়তা গিরিশচন্দ্রের কথাও পাওয়া যায়, "পুরু বিক্রম নাটকের সঙ্গীত – 'জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়' এবং সরোজিনী নাটকের ক্ষত্রিয় মহিলাগণের জহর ব্রতের গান – 'জ্বল জ্বল চিতা, দ্বিগুণ, দ্বিগুণ পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা" সে সময়ে পথে ঘটে – সর্ব্বত্র গীত হইতে থাকে।'[৩২]

নাটকটি জনপ্রিয়তার মূলে এই গানের অবদান অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ রচিত এই গানটি নাটকটির জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ। গানটি প্রসঙ্গে ১২৮৩, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ -তে 'বান্ধব' পত্রিকায় 'সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় একটি কবিতা লিখেই নাট্যকারের স্বদেশপ্রেমকে মর্যাদা দেওয়া হয়।'[৩৩] পত্রিকায় সমস্ত গৌরবকে নাট্যকারের দেওয়া হলেও রবীন্দ্রনাথ মূলত তার অনেকাংশে অধিকারী। যাই হোক, স্বদেশ প্রেমের গান হিসাবে এটির গুরুত্ব যে অপরিসীম তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করতে এ নাটকের অভিনয় সাফল্য প্রমাণ করো – গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে দু'বার অভিনয় শনিবার ৫মে ও ১২মে ১৮৭৭ হয়। অভিনয় প্রসঙ্গে সমাচার চন্দ্রিকায় (২৭ বৈশাখ ১২৮৪) প্রকাশ পায় – "গত শনিবার সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। অভিনেতাগণের মধ্যে লক্ষ্মণ সিংহ, বিজয়, সরোজিনী, রোষেণারা এবং রাণীর অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল। শূন্যে কালীর আবির্ভাব বড় আশ্চর্য হইয়াছিল। সরোজিনীর অভিনয়ে দর্শকবৃন্দ ব্যথিত হন। চতুর্ভুজা দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে সরোজিনীর খেদোক্তি, রোষেণারার বলিদান এবং রাজপুত মহিলাগণের চিতায় প্রাণত্যাগ অতীব মনোহারী হইয়াছিল।"[৩৪]

নাটকটি বাঙালি দর্শকের মনে জ্বালা ধরিয়েদিল। ব্রিটিশকে সচেতন করেছিল। ফলস্বরূপ নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনও তড়িঘড়ি বলবৎ করতে হয়েছিল, "মহাসমারোহে (গ্রেট) ন্যাশনাল থিয়েটারে উপর্য্য পরি অভিনীত হইল এবং দর্শকগণের নিকট প্রভূত প্রশংসা লাভ করিল। অমৃতলাল বিজয় সিংহের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অভিনয় চাতুর্য্যে সকলকে মুগ্ধ করিতে লাগিলেন।"[৩৫]

দেবজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "চতুর্থ অভিনয়ের দিন *The Statesman* পত্রিকার বিজ্ঞাপনে তারই প্রকাশ ঃ

'GREAT NATIONAL THEATRE

THIS DAY

Saturday, 19th February 1876

FOR THE FOURTH AND LAST TIME

That established Favourite,

SAROJINI'

"এ সময় মঞ্চে মঞ্চে অভিনীত হতে থাকে স্বাধীনতাকামী নাট্যরচনা। আক্রোশে ফেটে পড়ে ব্রিটিশ সরকার। ১৮৭৬-এর মার্চ আসে আইনসচিব হব্‌হাউস Dramatic Performances Control Bill নামে এক প্রস্তাবিত খসড়া পেশ করেন ভাইসরয় কাউন্সিলে। ঐ বছরেই ডিসেম্বর মাসে নাট্যশালার স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হল। প্রণীত হল কুখ্যাত আইন 'Dramatic Performances Control Act of 1876'। এর মধ্যকালীন সময়ে প্রায়শই ধরে নিয়ে যাওয়া হত বিভিন্ন কুশীলবদের। চলত মামলা। কিন্তু অভিনয়ও থেমে থাকেনি। অভিযুক্ত অভিনেতাদের সাহায্যকল্পে সরোজিনী অভিনয়ের আয়োজন হয় ১১ মার্চ ১৮৭৬। এবার নামভূমিকায় সুকুমারী দত্ত। *The Statesman*-এর বিজ্ঞাপনে পাই

'GREAT NATIONAL THEATRE

This day, Saturday, 11th March 1876

For the benefit of distressed Actors

The established favourite and romantic Tragedy

SAROJINI

SRIMATI SUKUMARI DUTTA, AS SAROJINI.

Plenty of Songs !

PATRIOTS AND COUNTRYMEN,

Come and support us now !

NOW OR NEVER !!' [৩৬]

শেষ দৃশ্যে রামদাসকৃত কবিতাটি ও নাট্যকারের রচনা নয়, "... রামদাসের মুখে ভারতবাক্যের মতো যে কবিতাটি দেওয়া হইয়াছে তাহা লেখকের অন্তরঙ্গ বন্ধুকবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচনা বলিয়া অনুমান করি।" [৩৭]

'সরোজিনী' নাটকটিতে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করার যে রসদ রয়েছে তা তুলনাহীন শেষ পর্যন্ত অজিতবাবু বলেন, "রাজা লক্ষ্মণ সিংহের মধ্যে কন্যা স্নেহ এবং স্বদেশপ্রাণতার অতি সুন্দর দ্বন্দ্ব দেখান হইয়াছে।" [৩৮]

নাটকটিতে প্রেমের উৎকট আবহে দেশপ্রীতি কোনো সময়ের জন্য অনুপস্থিত হয়নি। বীর রসের বাড়াবাড়িতে লক্ষ্মণ বা বিজয়সিংহকে আচ্ছাদিত করেনি। বরং বিজয়সিংহ বীরত্বের সঙ্গে আক্রমণ প্রতিহিত করতে গিয়ে আত্মবলিদান করে স্বদেশপ্রেমের (বীররসের) প্রমাণ দেন। অন্যদিকে লক্ষ্মণ সিংহ করুণরসের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়, "ইহাও দেশানুরাগাত্মক, তবে এখানে প্রধান রস বীর নয়, করুণ। পুরু বিক্রমে দেশরক্ষায় যোদ্ধৃত্বের দিকটা বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে, সরোজিনীতে সংহতির ও বিচক্ষণতার উপর জোর পড়িয়াছে।" [৩৯]

সেসময় স্বদেশবাসীর চিত্তে স্বদেশানুরাগ জাগ্রত করতে নাটকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনপ্রিয়তা [৪০] তার অন্যতম প্রমাণ।

শুধু তাই নয়, নাটকটি এতই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, পুরুবিক্রম এর মতো এ নাটকটিও হিন্দিও মারাঠিতে ভাষান্তরিত হয়ে বাংলার বাইরে জনপ্রিয় হয়।

নাট্যকারের আবেগ দেশমাতৃকার প্রতি এত প্রবল ছিল যে, পরবর্তীকালে তিনি জাহাজের ব্যবসার সময়ে যে জাহাজটি নিলামে ক্রয় করেন তার নাম ও দেন 'সরোজিনী'। এই 'সরোজিনী' জাহাজকে নিয়ে দেশীয়দের উন্মাদনাও স্বদেশপ্রীতি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। 'সরোজিনী' মঞ্চ সফল বই নাটক তাই জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে আলোচনার দাবি রাখে। হিন্দু মেলা, সঞ্জীবনী সভার কর্ণধরে নাট্যকার অভিনব পদ্ধতিতে স্বদেশপ্রেম জাগিয়ে তুলতে পূর্বের মতোই সার্থকতা অর্জন করেন।

বাংলা নাটকে 'স্বদেশপ্রেম মূলক রোমান্সধর্মী' নাট্যধারার সূচনা হল তাঁর হাত ধরে। অন্যদিকে বলা যায়, 'নীলদর্পণ' এর অভিনয়ের পর বিদেশি শাসকের যে চৈতন্যোদয় হয় তা তাতে নতুনমাত্রা দিতে থাকে এই ধরণের নাটকাভিনয়। জাতীয়চেতনা উন্মেষে, স্বদেশ সম্পর্কে চিন্তা করতে শেখায় এই নাটক। তাই 'সরোজিনী' শুধু একটি নাটকের নাম না থেকে স্বদেশবাসীর কাছে একটি 'Symbol' হিসাবে ধরা দেয়। রবীন্দ্রনাথ 'সরোজিনী'-কে তাই গুরুত্ব দিয়ে 'সরোজিনী' ও কবির আত্মিক সম্পর্ককেও তুলে ধরলেন 'সরোজিনী প্রয়াণ' প্রবন্ধে। ফলে স্বদেশপ্রেমের নাটক হিসাবে আমাদের গবেষণা সন্দর্ভটিকে সার্থক করে তোলে এ নাটক – একথা সবশেষে নির্দ্বিধায় শিকার করতে হয় – নাট্য কাহিনির নানান ত্রুটি কখনও সে প্রেমকে ক্ষুন্ন করে না একথাও মনে রাখতে হয়।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ ঃ

১. অজিত কুমার ঘোষ, 'নাটকের কথা', কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৬৬

২. দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকসমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৪৩-৪৪

৩. ঐ, পৃ. ৪৯

৪. ঐ, পৃ. ৫৪-৫৫
৫. ঐ, পৃ. ৫৫
৬. সুশীল রায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ', কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ১৪৯
৭. দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকসমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৬৬
৮. সুকুমার সেনও বলেছেন, নাটকটিতে "প্রধান ভূমিকা হইতেছে লক্ষণসিংহের। একদিকে পিতৃস্নেহ অপর দিকে রাজকৃত্য এই দুই বিরুদ্ধ কর্তব্যের দোটানায় পড়িয়া রাজার দোলাচল বৃত্তির প্রকাশ ভালোই হইয়াছে।" দ্র সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (৩য়)।
৯. দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকসমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৭৬
১০. ঐ, পৃ. ১০
১১. ঐ, পৃ. ৮১
১২. ঐ, পৃ. ৮৬
১৩. ঐ, পৃ.৮৮
১৪. ঐ, পৃ. ৯০-৯১
১৫. বিনোদিনী দাসী, 'আমার কথা ও অন্যান্য রচনা', কলিকাতা, ১৪১১, পৃ. ৮৭-৮৮
১৬. সমাচার চন্দ্রিকা, ২ জৈষ্ঠ ১২৮৪, দ্র. দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকসমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ২৬
১৭. দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকসমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৪৯
১৮. ঐ, পৃ. ৯৩
১৯. সুশীল রায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ', কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ১৪৯
২০. দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকসমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৯৯-১০০
২১. ঐ, পৃ. ১০২
২২. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ঘরোয়া', কলিকাতা, পৃ. ১৩০
২৩. দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকসমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১০২
২৪. ঐ, পৃ. ১০৪
২৫. অজিত কুমার ঘোষ, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৩৭
২৬. ঐ, পৃ. ১৩৬
২৭. দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকসমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৮১

২৮. ঐ, পৃ. ৭৮
২৯. অজিত কুমার ঘোষ, ‘বাংলা নাটকের ইতিহাস’, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৩৭
৩০. বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় (স), ‘জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি’, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৪৮
৩১. বিনোদিনী দাসী, ‘আমার কথা ও অন্যান্য রচনা’, কলিকাতা, ১৪১১, পৃ. ২৮
৩২. অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ‘গিরিশচন্দ্র’, কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১২৫
৩৩. প্রশান্তকুমার পাল, ‘রবিজীবনী’ (১ম), কলিকাতা, ১৪১৪, পৃ. ২২৬
৩৪. দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায় (স), ‘জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকসমগ্র’ (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ২৫
৩৫. মন্মথ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কলিকাতা, পৃ. ৫০
৩৬. দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায় (স), ‘জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকসমগ্র’ (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ২৩
৩৭. সুকুমার সেন, ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ (৩য়), কলকাতা, ১৩৮৬, পৃ. ৩২৩
৩৮. অজিত কুমার ঘোষ, ‘বাংলা নাটকের ইতিহাস’, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৩৭
৩৯. সুকুমার সেন, ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ (৩য়), কলকাতা, ১৩৮৬, পৃ. ৩২২
৪০. সুকুমার সেন এ সম্পর্কে বলেছেন যে দেশের সর্বত্র শহর গ্রাম বা বিভিন্ন আসরে দেশকে নাটকটি মতোয়ারা করেছিল। আর কোনো বাঙালি নাট্যকার এতটা সম্মানও পাননি– শুধু এই দ্র. সুকুমার সেন, ‘বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস’ (৩য়), কলকাতা, ১৩৮৬, পৃ. ৩২৪

প্রচারে অশ্রুমতীর প্রেমকাহিনি পরিবেশনে প্রতাপসিংহের স্বদেশপ্রেম

'অশ্রুমতী' নাটকটির প্রথম প্রকাশ ১৮৭৯। ইংরেজ শক্তির প্রতি মানুষের মোহের অবসানের সময়। সাহিত্য, সংবাদপত্র, সভা সমিতিতে যখন জাতীয়তাবাদের বীজ উপ্ত হয়েছে, যখন জাতীয় চেতনা জাগ্রত করতে শিক্ষিত বাঙালি তৎপর ঠিক তখনই এ নাটকটি প্রকাশিত হয়।

অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত, মধ্যবিত্ত বাঙালিকে স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত করতে ও তৎকালীন দেশের পরাধীনতাকে তুলে ধরতে নাট্যকার পূর্ববর্তী নাটকগুলির মতো অপূর্ব কৌশল এখানে অবলম্বন করেছেন।

নাটকটিতে রোমান্টিকতার মোড়কে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করার ঐকান্তিক প্রয়াস আছে। ইতিহাস থেকে কাহিনি নিয়ে কল্পিত চরিত্রের দ্বারা অনবদ্য সাহিত্য সংরূপ নির্মাণ করেছেন নাট্যকার।

ইতিহাসের রাজস্থানের কাহিনিই যে এ নাটকের প্রধান অবলম্বন নাট্যকার কৃত একটি উদ্ধৃত তা থেকেই বোঝা যায় –

"There is not a pass in the alpine Aravalli that is not sanctified by some deed of Pertap, – some brilliant victory or oftener, more glorious defeat. Huldighat is the Thermopyla of Mewar ; the field of Deweir her Marathan." Tod's Rajasthan." [১]

নাটকটি যে স্বদেশ চেতনারাই নাটক নাট্যকার তা স্পষ্টত স্বীকার করেন, "..... মহারাণা প্রতাপ সিংহকে আমি আরাধ্য দেবতায় ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। তাঁহার বীরত্ব তাঁহার মহত্ত্ব, তাঁহার সহিষ্ণুতা, তাঁহার কুলনিষ্ঠা, তাঁহার দেশভক্তি আমাদের আদর্শ স্থল। চরিত্রের এই উচ্চ আদর্শ বঙ্গবাসীর সম্মুখে অর্পণ করাই এই নাটক রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য।" [২]

অর্থাৎ স্বদেশচেতনা জাগ্রত করতে নাট্যকার চিতোর রাজ প্রতাপসিংহকে অবলম্বন করেছেন। সুতরাং প্রতাপসিংহই এ নাটকের স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করার মূল পীঠস্থান। তবে সাধারণ দর্শক ও রঙ্গমঞ্চে বেশি সংখ্যক দর্শককে স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্যই প্রতাপসিংহের পাশাপাশি একটি রোমান্টিক কাহিনিকে টেনে নিয়ে গেছেন। বিশ্লেষণ করে দেখব অশ্রু-সেলিম, মলিনা-পৃথ্বীরাজের প্রণয় ব্যাখ্যার বাড়াবাড়িতে স্বদেশপ্রেমের সুর কখনও চাপা পড়েনি। এককথায় নাটকটি স্বদেশমাতৃকার গৌরবে পূর্ণ।

পাঁচটি অঙ্কে নাটকের বিন্যাস। প্রথম অঙ্কে সাতটি, দ্বিতীয় অঙ্কে দুটি, তৃতীয় অঙ্কে সাতটি, চতুর্থ অঙ্কে সতেরোটি এবং পঞ্চম অঙ্কে দুটি গর্ভাঙ্কে তা বিন্যস্ত। এককথায় পাঁচটি অঙ্কে পঁয়ত্রিশটি গর্ভাঙ্কে নাট্যকাহিনির বিস্তার।

যবনরাজ সম্রাট আকবর ব্রিটিশ শক্তির প্রতিভূ। চিতোর ভারতবর্ষের এবং চিতোর রাজও অন্যান্য রাজণ্যবর্গ এ দেশের সংগ্রামী বীরের প্রতিনিধি। চিতোরকে বিদেশিদের হাত থেকে রক্ষা করার মধ্য দিয়ে যে নিষ্ঠা, ধৈর্য, কর্তব্যকে তুলে ধরা হয়েছে তার মধ্যেই নিহিত দেশপ্রেম।

পাশাপাশি কল্পিত চরিত্র অশ্রুমতী, চিতোরাজ প্রতাপের কন্যা। রাজপুত কন্যাকে যবনদের অপহরণ সেই সূত্রে প্রতাপের বীরত্ব ও স্বদেশের প্রতি কর্তব্যকে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দেশীয় রাজন্যবর্গের আত্মস্বার্থপরতা কীভাবে বিদেশিদের ইন্ধন যুগিয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে জয়পুরের রাজা মানসিংহের মধ্যে। স্বদেশকে অন্যের হাতে সমর্পণ করে সেনাপতির আসন দখল করেছে। দেশীয় রাজার বীরত্বকে লুন্ঠন করতে বিদেশিদের ক্রমাগত সাহায্য করেছে। এর মধ্যেও আছে দেশীয় রাজাদের গৃহবিবাহ। শক্তসিংহ পরদেশিদের পক্ষ নিয়েও পরে দেশমাতৃকার উদ্ধারের কল্পে সরে আসে। সর্বোপরী প্রতাপ চরিত্রটিই স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। প্রতাপের স্বদেশপ্রেম শুধুমাত্র চিতোরকে বিদেশির হাত থেকে বাঁচানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। ভারতীয়দের কর্তব্য বোধ, স্বদেশের মহত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, অন্যায় এর কাছে মাথা নত না করার মধ্যে স্বদেশপ্রেম ব্যাপ্তিলাভ করেছে।

'পুরু বিক্রমের' মতো স্বদেশকে ভালোবাসতে গিয়ে, স্বদেশের গৌরবকে অক্ষুন্ন রাখতে প্রতাপ আপন কন্যার শোচনীয় পরিনামকেও মেনে নিয়েছেন। তাঁর এই দৃঢ়তা দর্শককে স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করেছে। নাটকটি বিশ্লেষণ করলেও তা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। দেশীয় শক্তি প্রতাপ বিদেশি শক্তি সম্রাট আকবর আর এ দুটি শক্তির মাত্রাকে পরিমাপ করেছে অশ্রু ও সেলিমের প্রেম।

প্রথম অঙ্কের সাতটি গর্ভাঙ্ক নিহিত। চতুর্থ অঙ্কে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের কারণ ও শক্তসিংহের দেশদ্রোহীর কারণ ব্যক্ত হয়েছে। পঞ্চম অঙ্কে প্রতাপসিংহ ও মহিষীর আলাপচারিতার মধ্যে উঠে আসে রাণা প্রতাপের সংগ্রামী মানসিকতা। বাকি পাঁচটি অঙ্কে প্রতাপের স্বদেশপ্রেমের স্ফুরণ। একথায় প্রথম অঙ্কটি প্রতাপের দেশভক্তির বাতাবরণ। সর্বোপরি নাটকের সমস্যার অবতারনা।

অম্বরের রাজা মানসিংহ মোগলদাসত্ব স্বীকার করে সোলাপুর জয় করে ফেরার পথে রাণা প্রতাপের আতিথ্য গ্রহণ করেন। প্রতাপ রাজাসুলভ আতিথেয়তার আয়োজন করেন কিন্তু দেশদ্রোহী মানসিংহের সামনে উপস্থিত থাকতে পারবে না। কারণ আপন স্বার্থ সিদ্ধি করতে যে মানসিংহ নিজের ভগ্নিকে বিদেশি শত্রুর হাতে সমর্পণ করতে পারে সে নরাধম। স্বদেশপ্রেমে মূর্ত প্রতাপ এহেন চরিত্রকে ঘৃণারচ্ছলে বলেন –

"প্রতাপ। ... যে ক্ষত্রিয়াধম মুসলমানের হস্তে আপনার ভগিনীকে সম্প্রদান করেছে, তার পরিবেশনে সূর্যবংশীর মেবারের রাণা উপস্থিত থাকবে?"[৩]

(প্রথম অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

আতিথ্যে ভারতীয়রা সে কত মহৎ তা রাজা প্রতাপ চরিত্রে ফুটে ওঠে। স্বদেশের গৌরব যাতে কোনোভাবে খাটো না হয় তার জন্য সাধ্যমত ব্যবস্থা করবেন। আতিথ্যধর্মের কারণেই, মানসিংহের যত্ন করলেন। না হলে –

'নচেৎ যে নরাধম পিতৃভূমি পরিত্যাগ করে মুসলমানের সঙ্গে কুটুম্বিতা করেছে, তার আমি মুখদর্শন করতেম না।' অর্থাৎ এ অহংকার রাজ ঐশ্বর্যের নয়, দেশমাতৃকার আদর্শের অহংকার। দেশপ্রাণ রাজা প্রতাপ একদিকে রাজধর্ম পালনে শত্রু হলেও যত্ন করতে জানেন অন্যদিকে তার নীচতাকে ঘৃণা ও করেন। এরপরই নাটকে নাট্যদ্বন্দ্বের বীজ বপিত হয়। মানসিংহ যে এ দেশীয় একজন রাজা, যার কর্তব্য বিদেশি আক্রমণ থেকে স্বদেশকে সুরক্ষিত রাখা। স্বদেশবাসীকে নিরাপত্তাও শান্তি দেওয়া সেই রাজা শুধু স্বীয় সার্থে বিদেশিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। নির্লজ্জের মতো বিদেশিদের গুণগান করেন। তা আবার এই স্তুতি করেন স্বদেশ প্রেমে উজ্জীবিত প্রতাপের রাজবাড়িতে। প্রতাপ এহেন বাক্য শুনে একজন বীরের স্বভাবধর্মের মতোই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। বিদেশিদের প্রতি তিনি যতখানি রুষ্ট ততধিক রুষ্ট হয়ে ওঠেন একজন দেশীয় রাজার মুখে শত্রুর বীরত্বের এমন স্তুতি শুনে। প্রতাপের অহংকারে যে কী পরিমাণ আঘাত করে তা বোঝা যায়, নিজেকে সংযত করতে না পেরে একাধিক বার এই একই বাক্য উচ্চারণ করার মধ্য দিয়ে। মোট তিনবার ঐ কথা তিনি উচ্চারণ করেন। যেন এই বাক্য তার শরীরে শেল হানে। তাই দু'বার নেপথ্যে থেকে একবার সামনাসামনি বলে ফেলেন। নেপথ্যে প্রতাপের এই কটাক্ষ শুনে মানসিংহের বিবেক কথা বলে কিন্তু তা শুধু কথামাত্র। লোকাচার বলে নিজেকে, নিজের অপরাধী মনকে স্বান্তনা দেন। একসময় প্রতাপ ধৈর্য হারিয়ে হঠাৎ মানসিংহের সামনে চলে আসেন। ভৎর্সনা করেন, মানসিংহকে।

দেশের শত্রুর প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে মানসিংহ অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেন, বিপদের মধ্যে বসে থাকার থেকে দাসত্ব নেওয়া শ্রেয়। প্রতাপ দেশদ্রোহীর এমন বাক্যে আরও দৃঢ়ভাবে বিদেশি শক্তির কাছে নিজের অবস্থান কে প্রতিষ্ঠান করেন—

"প্রতাপ। ... যে বোধ হয় এমন-কি তুর্কের সহিত একত্র ভোজন করেছে, তাঁর সহিত সূর্যবংশীয় রাণা একত্র কখনোই আহার স্থানে উপবেশন করতে পারে না।... দেখুন মহারাজ মানসিংহ, আমি বরঞ্চ পর্বতে পর্বতে, বনে বনে, অনাহারে ভ্রমণ করে বেড়াব, সকলপ্রকার বিপদকে অসংকোচন আলিঙ্গ ন করব, অদৃষ্টের সকল অত্যাচারই অনায়াসে অক্লেশে সহ্য করব, তথাপি তুর্কের দাসত্ব কখনোই স্বীকার করব না।"[৪]

(প্রথম অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

প্রতাপসিংহের দেশমাতৃকার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা আপন পৌরুষের প্রতি অবিচল বিশ্বাস বিশ্বাসঘাতক মানসিংহকে ঈর্ষান্বিত করে। পরদেশ আক্রমণকারী, লুন্ঠনকারী মোগল সম্রাটের দাসত্ব বৃত্তি করে মানসিংহ গর্ব অনুভব করে। শুধু তাই-ই নয় বীরত্বে দীপ্ত, স্বদেশপ্রাণ প্রতাপের ভারতীয়ত্বের অহংকারকে চূর্ণ করার জন্য 'চ্যালেঞ্জ' জানান, 'তোমার যদি অহংকার চূর্ণ করতে না পারি তো আমার নাম মানসিংহ নয়—'

প্রতাপ বীররসে সিক্ত, মহাবীর তিনি, তাই দাসব্রতে রত নপুংসক মানসিংহ রামচন্দ্রের পবিত্র রক্তধারী প্রতাপের অংহকারকে চূর্ণ করতে পারবে না। এই উক্তি প্রত্যুক্তিতে নাট্যকাহিনির দ্বন্দ্ব সূচিত হল। এই সমস্যায় নাটককে গতিদান করেছে। একদিকে প্রতাপসিংহের চিতোরের প্রতি মমত্ব ও বিদেশি শক্তির হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা অন্যদিকে মানসিংহের বিশ্বাসঘাতকতা নাটকটিকে স্বদেশ চেতনায় নাটকরূপে সূচিত করেছে।

শুধু তাই-ই নয়, যবনদের প্রতি প্রতাপের ঘৃণা কোনো ব্যক্তিগত কারণে নয়, তাদের স্বভাব ধর্ম, তাদের লুন্ঠনকারী মানসিকতার প্রতি ঘৃণা। সেই ঘৃণা এমন উচ্চগ্রামে অবস্থান করে যে মানসিংহ চলে যাওয়ার পর প্রতাপের উক্তি ঘৃণ্য মানসিংহ সম্পর্কে, 'দেখো এই স্থান কলঙ্কিত হয়েছে – গঙ্গাজলের ছড়া দাও' নাট্যাভিনয়কালে মানসিংহের প্রতিটি কথা দর্শককে জ্বালা ধরায়। প্রতাপের বীরত্ব দর্শককে উজ্জীবিত করে, দর্শকমনে স্বদেশ সম্পর্কে, পদলেহী দেশীয় রাজন্যবর্গ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে ওঠে। স্বদেশপ্রেমের নাটক হিসাবে নাটকটি গুরুত্ব লাভ করে।

প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রতাপের স্বদেশের প্রতি অনুরাগের প্রবল প্রকাশ দেখি। দেশ মাতৃকাকে শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্য শপথ গ্রহণ করেন। রাজত্ব উদ্ধার করে রাজ ঐশ্বর্য ভোগ করার অপেক্ষা ভূ-লুন্ঠিত মেবারের স্বাধীনতা আনা অনেক বড়ো হয়ে ওঠে। স্বদেশের জন্য আত্ম বলিদান দেওয়ার এই শপথ আজও ভারতবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। ইতিহাসের তথ্য-সত্যকে নাট্যকার এমনভাবে এখানে প্রতিষ্ঠা করেন যে দর্শকমনে নিজ দেশ সম্পর্কে, দেশের সম্মান সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠে। ব্রিটিশ কবল থেকে একইভাবে পরাধীন ভারতবর্ষকে মুক্ত করার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে।

জন্মভূমি চিতোরের দুর্দশায় ব্যথিত রাজা বজ্রঘোষণ সুরে প্রতিজ্ঞা বন্ধ হয় –

"প্রতাপ। তিনিই চিতোরের বিজয়লক্ষ্মীকে তুর্কের হস্তে বিসর্জন দিয়েছেন – হা! সে চিতোর এখন বিধবা– স্বাধীনতার জন্মভূমি– বীরের জননী– সেই চিতোর এখন বিধবা! (উত্থান করিয়া ও কোষ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া) রাজপুতগণ, তরবাল হস্তে এসো আমরা সকলে শপথ করি– যতদিন না চিতোরের অস্তমান গৌরবকে পুনরুদ্ধার করতে পারি– ততদিন আমরা ও আমাদের উত্তরাধিকারিগণ একটিও বিলাস-সমগ্রী ব্যবহার করব না– রজত ও কাঞ্চন পাত্র-সকল দূরে নিক্ষেপ করে তার পরিবর্তে বৃক্ষপত্র ব্যবহার করব– আমদের শ্মশ্রুতে আর ক্ষুরস্পর্শ করব না– আর শুষ্ক তৃণশয্যায় আমরা শয়ন করব।"[৫]

(প্রথম অঙ্ক/দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

এ প্রসঙ্গে রাজপুতদের কথাও প্রাণিধানযোগ্য। যে দেশের রাজা স্বদেশের মর্যাদা সম্পর্কে এত সচেতন, রপাজপুতগণও তথৈবচ। তাই মন্ত্রীরাও রাজাকে শক্তি যোগায়, 'শপথ করে বলে, তার অন্যথা হবে না।' দেশের অন্যান্য প্রান্তের রাজারা যখন কন্যা, ভগিনী বিক্রয় করে তুর্কির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন, দেশের শক্তি যখন খণ্ড-বিখণ্ড তখন এই রাণা প্রতাপ মুষ্ঠি পরিমান রাজপুত

সৈন্য নিয়ে দেশের মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে ব্রতী হয়েছেন। চিতোরের প্রজাদেরও এই মহানকর্মে সম্মিলিত হতে পর্বত প্রদেশে বসবাস করার আদেশ দেন।

তুর্কিকে স্বাধীনভাবে অত্যাচারের সুযোগ করে দিতেই রাণার এ ঘোষণা। প্রাণ ধর্মে উজ্জ্বল চিতোর তাদের স্পর্শে শ্মশানে পরিণত হোক। শেষ শক্তি দিয়ে চিতোর উদ্ধার করে তবেই চিতোরের প্রাণ স্পন্দন ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকার করেন।

তৃতীয় দৃশ্যে দিল্লির কদর্য চিত্র দেখানো হয়েছে। তুর্কি রাজের জঘন্য, উলঙ্গ রাজনীতি, দেশীয় রাজার বিশ্বাসঘাতকতা এখানে প্রকট। মানসিংহ স্বদেশকে উদ্ধার করার পরিবর্তে আক্রমণকারীর স্তুতিধ্বনি করে সন্তুষ্টি লাভ করে। 'সাহেনশার শ্রীচরণ প্রসাদে যুদ্ধে জয় লাভ হয়েছে' উচ্চারণে স্বদেশি দর্শকের মনে মানসিংহ সম্পর্কে ক্রোধ জেগে ওঠা স্বাভাবিক। মানসিংহ তার অপমানের কথা বললে সম্রাট মানসিংহকে উত্তেজিত করে 'সৈন্য সামন্ত সজ্জিত করে সেই গর্বিত বর্বরকে সমুচিত শিক্ষা' দিতে নির্দেশ দেয় আকবর।

একজন ভারতবাসীর সম্মুখে আরেকজন ভারতবাসী সম্পর্কে মানসিংহের কপটতা যে কী লজ্জার তা সাধারণ মানুষও বোঝে। আকবর মানসিংহের অপমানের প্রতিশোধের কথা বললেও আসলে তা যে তার নিজের অভিসন্ধি সিদ্ধির উপায় তাও দর্শক বুঝতে পারে। মারোয়ারের দেশদ্রোহী রাজা উদয়সিংহ প্রতাপের কূল, শীল ও ঐশ্বর্য -এর সঙ্গে 'আমাদের' শব্দ প্রয়োগে নিজেকে একাত্ম করে ফেলে। তার নিজের কূল, শীল ঐশ্বর্য সম্পর্কে বিন্দুবৎ ধারণা থাকলে প্রতাপের যথার্থ বন্ধু হতে পারতেন। তাই তাই এই কথাও দর্শকমনে জ্বালা ধরায়। আকবর তার রাজনৈতিক অভিসন্ধিতে তুলে ধরে –

"আকবর। (স্বগত) রাজপুতদিগের সঙ্গে কুটুম্বিতা করে আমাদের সিংহাসন অটল করব মনে করেছিলেম – আমার সে রাজনৈতিক অভিসন্ধি অনেক পরিমাণে সিদ্ধও হয়েছে – কিন্তু প্রতাপসিংহ দেখছি সেই-সব পুরাতন হিন্দু কুসংস্কার আবার উদ্দীপন করে দিচ্ছেন, আবার সেই চিরন্তন জাতিবৈরিতা উত্তেজিত করে দিচ্ছেন। তাঁকে দমন না করলে আমার এই রাজনৈতিক অভিসন্ধি একেবারে বিফল হবে। (প্রকাশ্যে) চলো চলো, আমি সৈন্যদের স্বয়ং পরিদর্শন করব।" ৬

(প্রথম অঙ্ক/তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)

কপট, পররাজ্যলোলুপ আকবর আসলে নিজস্বার্থ রক্ষা করতে প্রতিটি পা ফেলে, তেমনি তথাকথিত ব্রিটিশি শক্তিও যে এমনভাবেই ভারতবাসীদের কাজে লাগায় এই বার্তায় নাট্যকার পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। অর্থাৎ নাট্যকার এখানে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করার দুটি কৌশল নিয়েছেন –

১. প্রতাপসিংহের স্বদেশের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন।
২. সম্রাটের হীন কর্ম দ্বারা দেশীয় রাজাদের প্ররোচনা প্রদর্শন।

পাশাপাশি দু'জন চিতোরবাসী গ্রাম্য ভদ্রলোকের কথোপকথনে প্রতাপের বীরত্বও স্থানকে সূচিত করেছে। প্রতাপ ভ্রাতা শক্তসিংহের প্রতি প্রতাপের ভুলের কথাকে তুলে ধরেছে। তাই-ই নয় প্রতাপ যে এখনও স্বদেশকে বঁচানোর সংকল্প অটল তার জন্য গর্ববোধ করেছে। পরাধীনতার চেয়ে বড়ো গ্লানি বিশ্বে আর দ্বিতীয় নাই এই গ্রাম্যলোকরাও বোঝে। তাই ঘোর বিপদের দিনে প্রতাপের মতো বীরের পাশে শক্তসিংহের বীরত্বকে প্রয়াজন বলে মনে করে।

দেশোদ্ধারের জন্য প্রতাপের আদেশকে গ্রাম্য প্রজারা শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করতে উদ্যত, তিনি যেখানে যেতে বলবেন তারা সেইখানেই যাবে কারণ 'তিনি আমাদের পিতৃতুল্য পূজনীয়।'

প্রতাপের অটল এই মানসিকতাকে বোঝাতে উদয় সিংহের সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সন্দিহান হয়েছে, আজ মেবারের এই বিপদের দিনে শক্তসিংহের বীরত্ব যদি দেশের কাছে নিয়োজিত হত তবে তা যথার্থ হোতো। তাই আকবর আশ্রয় প্রার্থী শক্তসিংহকে বিভীষণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। বিস্ময় প্রকাশ করে 'এই সাহসিকতা – এই বীরত্ব অবশেষে কিনা স্বদেশের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হল।'

স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করতে সাধারণ প্রজার রাজার প্রতি এই শ্রদ্ধা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দেশমাতাকে পরাধীনতার হাত থেকে বাঁচতে রাজা প্রতাপের এই ক্লীচ্ছ সাধন প্রজাদেরকেও স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত করেছে। অপর দিকে সামান্য কারণ শক্তসিংহের সিদ্ধান্তকে কটাক্ষও করেছে। তাদের এই কথার সঙ্গে সাধারণ দর্শক একাত্ম হয়ে দেশভাবনায় উজ্জীবিত হয়েছে।

প্রথম অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে প্রতাপসিংহের সীমাহীন কষ্টের জীবন যাপনকে দেখানো হয়েছে। দেশের স্বাধীনতার ব্রতের কাছে তার এই জীবনযাপন যে কতটা তুচ্ছ তাও দেখানো হয়েছে। মহিষী তাঁকে এ সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার পরামর্শ দেন। কিন্তু চিতোরের স্বাধীনতা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিতোরের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী চিতোর পরিত্যাগ করেছে। যে স্বাধীনতা দেশের সৌভাগ্যের প্রাণ সেই স্বাধীনতা হারিয়ে প্রতাপ আজ নিঃস্ব, –

"প্রতাপ। কি বললে মহিষি! সৌভাগ্যলক্ষ্মী! সৌভাগ্যলক্ষ্মী কি আর আছে? সৌভাগ্যলক্ষ্মী অনেক দিন যে চিতোর পরিত্যাগ করেছেন তা কি তুমি জান না? হা। যে অশুভ দিনে চিতোর মুসলমানের হস্তগত হয়েছে, সেই অবধি লক্ষ্মী আমাদের পরিত্যাগ করেছেন। আর এখন আমাদের কি আছে? চিতোরের যখন স্বাধীনতা গেছে তখন সকলই গেছে –(উঠিয়া) যে চিতোর পুজনীয় বাপ্পা রাওর স্থাপিত –যে চিতোর আমার পূর্বপুরুষের বাসস্থান – যে চিতোর স্বাধীনতার লীলাস্থল –সে চিতোর যখন গেছে তখন আর আমাদের কি আছে? মহিষি, তোমরা স্ত্রীলোক, তোমরা বস্ত্র, অলংকার ধন ধান্যকেই লক্ষ্মী বলে জ্ঞান কর–কিন্তু তোমরা জান না স্বাধীনতাই সৌভাগ্যের প্রাণ– স্বাধীনতাই–"[৭]

(প্রথম অঙ্ক/পঞ্চম গর্ভাঙ্ক)

প্রতাপ শয়নে স্বপনে চিতোরের চিন্তায় অর্থাৎ স্বদেশের চিন্তায় মগ্ন। অথচ সেই স্বদেশ পরদেশীদের কলঙ্কিত হাতে কলুষিত তখন প্রতাপ অস্থির হয়ে ওঠে, যখন দেশীয় রাজারা সেই পরদেশীদের সাহায্য করে, নিজের আপন জনেরা তাদের সঙ্গে হাত মেলায় প্রতাপ তখন বিশ্ব সহীনতায় ভোগে। কিন্তু একাই শেষ শক্তি দিয়ে সেই বিদেশী শক্তিকে প্রতিহত করতে চায়। শক্ত সিংহ ও যদি শত্রু শিবিরে যোগ দেয় তথাপি 'তবু প্রতাপসিংহ এই কমলমেরু গিরির ন্যায় অটল থাকবে।' বলে নিজের অবস্থান সন্ধি করেন।

এমন সময় মুসলমান সৈন্যরা চিতোরের দিকে এগিয়ে এলে প্রতাপ ও সকলকে প্রস্তুত করে, প্রতাপের যে লড়াই তা শুধু বিদেশি সৈন্যের বিরুদ্ধে নয়। তাঁর লড়াই –

১. তুর্কি সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে।

২. দেশীয় রাজা উদয় ও মানসিংহের বিরুদ্ধে।

৩. নিজের আত্মমর্যাদার সঙ্গে।

৪. নিজ ভ্রাতার বিরুদ্ধে।

এখানে দেশই, প্রতাপের ধ্যান, জ্ঞান চিন্তা। দেশের মর্যাদা তাঁর মর্যাদা দেশের ঐতিহ্য তার ঐতিহ্য। এ হেন স্বদেশপ্রেমী চরিত্র যে স্বদেশবাসীকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করবে তাতে সন্দেহ কী। নাট্যকার এখানে সফল। সুশীল রায় তাই বলেন, নাট্যকারের "মনের গঠন যদি জাতীয়তা বোধ দ্বারা প্রস্তুত না হয় তাহলে সহসা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বদেশের প্রতি মমতা অমন অন্তরঙ্গভাবে ব্যক্ত হতে পারে না। এই মন যে ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান তার বনিয়াদ হল স্বদেশী।" [৮] প্রতাপ তারই প্রকাশ।

অপর দিকে কদর্য, জঘন্য মানসিংহ আপন দেশের রাজকন্যাকে বিদেশিদের হাতে সমর্পণ করার জন্য উদগ্রীব হয়। কারণ প্রতাপের সত্য ভাষণ, 'যে রাজপুত আপনার ভগিনীকে তুর্কের হস্তে সমর্পণ করেছে' তার এই কথা মানসিংহের অহংকারে ঘা দেয়, প্রতিশোধ নিতে প্রতাপের উন্নত মাথাকে অবনত করতে চাই।

অন্তঃদেশীয় রাজন্যবর্গের এই চোরাপথে বিদেশিরা তাদের স্বার্থ কায়েম করেছে। অপ্রয়োজনে সেই সাহায্যকারী রাজন্যবর্গকে দূরে নিক্ষেপ করেছে। মানসিংহ এতই কাপুরুষ বিদেশি তুর্কি শক্তিতে শক্তিমান হয়ে মাতৃভূমির শৃঙ্খল বন্ধনে সাহায্য করেছে। যবন ফরিদকে প্রলোভন দেখিয়েছে আরাবল্লী পর্বতস্থিত প্রতাপ কন্যা অশ্রুমতীকে অপহরণ করতে পারলে অশ্রুমতীর সঙ্গে তার বিবাহ দেওয়া হবে বলে। ক্ষুদ্র স্বার্থে আঘাত লাগা মানসিংহ প্রতিশোধের ইচ্ছায় দেশের গর্ব যে প্রতাপ তাকে অপমানিত করতে, শক্তিহীন করতে বদ্ধ পরিকর হয়।

বিকানিয়রের রাজকুমার পৃথ্বীরাজ কিন্তু প্রতাপের মূল্য বোঝে। তাই প্রতাপ সম্পর্কে স্তুতি করতে করতে আত্মগৌরবে পূর্ণ হয়ে ওঠে সে। তাই বীরভ্রাতা শক্তসিংহকে পরামর্শ দেয় সাহায্য করতে, 'তাঁর সঙ্গে কোনো কালে তোমার একটু মনান্তর হয়েছিল বলে তুমি কি চিরকাল তা মনে

করে রাখবে ?... এই সময় গিয়ে তোমার ভ্রাতাকে সাহায্য করো।' আসলে অভিমানী শক্তসিংহের মন চায় না স্বদেশের বিরুদ্ধে অসি ধরতে। সামান্য অপরাধে তাকে দেশদ্রোহী বলায় দেশভক্ত শক্তসিংহ আঘাত পায়।

মেবারের এই ভয়ংকর মুহূর্তে এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব ভারতবাসীর ঐক্যের দৈনতা ও বিদেশিদের সুযোগগুলিকে সূচিত করে। দর্শক দর্শকাসনে এই ন্যায়-অন্যায়কে ধরতে পারে। শিক্ষালাভ করে দেশের এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ছোটাখাটো হিংসা-বিবাদ ভুলে দেশের স্বার্থে ঐক্যবন্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা। ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবনা চিন্তা থেকে দর্শক বেরিয়ে এসে সমষ্টির কথা ভাবতে শেখে।

নাটকীয় পট পরিবর্তনে প্রথম অঙ্কের সপ্তম গর্ভাঙ্কটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যুদ্ধ সমাগত। মেবার সৈন্যরা মাতৃভূমির সম্মান রক্ষায় সচেষ্ট, 'আজ আমরা যুদ্ধে প্রাণ দেবে – চিতোরের গৌরব রক্ষা করব – মুসলমান রক্তে আমাদের অসির জ্বলন্ত পিপাসা শান্তি করব –' প্রতাপ বীর বিক্রমে মানসিংহকে হত্যার জন্য প্রস্তুত। ঝালাধিপতি জানে, প্রতাপের সীমিত শক্তির ঠিকানা। তাই যবনদের বিপুল সৈন্যের সামনে প্রতাপসিংহ নিহত হলে মেবারের স্বাধীনতার আশা চিরোতরে বিলুপ্ত হবে। তাই প্রতাপকে বাঁচাবার জন্য প্রতাপের ছত্র ঝালাধিপতি নিজে ধারণ করলেন। ভ্রমে পতিত হয়ে মানসিংহ প্রতাপ মনে করে ঝালাপতিকে হত্যা করলো। প্রতাপকে সরিয়ে দিলেন ঝালাপতি। দেশোদ্ধারের জন্য রাজন্যবর্গের এমন আত্মত্যাগ স্বদেশবাসীকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। বীররাজাকে বাঁচাতে আরেক জন রাজা সহজে মৃত্যুকে আহ্বান করতে পারার মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা নেই আছে পবিত্র মাতৃপ্রেম।

পৃথ্বীরাজ প্রতাপের বীরত্বের কথা তুলে, তার নিঃসঙ্গতা তুলে শক্তসিংহকে পরামর্শ দেয় যাতে সে তার দাদাকে সাহায্য করে –

"পৃথ্বীরাজ। রাজপুতেরা পরাজিত বটে কিন্তু এমন বীরত্ব কেউ কখনো দেখে নি। বিশ হাজার রাজপুত পঞ্চাশ হাজার বিপক্ষ সৈন্যের সহিত কতক্ষণ যুদ্ধ করতে পারে বল – এই বিশ হাজারের মধ্যে আট হাজার রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে – আর প্রতাপসিংহের কি বীরত্ব ! তিনি মানসিংহকে খুঁজে না পেয়ে তলবারের দ্বারা পথ পরিষ্কার করে যেখানে সেলিম নেতৃত্ব কচ্ছিলেন, অশ্বপৃষ্ঠে সেইখানে উপস্থিত হলেন – সেলিমের রক্ষকগণকে স্বহস্তে নিহত করে সেলিমের উপর বর্শা চালনা কল্লেন – কিন্তু সেলিমের হাওদা লোহার পাতে সুরক্ষিত ছিল বলে সে যাত্রা তিনি রক্ষা পেলেন, নাহলে আকবরের উত্তরাধিকারীর আর একটু হলেই মক্কাপ্রাপ্তি হচ্ছিল। সেলিমের উপর লক্ষ্য ব্যর্থ হলে, তিনি হাতির মাথার উপর নিজ ঘোড়ার পা চালিয়ে মাহূতকে নিহত করলেন – মাহূত নিহত হলে হাতি নিরঙ্কুশ হয়ে সেলিমকে নিয়ে যে কোথায় পালাল তার ঠিক নেই। ... তাঁর এ অসহায় অবস্থাতে তুমি প্রতিশোধ নিও না, নিও না। এমন অ-বীরোচিত কাজ কোরো না। তাতে তোমার কোনো পৌরুষ নাই।

শক্তসিংহ। না পৃথ্বীরাজ, প্রতিশোধ অনিবার্য!

(সৈনিকদ্বয়ের সঙ্গে শক্তসিংহের প্রস্থান)

পৃথ্বীরাজ। শক্তসিংহ, একটু দাঁড়াও– আমার কথা শোনো। যদি তুমি ওরূপ গর্হিত কার্য কর দেশবিদেশে, রাজস্থানের প্রতি পল্লীতে পল্লীতে ভাটেরা তোমার কলঙ্ক ঘোষণা করবে। তোমার এই ভ্রাতৃদ্রোহ, তোমার এই কাপুরুষতা, আমার কবিতায় – আমার জ্বলন্ত কবিতায় দেখো আমি নিশ্চয় তা হলে– ”[৯]

(প্রথম অঙ্ক/সপ্তম গর্ভাঙ্ক)

মুমূর্ষু দাদাকে যবন সৈন্যের হাত থেকে রক্ষা করে শক্ত সিংহ। আপন ভুলের প্রায়শ্চিত্য করে সে দাদার বীরত্বে উজ্জীবিত হয়ে বলে, 'ঘাতক হয়ে বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্য করি।' দুই ভ্রাতার মিলন হয়। আসলে দেশোদ্ধারের জন্য দেশের দুই মহান শক্তি একক রূপ পায়।

প্রতাপসিংহ দেশের উদ্ধার কল্পে যেমন একনিষ্ঠ, দেশের ঐতিহ্য রক্ষার জন্য, উন্নত মস্তকে মৃত্যু বরণে তেমনই প্রস্তুত। ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের অবসানের মূলেও ভ্রাতৃদ্বয়ের স্বদেশপ্রেম নিহিত। এককথায় বিদেশি শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ না করে বীরত্বের সঙ্গে মাতৃভূমির সম্মান রক্ষায় ক্ষত্রিয় ধর্ম।

ব্যক্তিগত সমস্ত, সুখের – বিলাসের চাওয়া পাওয়া থেকে সরে এসে প্রতাপ নিজেকে একজন রক্ত মাংস দেশের কল্যাণকামী একজন যুগপুরুষ রূপে প্রতিষ্ঠা করেছে। একজন 'মডেল' চরিত্র রূপে প্রতিভাত হয়েছে। নাট্যকারের এই চরিত্রটির প্রতি শ্রদ্ধার কথা বলেছেন, তার তার কর্মবৃত্তির মধ্যে সার্থকভাবে প্রমাণ করেছেন।

অন্যদিকে মানসিংহের চরিত্র চিত্রনে বিপরীত দিক থেকে স্বদেশচেতনার জাগরণ দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ স্বদেশচেতনা জাগ্রত করার জন্য দু'টি কৌশল এখানে অঙ্কিত হয়েছে –

১. প্রতাপসিংহের উক্তি, কর্মবৃত্তি দ্বারা দর্শককে প্রাণিত করে স্বদেশ চেতনার উন্মেষ।
২. মানসিংহের আচরণ, মানসিকতা, বিদেশিদের পদলেহন জনিত ঘৃণা থেকে স্বদেশের প্রতি অনুরাগের উন্মেষ।

প্রথম অঙ্ক প্রতাপসিংহের বীরত্ব, দেশপ্রেমের বিবরণে ও কর্মবৃত্তিতে সমাপ্ত হয়। দ্বিতীয় অঙ্কটিতে এই স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে রোমান্টিক প্রণয়ের যোগ সাধন করা হয়েছে। ইতিপূর্বে মহিষীর মুখে কন্যার বিবাহ প্রসঙ্গে অশ্রুমতীর নাম এসেছে। সেই অশ্রুমতীর সম্পূর্ণ পরিচয় ও যবনদের সঙ্গে প্রতাপ আত্মজের মিলন দেখানো হয়েছে। নাট্যকার কল্পিত এই চরিত্রটিকে ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে একাত্ম করেছেন। অশ্রুমতীর কোনো পরিচয় ইতিহাস স্বীকৃত নয়। নাট্যকার বলেছেন, '... আমি স্বীকার করি, 'অশ্রুমতী' বলিয়া প্রতাপ সিংহের কোন কন্যা ছিল না। ইহা আমার কল্পনা মাত্র।' এই অশ্রুমতী নামকরণেও প্রতাপের স্বদেশানুরাগ নিহিত। –

"প্রতাপ। ওর নাম অশ্রুমতী – চিতোর যে দিন মুসলমানের হস্তগত হয়, সেই দুর্দিনে ওর জন্ম —তাই ওর নাম অশ্রুমতী রেখেছিলেম। ও! প্রায় চোদ্দো বৎসর হয়ে গেল।" ১১

(দ্বিতীয় অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

অন্যদিকে মানসিংহের প্রতিশোধস্পৃহার কারণে অশ্রুমতীকে হরণ ও মুসলমান পাত্রে বিবাহ ঘটানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে অর্থাৎ এই অঙ্কে প্রণয় আখ্যানের বীজ রোপিত হয়েছে।

আরাবল্লী পর্বতের গুহাতে প্রতাপ ও মহিষী দুঃসহ জীবন-যাপনে ব্রতী। প্রতাপসিংহ স্বদেশকে বিদেশিদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে গিয়ে যে জীবনযাপনে সামিল তাতে আর স্বদেশানুরাগের মাত্রা প্রকাশ পায়। মহিষীর কন্ঠে প্রতাপের হৃদয় কেঁদে ওঠে, সন্তানদের খাবার দিতে না পারার কারণে নিজেকে অপরাধি মনে করে। চরম এই টানাপোড়েনে আকবরের বশ্যতা স্বীকারের কথা ভাবতে গিয়েও আবার নিজেকে দৃঢ় করে –

"প্রতাপ। ... এক-একবার মনে হচ্ছিল, দূর হোক্-গে চিতোর যাক – আকবরকে বলে পাঠাই – না না, ও পাপচিন্তা মনেও আনতে নাই– (উঠিয়া) কি! আমি– বাপ্পা রাওর বংশপ্রসূত– সমরসিংহের বংশপ্রসূত– সংগ্রামসিংহের বংশপ্রসূত– আমি প্রতাপসিংহ– সূর্যবংশীয় রাণা প্রতাপসিংহ– কোনো মর্তমানবের পদানত হব? বিশেষত স্বাধীনতাপহারী মোগল-দস্যুর দাসত্ব স্বীকার করব– (করজোড়ে উর্ধ্বদৃষ্টি করিয়া) ভগবান একলিঙ্গ! দেবাদিদেব মহাদেব! মনে বল দাও– বল দাও– বল দাও– বল দাও– ও দুর্মতি যেন না হয়! ও দুর্দশা যেন আমার কখনো না হয়! (সজোরে একটা শিঙা ফুৎকার করণ)" ১২

(দ্বিতীয় অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

মহিষী ভয়ঙ্কর এই বিপদে স্বামীকে স্বান্তনা দেন তবে প্রতাপসিংহের মতো বীরের হীন অবস্থাকে তার মুখ দিয়েই বর্ণনা করে প্রতাপের বীরত্বকে কিছুটা হলেও খাটো করা হয়েছে। বর্ণনার মধ্যে তা যদি সীমায়িত না করে কর্মবৃত্তির দ্বারা তার দুঃসহ কষ্টকে দেখানো যেত তবে প্রতাপের এই কষ্টকর পরিস্থিতি দর্শককে অনেক বেশি স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করত। ঘাসের চালের রুটি, বনবিড়ালের খাবার চুরি ইত্যাদি বর্ণনা না দিয়ে তাঁদের জীবন সংকটকে ক্রিয়ার দ্বারা সংগঠিত করা যেত তবে নাট্যকারের উদ্দেশ্যকে অনেক বেশি মজবুত করত। প্রতাপসিংহ গুহাতে বসবাস মানানসই – নিজের মাতৃভূমিকে পরাধীন রেখে যাথার্থ মাতৃপ্রেমিক সন্তান এমন জীবন যাপন করতেই পারেন কিন্তু উল্লিখিত খাওয়ার প্রসঙ্গগুলিকে কেমন বেমানান মনে হয়।

আরাবল্লী পর্বতস্থিত মল্লুরা প্রতাপকে শ্রদ্ধা করে তার দেশহিতৈষীতার জন্য, প্রজাবাৎসল্যের জন্য। সেই কৃতজ্ঞতাবশে রাজকন্যা অশ্রুমতীকে তারা বড়ো করেছে। সন্তানস্নেহ দিয়েছে – এও স্বাভাবিক। অশ্রু দশমবর্ষীয়া বালিকা, মা সম্পর্কে তার জ্ঞান আছে। রাজপুত কী, মসুলমান কী সে জ্ঞান নাই। অজিত বাবু ও সঙ্গত প্রশ্ন করেন, "অশ্রুমতী যখন অপহৃত হইয়াছিল, তখন সে ভীলদের

মধ্যে ছিল না। পিতামাতার সহিত পর্বতের কন্দরে ঘুরিতেছিল, সুতরাং পিতার কষ্টস্বীকার এবং সুদৃঢ় সংকল্প সে বুঝিতে না ইহা অস্বাভাবিক।"[১৩] তাই প্রতাপ মহিষীকে সে সম্পর্কে তাকে অবহিত করতে বলেন, 'যে-সব কবিদের গাথাতে রাজপুত-বীরত্বের গুণকীর্তন ও মুসলমানদের নিন্দাবাদ আছে, সেই সব গাথা ওর কন্ঠস্থ করিয়ে দিও।' অশ্রুর এই চরিত্র চিত্রন কেমন বেমানান ঠেকে। যে ভীলদের কাছে প্রতিপালিত, তাদেরও রক্তে স্বদেশের প্রতি অনুরাগ। 'রাজা, তোর পাকে মোরা সবাই পরাণদিব তুই কুছু ভাবিস না', সেখানে অশ্রু সে সম্পর্কে কিছুই জানবেন না তা হয় না।

আসলে নাট্যকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণ সৃষ্টির জন্য, নাট্যদ্বন্দ্বকে প্রকট করার জন্যই অশ্রুমতীর এমন অবস্থানকে বেছে নিয়েছেন।

এরপর নাটকে অশ্রুর মনের ভাবন্তরকে তুলে ধরেন। অশ্রু কোনো পুরুষের ভালোবাসার পথিক। অন্যদিকে মলিনা ও পৃথ্বীরাজের প্রণয় সম্পর্কে ইঙ্গিত এখানে আছে। সেলিমের প্রতি অশ্রুর পরবর্তীকালে ভালোবাসার কারণ স্বরূপ অশ্রুমতীর এই ভালবাসার প্রয়োজন অনেকটা দায়ী অর্থাৎ যখনই অশ্রুমতীর মন কোনো পুরুষের জন্য অপেক্ষামান তখনই মহৎ হৃদয় সেলিমের দর্শন – প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠোর প্রধান কারণ।

এদিকে মানসিংহের প্ররোচনায় ফরিদ অশ্রুকে অপহরণ করে এবং তার সঙ্গে সংসার করার স্বপ্ন দেখে। মহিষী– হাতাশা ক্লিষ্ট হলে বীরত্বে পূর্ণ প্রতাপ পুরানো ঢঙেই নিজের অবস্থানকে নিজস্থানে রাখে–

"প্রতাপ। ... মহিষি। অতি অশুভ লগ্নে অশ্রুমতীর জন্ম হয়েছিল, অশ্রুমতীর জন্যে তোমাকে আমি বলে দিচ্ছি আমাদের অনেক অশ্রুপাত করতে হবে – আর এ স্থানে থেকে কাজ নেই, যদি অশ্রুমতীকে পাই তো ভালো, নচেৎ এ পর্বতময় প্রদেশ ছেড়ে মেবারকে মরুভূমিতে সম্পূর্ণরূপে পরিণত করে সিন্ধু নদীগর্ভস্থ সগ্দিদের পুরাতন রাজধানীতে গিয়ে বাস করব – নীরস মরুভূমিতে মুসলমানেরা কি রস পায় দেখা যাবে।"[১৪]

(দ্বিতীয় অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

অর্থাৎ অশ্রুমতীর সশরীরে আগমন, মুসলমান কর্তৃক অপহরণ প্রতাপকে আরও কোণঠাসা করে দেয়। প্রতাপের রাজ্য গিয়েছে, বিশ্বাসী রাজন্যবর্গ মুসলমানের আশ্রয় নিয়েছে, ছিল যে একমাত্র কন্যা শেষ পর্যন্ত তাও গেল। প্রতাপের অবস্থানকে আরোও জটিল করে তুলল।

অন্যদিকে দর্শক এতক্ষন বীরত্ব গাথার একটানা সুর শুনে অন্য সুরে মজল। তাছাড়াও মুসলমানের নারীলোলুপতাকে মানসিংহ সাহায্য করায় অত্যাচারী সাম্রাজ্য লোভীদের কদর্যতাকে ও নতুনমাত্রা দেওয়া হল।

দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে ফরিদ অশ্রুকে যবনদের বন্দি করে তার পাণিগ্রহণের স্বপ্ন দেখে। অশ্রু তাকে ডাকাতের মতো মনে করলে পর সেলিমের আবির্ভাব। সেলিমকে এখানে মানবিক মূল্যবোধে একজন মানুষ হিসাবে দেখানো হয়েছে। অশ্রুকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি, '(অশ্রুমতীকে) তুমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে এইখানে বোসো, আর কোনো ভয় নেই।' অশ্রু ও তাকে বিপদের দিনে পরম বন্ধু মনে করে– '... তোমার সঙ্গে গেলে তোমার ভয় হবে না।' পাশাপাশি মানসিংহে বুঝতে পারে এ রাজপুত কন্যাকে ফরিদ আর পাবে না। ফরিদকে মিথ্যা প্রবোধ দেন। মানসিংহের এই আচরণে দর্শক ক্রুদ্ধ হয়। যখন একজন এদেশীয় রাজপুত রাজা এদেশেরই আরেক রাজপুত কন্যাকে যবনদের হাতে এনে দেয় তখন তার ক্রুরতা চরম মাত্রায় পৌঁছায়। দেশদ্রোহীর এমন আচরণে স্বদেশবাসীর মনে স্বদেশ-এর ভয়াবহ চেহারা প্রতিভাত হয়। মানসিংহ বলে,

"মানসিংহ। (স্বগত) আমার যে অভিসন্ধি ছিল ঠিক সেরূপ ঘটে কি না বিলক্ষণ সন্দেহ হচ্ছে– ফরিদের সঙ্গে যদি বিবাহ ঘটিয়ে দিতে পারতেম তা হলেই চূড়ান্ত হত– কিন্তু তাও যদি না হয়– শাজাদা শেলিমের সঙ্গে বিবাহটা ঘটলে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে– শাজাদা আপনি রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছেন সে ভালোই হয়েছে– কৃপাই প্রেমের পূর্বসূত্র। যদি আমি এইটে ঘটাতে পারি তা হলে প্রতাপ! তোর দর্প চূর্ণ হবে, যে তুর্কের হস্তে নিজ ভগিনী দেয়, তার আহার-স্থানে সূর্যবংশীর মেবারের রাণা উপবেশন কত্তে পারে না বটে?" [১৫]

(দ্বিতীয় অঙ্ক/দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

প্রতাপসিংহের প্রতিশোধ নিতে অশ্রুকে যদি সেলিমও গ্রহণ করে তবে মানসিংহের কিছু যায় আসে না। প্রতিশোধ নেওয়া হয়।

প্রতাপের মতো এমন একজন মানুষের প্রতি মানসিংহের এমন হীন ও কাপুরুষোচিত ব্যবহারে দেশবাসী ক্রুদ্ধ হয়। দেশীয় রাজার প্রতাপের আদর্শের প্রতি সহানুভূতি জেগে ওঠে যা স্বদেশপ্রেমেরই দ্যোতক।

তৃতীয় অঙ্কে প্রতাপসিংহের শত্রুর কাছে অনমনীয় মনোভাবের প্রকাশ দেখানো হয়েছে। পাশাপাশি বেশির ভাগ স্থান জুড়ে আছে অশ্রুর বিবাহ ব্যবস্থা ও মলিনা পৃথ্বীরাজের প্রণয় আখ্যান।[১৬] সেলিমের উদারতার স্খলনও এখানে আছে।

মেবার আক্রমণে উদ্যত দিল্লিশ্বর। প্রতাপের হতাশা ও অক্ষমতা প্রতাপকে দুর্বল করে দিচ্ছে। নিজের মাতৃভূমির সম্মান রক্ষা করতে না পারার গ্লানিতে প্রতাপসিংহ দগ্ধ। নিজের স্বদেশকে বিদেশির হাত থেকে বাঁচাতে না পারার কষ্টে প্রতাপ ক্ষত-বিক্ষত। তাঁর প্রতিটি উক্তিতে স্বদেশভূমির প্রতি তার প্রগাঢ় ভালোবাসা যেমন বর্ষিত হয়েছে তেমনি দর্শককে ইংরেজ আক্রমণে ভারতবর্ষের চিত্রকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। তাদেরও অন্তরে স্বদেশপ্রেম জেগে উঠেছে। প্রতাপ তার ক্ষমতাকে ঘোষণা করেন–

"প্রতাপ। (স্বগত) জন্মভূমি চিতোর, তোমাকে জন্মের মতো বিদায় দি – তোমার এ অযোগ্য

সন্তানের নিকট আর কোনো আশা কোরো না — আর একটু পরেই তোমার ঐ উন্নত জয়স্তম্ভ আমার চক্ষের অন্তরাল হবে — এইবার ভালো করে দেখে নিই — আমি তোমার কুসন্তান — আমা হতে তোমার কোনো উপায় হল না। (অবলোকন করিয়া) হায়! এ-সব স্থান পূর্বে লোকালয় ছিল, গীত-বাদ্য উৎসব কোলাহলে পূর্ণ ছিল, কত হাস্যময় শস্যক্ষেত্র এখানে প্রসারিত ছিল, এখন এখানে কি ভীষণ অরণ্য— মধ্যাহ্নেও যেন দ্বিপ্রহর অমাবস্যা রাত্রি— কি গভীর নিস্তব্ধ— আমার নিষ্ঠুর হস্তই এই হাস্যময় প্রদেশকে শ্মশানে পরিণত করেছে—... আমার প্রতি অদৃষ্টের যতই অত্যাচার হোক-না, আমার শরীরের প্রত্যেক শিরায় শিরায় দুঃখের মূল বিস্তৃত হোক-না কেন— তবু আমার উন্নত মস্তক মুসলমানদের নিকট কখনোই নত হবে না।" [১৭]

(তৃতীয় অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

স্বামী হিসেবে স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য করতে না পরার হতাশাও তাঁকে ক্লান্ত করে। নিজের শেষ শক্তি দিয়েও উন্নত মস্তককে উন্নতই রাখতে চেয়েছেন তিনি। তাঁর এই মানসিক দৃঢ়তা পরাধীন ভারতবর্ষে সংগ্রামীদের রসদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে তা বলাই স্বাভাবিক। শত্রুর কাছে কন্যা, রাজ্য সব গেলেও ভারত তথা চিতোরের আত্মসম্মানকে কোনোভাবেই ঘাটো করতে পারেন না। মধ্যযুগের চাঁদ বণিক যেমন কোনো কিছুর বিনিময়েই আদর্শচ্যুত হননি। প্রতাপও তেমন তাঁর উত্তরসূরী হয়ে সেই ভারতীয় আদর্শকে ধারণ করেছেন।

জটিল পরিস্থিতির আবর্তে চিতোরের রাজা ও রানি ভিখারি অপেক্ষা ও কষ্টকর জীবনে আসীন শুধুমাত্র স্বদেশকে রক্ষা করার জন্য। তবুও মহিষি যেন উদ্ভূত পরিস্থিতির কাছে মাথা নত করে স্বামীকে স্মরণ করিয়ে দেন আকবরের সঙ্গে সন্ধির কথা। কিন্তু প্রতাপ বীরত্বে পূর্ণ, আত্মনিবেদিত প্রাণ মুলমানের অর্থাৎ দেশ আক্রমণকারী শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করতে পারে না। প্রতাপের এই মিথ্যা শক্তির সঙ্গে আপস না করার মধ্য দিয়ে নাট্যকার সংগ্রামকে আহ্বান করেছেন। সশস্ত্র আন্দোলনে স্বদেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন। প্রতাপ সবদিক বন্ধ দেখে ভাগবতীর সাশ্রয়ে ব্রতী হন। প্রতাপসিংহের অক্ষমতার হাহাকার এখানে দেখি। আবার দেবীর প্রতি বিশ্বাসবশত কোনো অঘটনে চিতোর মুক্তি পাবে তাও বিশ্বাস করেন, 'চিতোর দেখিবে পুন চিতোরাধি পতি।'

এমন সময় প্রতাপসিংহের মন্ত্রী ভামশা হাত বাড়িয়ে দেন। সৈন্য সংগ্রহ করার মনোবল প্রতাপের আছে কিন্তু তার জন্য অর্থ নেই। ভামশা তার জীবনের সমস্ত অর্জিত উপার্জন তথা যথাসর্বস্ব প্রতাপের পায়ে সমর্পণ করে দান করলেন নিজের স্বদেশের উদ্দেশ্যে। ভামশা যখন বলেন, '... আপনার ধন আপনাকে দিলেম— দেশের ধন দেশকেই দিলেম' তখন স্বদেশরক্ষা করার যে কি তীব্র আকাঙ্খা তা প্রকাশ পায়। ঠিক সেই সময় পৃথ্বীরাজের পাঠানো পত্রে আসে স্বদেশপ্রেমের রসদ, হতাশাগ্রস্থ প্রতাপকে উজ্জীবিত করার মন্ত্র —

"হিন্দুর ভরসা আশা হিন্দুর উপর।
সে আশারও পরে রাণা ছেড়েছে নির্ভর।
প্রতাপ ছিল গো ভাগ্যি – নচেৎ আকবার
করেছিল সমভূমি – সব একাকার।
ক্ষত্রিয় বীরের আর কোথা সে বিক্রম ?
মহিলারও কোথা এবে সতীত্ব সম্ভ্রম ?
যথার্থ যে রাজপুত – 'নয় রোজা' দিনে
বিসর্জিতে পারে কি গো আপন সম্ভ্রমে ?
কিন্তু বল কয়জনে করে নি বিক্রয়,
সেই অমূল্য ধন খেয়ে লজ্জাভয় ?
ক্ষত্রিয়ের মুখ্য ধন বেচিল ক্ষত্রিয়,
বিকাবে সে রত্ন কি গো চিতোর তুমিও ?
কখনো না, কখনো না – নাহি তাহে ভয়,
চিতোর সম্ভ্রম রত্ন অটুট অক্ষয়।
খুয়ায়ে প্রতাপ আর সরবস্ব ধন
রেখেছে ঐ রত্ন মাত্র করিয়া যতন
বিশ্বজন জিজ্ঞাসিছে 'কোন্ গুপ্ত বলে
এড়ালেন মহারাণা ক্রুর কৌশলে ?'
নাহি প্রতাপের – শোনো – অন্য কোনো বল,
হৃদয়ের বীর্য আর কৃপাণ সম্বল !
আর্যবর ! ক্ষত্রবর ! চিতোরের রাজ্যেশ্বর।
চিরজীবী হয়ে থাকে মর্ত এই ভবে,
যতদিন তব প্রাণ, ততদিন আর্য-মা
অক্ষত অক্ষুণ্ন হয়ে অলঙ্ক রবে।
যবনের তাড়নায়, ক্ষাত্র-লক্ষ্মী মৃতপ্রায়,
তোমা পানে চেয়ে শুধু এখনও অটল,
হৃদে তাঁরা আশা পূর্ণ, যবনের দর্পচূর্ণ
তুমিই করিবে একা – তুমিই কেবল !
হীন ক্ষত্ররাজ দলে, আকবরের পদতলে,
লোটাক না নতশিরে – কি ক্ষতি তাহায় ?
কাপুরুষ ভীরু যারা, ভারত-কলঙ্ক তারা,
দিল্লির পথের ধুলি – তাদের কে চায় ?
যবন – বিপ্লব মাঝ, কিসেরই ভাবনা আজ,

ধ্রুবতারা রূপে যবে প্রতাপ উদয়,
চন্দ্র সূর্য থেকো সাক্ষী, আবার বিজয়-লক্ষ্মী
প্রতাপের গুণে শুধু হবেন সদয়।
কিসেরই নিরাশা তবে, কিসেরই বা ভয়,
মুক্তকন্ঠে গাও সবে মেবারের জয়!" [১৮]

(তৃতীয় অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

প্রতাপসিংহ আবার জেগে ওঠেন। মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য স্বদেশপ্রেমী সৈন্যদের নতুনভাবে উজ্জীবিত করেন। দেশকে যবনহাত থেকে রক্ষার তীব্র বাসনার মধ্যে প্রতাপের যে স্বদেশপ্রেম তাতে এ ধরণের চরিত্র চিত্রনে নাট্যকার যে উদ্দেশ্য সিন্ধতে কতটা সফল তা বলা অবান্তর।

তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ এই পাঁচটি দৃশ্যে অশ্রু – সেলিমের প্রণয়কে পরিণতির দিকে নিয়ে গেছেন নাট্যকার। তার সঙ্গে যুক্ত করেছেন পৃথ্বীরাজ শক্তসিংহের অনুসঙ্গ। শক্তসিংহ প্রতাপের উন্নত মস্তককে মর্যাদা দিতে অশ্রু প্রেমের পথে বাধা দিতে হয়ে দাড়িয়েছেন। স্বদেশভূমির মান-সম্মানকে ধূ-লুন্ঠনের হাত থেকে বাঁচানোর এই চেষ্টার মধ্যে তার স্বদেশ সম্পর্কে চেতনারই প্রকাশ পায়। পৃথ্বীরাজ ও মলিনার প্রেমের উপকাহিনিতে কিছুটা নাট্যকার এগিয়ে নিয়ে গেছেন। পৃথ্বীও স্বদেশকে রক্ষার চেষ্টা করেন। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে মলিনা অশ্রুকে বোঝানোর চেষ্টা করেন সেলিম আসলে তাদের শত্রু। অশ্রু শত্রু-মিত্রের হিসাব বোঝেনা। বাধ্য হয়ে মলিকাকে অশ্রুর স্বপক্ষে স্তুতি করতে হয়। অশ্রুকে ভালোরাখার জন্য সেলিম শক্তসিংহকে তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা বলেন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্কে পৃথ্বীরাজ মলিনা একপ্রস্ত প্রেমালাভ করে। প্রতাপকে জানানো জরুরি যে অশ্রু যবন হস্তে বন্দি। তাছাড়া মলিনাও স্বদেশের ভাবমূর্তিকে ক্ষুন্ন করতে চায় না, সে কারনে শক্তসিংহের সাহায্যে অশ্রুকে কোন রাজপুত হাতে সমর্পন করার কথা বলেন। মলিনার মধ্যে যে দেশের প্রতি অনুরাগ তাও নাট্যকার দেখানোর চেষ্টা করেছেন। পৃথ্বীও 'চিতোরের সম্ভ্রম' রক্ষার জন্য উদগ্রীব। অশ্রুকে যবন স্পর্শ থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্কে, পৃথ্বীরাজের স্বদেশকন্যার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। পাশাপাশি সেলিমের উদারতার স্খলন শুরু হয়। পৃথ্বীরাজ নিজের সর্বস্ব বিক্রয় করে স্বদেশের সম্মান রাখতে বন্ধ পরিকর –

"পৃথ্বীরাজ। সুলতান, আপনি যে মুক্তিমুদ্রার কথা বলেছিলেন, তা আমি সংগ্রহ করে এনেছি। এতে দশজন রাজপুত বন্দী মুক্ত হবার কথা। সুলতান, আপনি জানবেন আমার যথাসর্বস্ব বিক্রয় করে আমি এই পণ সংগ্রহ করেছি।" [১৯]

(তৃতীয় অঙ্ক/চতুর্থ গর্ভাঙ্ক)

পূর্বদৃশ্যে দেখেছি দেশের এক শোচনীয় বিপদের দিনে মন্ত্রী কীভাবে নিজের সর্বস্ব দান করেছেন স্বদেশকে এখানেও দেখি পৃথ্বীও জীবনের সুখ ঐশ্বর্যের কেন্দ্র তাঁর সম্পদকে দান করেছেন নিজের

স্বদেশকে। পৃথ্বীরাজের অশ্রুকে রক্ষা করার মধ্যে স্বদেশকে রক্ষা করার মূল্য খুঁজে পান কিন্তু বেদিশি ক্রুর যবন সন্তান সেলিম তার এই স্বদেশপ্রেমকে প্রশংসা করলেও তার মূল্য দিতে চান না।

অশ্রু তার প্রেমের পাত্রী। অশ্রুকে বিবাহের জন্য প্রস্তুতি পূর্বে তাকে মুক্তি দেওয়া অসম্ভব। তাই কোনোমূল্যেই অশ্রুকে দেওয়া যায় না –

'তোমার ক্ষুদ্র রাজ্য বিক্রয় করলেও তো সে পণ সংগ্রহ হতে পারে না'। তার এই আচরণের রূপায়ণ যখন মঞ্চে দৃষ্ট হয়, দর্শকমনে বিদেশি তুর্কি সম্পর্কে ক্রোধাগ্নি জ্বলে ওঠে। ব্রিটিশ শক্তির আচরণের সঙ্গে মিল খুঁজতে থাকে দর্শক। জেগে ওঠে ব্রিটিশ কবল দেশোদ্ধারের প্রবল আকাঙ্খা। সেলিম ফরিদকেও তার নায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে যখন তখন সেলিম এক খলনায়ক চরিত্রে পর্যবশিত হয়। উদারতা সেলিমের প্ররোচনা ছাড়া কিছুই নয় –পৃথ্বী ও সে তা বুঝতে পারে।

পঞ্চম গর্ভাঙ্কে, রাজপুত সন্তান শক্তসিংহ স্বদেশের ভূমি উদ্ধার অপেক্ষা অশ্রুমতীর সম্মান রক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। প্রতাপসিংহ একমাত্র এখনও তাঁর বংশের মর্যাদা রক্ষা করে চলেছেন। অন্য রাজপুতেরা যখন যবনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন তখন একমাত্র প্রতাপই রাজপুতের সম্ভ্রম রেখেছেন। এখন অশ্রুর কোনভাবে সম্মানহানি হলে স্বদেশের যে কলঙ্ক হবে তা মোচন করার কোনো উপায়ই থাকবে না। স্বদেশের প্রতি, স্ব-জাতির প্রতি গভীর ভালোবাসা এখানে প্রকাশিত। শক্ত সিংহ বলেন –

"শক্তসিংহ। (স্বগত) দাদাই রাজপুত-কুলের মর্যাদা সম্ভ্রম এতদিন বজায় রেখেছিলেন– আর তো প্রায় উচ্চবংশের সমস্ত রাজপুতই বাদশার নিকট কন্যা ভগিনী বিক্রয় করে পতিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের বংশের যে মর্যাদা বোধ হয় আর থাকে না। এখন কি করা যায় ? কি করে অশ্রুমতীকে উদ্ধার করা যায় ? যদি বলপূর্বক নিয়ে যাবার চেষ্টা করি, আর যদি তাতে কৃতকার্য না হই তা হলে আরো ভয়ানক হবে। এ অন্য কিছু নয় যে আবার পুনরুদ্ধার হতে পারে – যদি স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম একবার নষ্ট হয় তা আর ফেরবার নয় – সে কলঙ্ক আমাদের কুলপরম্পরায় প্রবাহিত হবে। প্রথমে সহজ উপায়ই অবলম্বন করা যাক। এই বেলা যদি কোনো রাজপুতের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে ফেলা যায় তা হলে বোধ হয় ফাঁড়াটা কেটে যেতেও পারে – এখানে তেমন সুপাত্রই বা কোথায় ? (চিন্তা করিয়া) কেন পৃথ্বীরাজ ! ঠিক হয়েছে – রূপে গুণে কুলে পৃথ্বীরাজের মতো পাত্র পাওয়া বড়ো সহজ নয়। এই যে পৃথ্বীরাজই এই দিকে আসছেন দেখছি।"[২০]

(তৃতীয় অঙ্ক/পঞ্চম গর্ভাঙ্ক)

তাই স্বদেশরূপী কুমারী নারী অশ্রুর সম্মান বাঁচাতে শক্ত সিংহ পৃথ্বীরাজের আশ্রয় নেন। পৃথ্বীও চান প্রতাপকে সম্ভাব্য কলঙ্ক থেকে বাঁচাতে– প্রতাপ তার কবিতার নায়ক, তার হৃদয়ের দেবতা, 'তাতে কোনো কলঙ্ক স্পর্শ হবে, এ তো আমার প্রাণ থাকতে সহ্য হবে না।' (পৃথ্বীরাজ) পৃথ্বীরাজ যখন জানতে পারেন তিনিই সেই ভাবীপাত্র। তখনই নাটকীয় মোড় অন্যদিকে ঘুরতে শুরু করে।

অশ্রু সেলিম এবং মলিনা পৃথ্বীর প্রেমের দুটি ধারা পাশাপাশি এগিয়ে যাচ্ছিল। শক্ত সিংহের এমন প্রস্তাবে ত্রিভুজ প্রণয়ের সূত্রপাতের বীজ রোপিত হল। সেলিম অশ্রু পৃথ্বীরাজ প্রেমের দ্বন্দ্ব রোমান্টিক দ্বন্দ্বকে সূচিত করবে তার ইঙ্গিত পাওয়া গেল। এদের মাঝে ফরিদের অবস্থান বিশেষ মাত্রা বহন না করলেও ফরিদ নিজস্বার্থ সিদ্ধি করতে পূর্বে সেলিমের ও মানসিংহের পদলেহন করেছে এবং শক্ত সিংহের।

সেলিম নিশ্চিত জানেন অশ্রু তার প্রেমাস্পদ। কোনো কিছুই মূল্যে এই রাজপুতকন্যাকে অন্যের হাতে সমর্পণ করা যাবে না। এমন সময় শক্তসিংহ সেলিমের কাছে অশ্রুর বিবাহ বিষয়ে ছাড়াপত্র নিতে এলে সেলিম সামনা-সামনি উদারতার পরিচয় দিলেও বললেন, 'আমি বলপ্রয়োগের বড়োই বিরোধী– বলপূর্বক তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি যে কারো সঙ্গে তার বিবাহ দেবে– আমি সে বিষয়ে কখনোই অনুমোদন করব না', আসলে সেলিম চাননা অশ্রুর অন্যত্র বিবাহ হোক। ছলে বলে তাই পৃথ্বী বা শক্তসিংহকে মনের কথা আড়াল করে।

তৃতীয় অঙ্কের সপ্তম গর্ভাঙ্কটি এক চরম মাত্রা বহন করে। নাটকের শুরুতে স্বীকার্য যে প্রতাপসিংহের বীরত্ব গাথা এ নাটকের প্রধান অবলম্বন, কাহিনিকে রসগ্রাহী ও দর্শক সমাগম করার লক্ষে দুটি প্রেমের উফকাহিনি পাশাপাশি বর্ণিত। চিত্রে এমন দেখা যায়–

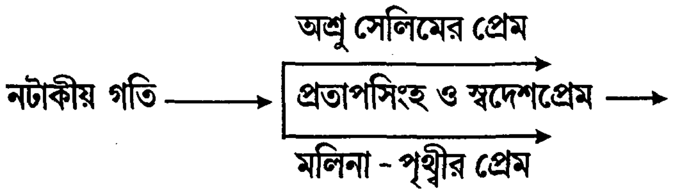

প্রাতপসিংহের কাহিনির climax দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে। তৃতীয় অঙ্কে প্রথম গর্ভাঙ্কে falling action শুরু হয়। আর সপ্তম দৃশ্যে falling action প্রান্তবিন্দুতে প্রতাপসিংহ তার ইঙ্গিত দেন।

মরণপণ সংগ্রাম করেও প্রতাপসিংহ যবনরাজ আকবরের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। আপন মাতৃভূমির পুনোরুদ্ধারের আশায় দুঃসহ জীবন-যাপন করেছেন। কিন্তু নিজের বীরত্বকে দুর্বল করেননি। এহেন স্বদেশপ্রাণ রাজার যখন স্তুতি করে শত্রুশিবির তখন প্রতাপসিংহের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত হয় সাধারণ দর্শকের।

আকবরের সেনাপতি মোহব্বত খাঁ শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতাপসিংহের বীরত্বের অহংকারকে আকবরের সমানে উত্থাপন করেন। – সন্ধির পত্র যে 'শাহেন শা' প্রতাপের নয় তার বীরত্বের প্রতি বিশ্বাস রেখে মোহব্বত একথাও প্রকাশ করেন –

"মোহব্বত খাঁ। না শাহেন্ শা, সে তাঁর পত্র নয়– আমি পৃথ্বীরাজের কাছে শুনেছি, সে জাল-পত্র। শাহেন্ শা, সহজেই যে প্রতাপসিংহ অবনতি স্বীকার করবেন এ কথা বিশ্বাস্য নয়। এমন সহায়হীন, নিঃসম্বল অবস্থায় পর্বতের গুহায় গুহায় ব্যাঘ্র ভল্লুক বন্য পাহাড়িদের

সঙ্গে তাঁকে একত্র বাসা করতে হচ্ছে– স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের অন্নকষ্ট উপস্থিত, তথাপি তাঁর অহংকারের এখনও খর্ব হল না– আমার একজন চরের মুখে সেদিন শুনলেম যে, এই দারিদ্র্য দশাতেও তিনি রাজ-কায়দা ছাড়েননি। দুই-চারিখানি ঘাসের বীজের রুটি এই তাঁর রাজভোগ– তা তাঁর অনুচরবর্গের সঙ্গে যখন একত্র আহারে বসেন তখন তাদের মধ্যে যে কেউ কোনো সন্তোষজনক কাজ করেছে, এরূপ যোগ্য ব্যক্তি দেখে তাঁর অন্নের প্রসাদ তাঁকে পুরস্কার স্বরূপ বিতরণ করাটিও আছে।... তাঁর বীরত্ব দেখেও শাহেন্ শা, আমরা চমৎকৃত হয়েছি– তার এখন সৈন্যাসমন্ত রীতিমতো কিছুই নেই, তবু আমাদের সৈন্যেরা তাঁর প্রচ্ছন্ন বাসগহ্বরের সন্ধান পেয়ে যদি কখনো তার অনুসরণে যায় তিনি অমনি শঙ্খধ্বনি করেন, আর সেই ইঙ্গিতে কোথা হতে অসংখ্য পাহাড়ি ভীল চারিদিক হতে এসে জমা হয়। একবার ফরিদ খাঁ এইরূপ অনুসরণ করতে গিয়ে তার সমস্ত সৈন্য একটা সংকীর্ণ পর্বত-পথে বিনষ্ট হয়।"[২১]

(তৃতীয় অঙ্ক/সপ্তম গর্ভাঙ্ক)

এমন দেশপ্রাণ মাতৃভূমির যোগ্য সন্তানের প্রতি পররাষ্ট্র লোলুপ আকবরও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন, 'অমন বীরের প্রতি অত্যাচার করা উচিত নয়।' প্রতাপসিংহের এমন জয়ধ্বনি যখন শত্রুর মুখে শোনা যায় স্বদেশবাসীর অন্তর তখন গর্বে ভরে ওঠে।

এমন সময় একজন দূত এসে যে সংবাদ দেন তাতে আকবর বিচলিত হন না। কারণ প্রতাপের মতো বীরের পক্ষেতা স্বাভাবিক। প্রতাপ যে সমস্ত মেবারকে পুনরায় উদ্ধার করতে পেয়েছে দর্শক তা শ্রবণ করেন শত্রু শিবিরের দূতের মুখে। পাশাপাশি বিশ্বাসঘাতক দেশীয় রাজা মানসিংহের অম্বর পর্যন্ত আক্রমণ করে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মানসিংহের বিশ্বাসঘাতকতার জবাব দিয়েছেন। দূত সংবাদ দেয় যে, ভামসার সাহায্যকৃত অর্থে প্রতাপ মেবার পুনরুদ্ধার করেছেন। মানসিংহের রাজধানী অম্বর পর্যন্ত আক্রমণ করে সে। এমনকি অম্বর বাণিজ্য কেন্দ্র মানপুর লুঠ করেছে।

তুর্কি সম্রাট আকবর একপ্রকার পরাজয় স্বীকার করে নিলেন। আকবরের বিপুল শক্তির কাছে প্রতাপসিংহ যে বীরত্ব দেখিয়েছেন তাতে তার দেশপ্রেমের মাত্রা নির্ধারণ করা কঠিন। আকবর তাই প্রতিশ্রুত হয়েছেন –

"আকবর। (উঠিয়া) আমি প্রতাপসিংহের বীরত্বে চমৎকৃত হয়েছি – দূত, তুমি প্রতাপসিংহের নিকটে যাও – গিয়ে তাঁকে বলো যে আর আমি তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করব না – তিনি এখন নিঃশঙ্কচিত্তে কাল যাপন করুন।"[২২]

(তৃতীয় অঙ্ক/সপ্তম গর্ভাঙ্ক)

নাট্যকার বার্তা দিতে চেয়েছেন, দেশের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা, মাতৃভূমির মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন প্রতাপসিংহ ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকেও স্বদেশকে রক্ষার চেষ্টা করেছেন। ভারতবাসীও এই স্বদেশপ্রেমের গাঢ়ত্ব থেকে ইংরেজ হস্ত থেকে তারা তাদের দেশকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হবেন।

ফলে প্রতাপ কাহিনি সমাপ্তির পথে। নাট্যকার যে স্বদেশপ্রেমের গান শোনাতে চেয়েছিলেন, দেশবাসীকে স্বদেশমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন তার প্রতাপের আলেখ্যর মধ্যে সার্থকভাবে দেখালেন। নাট্যকার স্বীকার করেছেন নাটকের প্রতাপ চরিত্রটিকে আগাগোড়া অনুসরণ করা হয়েছে, অশ্রু-সেলিমের প্রণয় কাহিনিতে কখনই তাকে কোনোভাবে খাটো করা হয়নি– "মহারাণা প্রতাপ সিংহকে আমি আরাধ্য দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকি। তাঁহার বীরত্ব, তাঁহার মহত্ব, তাঁহার সহিষ্নুতা, তাঁহার কুলনিষ্ঠা, তাঁদের দেশভক্তি আমাদের আদর্শ স্থল। চরিত্রের এই উচ্চ আদর্শ বঙ্গবাসীর সম্মুখে অর্পণ করাই এই নাটক রচনায় একমাত্র উদ্দেশ্য।"[২৩] ফলে অধ্যাপক অজিত কুমার ঘোষ ও বলেছেন এ কাহিনির কেন্দ্র বিন্দু অশ্রুমতী অনৈতিহাসিক – "প্রতাপসিংহের কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া লেখা হইলেও সেলিম ও অশ্রুমতীকে কেন্দ্র করিয়া যে মূল কাহিনীটা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতেই নাটকের লক্ষ্য ও প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছে।"[২৪] তা ধোপে টেকে না।

তবে প্রেমের প্রেক্ষাপটে প্রতাপসিংহের বীরত্বকে যেহেতু মাত্রা দেওয়া হয়েছে তাই প্রেমকাহিনির পরিণতিতে তার উপস্থিতি ও বীরত্ব সংযোজিত হবে। নাট্যকার নাটকের শেষ দিকে তাই প্রতাপকে আবার এনেছেন।

চতুর্থ অঙ্কে প্রতাপসিংহের চিতোরকে সম্পূর্ণ না পাওয়ার হতাশার পাশাপাশি জ্বলে ওঠার চিত্র আছে। মহিষীর ভূমিকা ও স্বামীর বীরত্ব প্রকাশে কতটা সহায়ক, দেশোদ্ধারের কতটা সহায়ক তা দেখানো হয়েছে। প্রতাপের স্বপ্নের মধ্যে তার স্বদেশচিন্তার প্রগাঢ়তাকে দেখানো হয়েছে। বাকি ষোলটি গর্ভঙ্কে অশ্রু-সেলিম এর প্রেম ও মলিনা-পৃথ্বীর মাঝে একটি ত্রিভুজ প্রণয়ের (সেলিম-অশ্রু-পৃথ্বীরাজ) জটিলতা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রণয় উপকাহিনির climax সূচিত হয়েছে এখানে। পাশাপাশি রাজপুত কুলোদ্ভব শক্তসিংহর আপ্রাণ চেষ্টা অশ্রুর-সেলিমের সঙ্গে বিবাহ স্থগিত করে প্রতাপসিংহের সম্মান রক্ষা করা। শেষ পর্যন্ত অশ্রুমতীকে যবন হাত থেকে মুক্ত করে মেবারে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে এই অঙ্কের সমাপ্তি।

প্রথম গর্ভাঙ্কে মহিষীর মুখে জানতে পারি, প্রতাপ এমন একজন দেশপ্রেমিক রাণা যে শয়নে-স্বপনে-চেতনে-অচেতনে-স্বদেশ উদ্ধারের চিন্তায় মগ্ন। তাই মেবার ফিরে পেলেও 'যাহারে পেয়েছি তার কখন হারায়' এ বশবর্তী হয়ে স্বপ্নের মধ্যেও চিতোর চিতোর করে চিৎকার করে ওঠেন–

"মহিষী। মহারাজ, নিদ্রার সময়েও কি তোমার একটু আরাম নেই– কেবলই যুদ্ধের কথা? সমস্ত রাত কাল তুমি মহারাজ, 'ঐ চিতোর গেল'– 'ঐ মুসলমানেরা আসছে– ধরো, মারো' এইরকম ক্রমাগত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চিৎকার করেছ– এইরকম হলে শীঘ্রই যে একটা ব্যামো হবে। এখন তো প্রায় সমস্ত মেবারই ফিরে পাওয়া গেছে– তবে এখনও কিসের জন্য এত ভাবনা মহারাজ।"[২৫]

(তৃতীয় অঙ্ক/সপ্তম গর্ভাঙ্ক)

আসলে প্রতাপসিংহের প্রতি নাট্যকারের শ্রদ্ধা এতটাই উচ্চ যে স্বদেশচেতনায় উজ্জ্বল প্রতিনিধি হিসাবে তাকে 'মডেল' হিসাবে দেখাতে চেয়ে এমন বর্ণনায় রত হয়েছেন। প্রতাপ মেবারকে উদ্ধার করলেও এখনও তুর্কি সেনাপতির মস্তককে অবনত করে মেবারের পবিত্র স্বাধীনতা আনতে পারেননি। মেবারের মাটিকে উদ্ধার করেছেন বীর বিক্রমে। তাই নিজেকে স্বদেশভূমিতে বিদেশি বলে মনে হয়। এই দুঃচিন্তা এই বীরসান্তানকে উতলা করেছে,

"প্রতাপ। মহিষি, এখনও চিতোর উদ্ধার হয় নি– যতদিন না চিতোর উদ্ধার করতে পারব ততদিন মহিষি, আমার আরাম নাই– বিরাম নাই– শান্তি নাই– নিদ্রা নাই। এই উদয়পুরের শিখর থেকে যখনি চিতোরের দুর্গপ্রাকার আমার দৃষ্টিগোচর হয় তখনি আমার হৃদয়ে যে কি যন্ত্রণা উপস্থিত হয় তা আমিই জানি– আমার মনে হয় আমি নির্বাসিত চিরপ্রবাসী। যে চিতোর আমাদের পিতৃভূমি, যে চিতোরের সঙ্গে আমার পূর্ব-পুরুষদিগের কীর্তি-গৌরব জড়িত, যার শৈলদেশ তাঁদের শোণিতধারায় ধৌত, সেই চিতোরের নিকট আমি এখন কিনা একজন অপরিচিত বিদেশিমাত্র, তার সঙ্গে যেন আমার কোনো সম্বন্ধই নাই! ওঃ, মহিষি! এ কল্পনাটি মাত্র আমার অসহ্য! কাল আমি সমস্ত রাত এই চিতোরের স্বপ্ন দেখেছিলেম, কত চিত্রই যে আমার মনের মধ্যে একে একে উদয় হচ্ছিল তা কি বলব। প্রথমে যুবা বাপ্পা রাও – যাঁর বাহুবলে চিতোরের রাজমুকুট মৌর্যবংশ হতে প্রথম অর্জিত হয় – সেই পূজনীয় বাপ্পা রাও আমার মনশ্চক্ষের সমক্ষে সর্বপ্রথমে উদয় হলেন, তারপর দেখলেন বীরশ্রেষ্ঠ সমরসিংহ রাজপুত স্বাধীনতার সেই শেষ দিনে কাগার-নদীতীরে পৃথ্বীরাজের সহিত একত্র জীবন বিসর্জন করবার জন্য যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হচ্ছেন – আবার দেখলেম, রাণা লক্ষ্মণসিংহের দ্বাদশ পুত্র একে একে চিতোরের লোহিত পতাকা হস্তে ধারণ করে চিতোরের দুরারোহ শৈলশিখর হতে শত্রুদের আক্রমণের জন্য বীরদর্পে অবতরণ কচ্ছেন।"[২৬]

(চতুর্থ অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

যথার্থ স্বদেশপ্রেমী প্রতাপ। মেবারের মাটি উদ্ধারের মধ্যেই মাতৃভূমিকে উদ্ধার করা যায় না আক্রমণকারী শক্তিকে সম্পূর্ণ অবনত করে সমর্থন আদায় এর মধ্যেই দেশের স্বাধীনতা নিহিত। নাট্যকারের এ ধারণার মধ্য দিয়ে সুক্ষ্ম স্বদেশচেতনারই পরিচয় পাওয়া যায়।

নাট্যকার প্রতাপ চরিত্রকে উজ্জ্বল করতে স্বপ্ন প্রসঙ্গকে এনেছেন। দেখাতে চেয়েছেন দেশপ্রাণ বীরের অবচেতনের ঠিকানা। স্বদেশ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে তিনি এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে বদলে দিতে চেয়েছেন। তবে শেক্সপীয়র 'জুলিয়াস সিজার' বা 'ওথেলো' নাটকে এমন অলৌকিকতার প্রসঙ্গ আছে। চিতোর যে প্রতাপের প্রাণাধিক প্রিয়, চোখের মণি, চিতোরের রক্ষা সম্মান করা যে তাঁর ব্রত তা এই স্বপ্নদৃশ্যে আছে। চিতোর তাঁর পূর্ব পুরুষের বীরত্ব কলঙ্কিত হতে যাচ্ছিল, যে চিতোর রক্ষার জন্য নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অত্মদান করেছে সেই চিতোর আজ প্রতাপের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান।

বাপ্পারাও উদয়সিংহ, লক্ষ্মণসিংহ এর আত্মত্যাগ, তাঁদের স্বদেশপ্রেমকে স্বপ্নমধ্যে দর্শন করে নতুন করে বংশগৌরবে প্রজ্জ্বল হলেন।

এরপর স্বপ্নমধ্যে দর্শন করলেন বেদনোরের জয়মল ও কালইবারের দুই বীরকে। যারা কঠোর স্বদেশব্রতে উন্নীত হয়ে নিজ পুত্র-কন্যাকেও যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়ে দিয়েছেন, রক্তবস্ত্র পরিধান করে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। যে কোন ভাবে শত্রুর থেকে চিতোরকে রক্ষা করতে তাদের বীরত্ব প্রতাপসিংহকে দেশের স্বাধীনতা আনার জন্য প্রেরণা দিয়েছে।

অর্থাৎ দেশোদ্ধারের জন্য অসহনীয় জীবন যাপন করেছেন। মানসিকভাবে দগ্ধ হয়েছেন তার রসদ পেয়েছেন যে পূর্ব পুরুষদের বীরত্বের মধ্যে তাই-ই স্বপ্নে দৃষ্ট। আজও প্রতাপের সংগ্রামের শেষ হয়নি। এখান থেকেই উদয়-লক্ষণসিংহের কাছে মন্ত্র নিয়ে বাকি কাজকে সম্পন্ন করতে চান। যেকোন ভাবে মেবারের উন্নত মস্তককে উন্নত দেখতে চান।

এরপরই দেখলেন চিতোরের স্বাধীনতা নির্বাপিত। চিতোরের সৌভাগ্য লক্ষ্মী 'কাংরারাণী' চিতোর ছেড়ে চলে গেলেন, দেখলেন হতভাগ্য পিতা উদয়সিংহ চিতোর ছেড়ে চলে গেলেন। আসলে এ হল পরাধীন মেবারের ছায়া। যেখানে নেই তাদের সৌভাগ্য লক্ষ্মী নেই তাদের পূর্ব পুরুষেরা। চিতোর শুষ্ক, নিস্প্রাণ, বীরহীন পুরু। ... কিন্তু তারপরেই দেখলেন 'চিতোরের প্রাকর ঘন মেঘরাশিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল– চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী 'কাংরা রাণী' চিতোর পরিত্যাগ করলেন',

তাই চিতোরের স্বাধীনতা এনে এঁদেরকে মাতৃভূমিতে, নিজের স্বদেশে আবার যতদিন না পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন চিতোরের রাণার সংগ্রামে ততদিন শেষ হবে না।

প্রতাপসিংহের এ হেন স্বদেশপ্রীতিতে স্বদেশবাসী উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। দর্শকেরা ব্রিটিশ কবল থেকে শুধু ভারতের মাটিকে নয়, ভারতের স্বাধীনতার সম্মান ফিরিয়ে দেওয়ার প্রেরণা পান। স্বদেশ চেতনার এ নাটক স্বদেশবাসীর কাছে বেদতুল্য হয়ে ওঠে।

চিতোরের পুনোরুদ্ধার পর্বের মধ্য দিয়ে প্রতাপ কাহিনি শেষ বিন্দুতে এসে দাঁড়ায়। যে উপকাহিনি দুটি পাশাপাশি প্রবাহিত হচ্ছিল সেই ধারার সঙ্গে প্রতাপকে অন্বিত করতেই স্বপ্নের মধ্যে অশ্রু প্রসঙ্গ এসে পড়ে। তাছাড়া সম্ভাব্য বিপদের ইঙ্গিত পেয়েই স্বপ্ন মধ্যে দেখেন যবন দ্বারা অশ্রুমতীর অপহরণ। এমন সময় সম্রাটের দূর প্রতাপসিংহের কাছে বার্তা পাঠান –

"দূত। মহারাজ, আপনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যেরূপ ভয়ানক কষ্ট সহ্য কচ্ছেন, তা শুনে তাঁর হৃদয় বিগলিত হয়েছে– তিনি আর আপনার প্রতি কোনো অত্যাচার করবেন না– আপনি এখন নিঃশঙ্কচিত্তে কালযাপন করুন।"[২৭]

(চতুর্থ অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

প্রতাপ আবার জ্বলে ওঠে। সে যে বীরত্বে দিয়েই, স্বদেশের প্রতি ভালোবাসার শক্তি দিয়েই দেশের স্বাধীনতা আনতে সক্ষম তা বিলক্ষণ বিশ্বাস কারণ। অথচ যবন সম্রাটের এমন সহানুভূতিতে

বীরহৃদয় গর্জে ওঠে। শত্রুর কৃপাকে ঘৃণা করে স্বদেশকে সম্মানিত করতে চান, সম্মুখ যুদ্ধে যেতে চান। সংলাপটিতে সে বার্তা দেখি–

"প্রতাপ। তবে তুমি এখন বিদায় হতে পার। তোমার প্রভু আকবর শাকে বোলো, কবে রণক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তার জন্যই আমি প্রতীক্ষা করে আছি– সূর্যবংশীয় রাণা প্রতাপসিংহ তাঁর কৃপার আকাঙ্ক্ষী নন।... কি! আমার প্রতি আকবরের কৃপা? বরঞ্চ আমি শত্রুর ঘৃণা সইতে পারি– অবজ্ঞা সইতে পারি– অবমাননা সইতে পারি– কিন্তু শত্রুর কৃপা আমার অসহ্য! শত্রুর কৃপাপাত্র হওয়া অপেক্ষা পৃথিবীতে অসহ্য যন্ত্রণা আর কিছুই নেই। বরঞ্চ শতবার মৃত্যুযন্ত্রণাও প্রার্থনীয় তথাপি মেবারের রাণা প্রতাপসিংহ কোনো মর্ত্যমানবের কৃপার ভিখারি হবে না।"[২৮]

(চতুর্থ অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

কোনো প্রতিকূলতার কাছে মাথা নয় করে নয়, শত্রুর সহানুভূতিতে বেঁচে থাকা নয়– প্রতাপসিংহ বাঁচতে চান বীরের মর্যাদায়। বাঁচতে চান স্বদেশকে আপন সম্মানে। এ হেন বীরের এমন আলেখ্য বাঙালি তথা ভারতবাসীর জীবনে স্বদেশচেতনা আনতে সুরপ্রসারী ছায়াপাত করে তা বলাই বাহুল্য।

চতুর্থ অঙ্কটি সতেরোটি গর্ভাঙ্কে বিন্যস্ত। পঞ্চাঙ্কে নাটকের পরিধিকে বাঁধতে গিয়ে, রোমান্টিক প্রণয় কাহিনির উত্থান পতনকে পরিপূর্ণ মাত্রায় রূপায়ণ ঘটাতে গিয়ে গর্ভাঙ্কের এমন বিস্তার। নাট্যাভিনয় কালে দর্শকের বিরক্তির কারণ হওয়ায় সম্ভাবনা থেকে যায়। স্বদেশ চেতনার বিকাশ ঘটাতে নাট্যকার সীমিত পরিসরে মেবার রাজের দুর্দশা, বীরত্ব, স্বদেশ উদ্ধারকে সার্থকভাবে দেখিয়েছেন। যাই হোক কাহিনির যে দুটি ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল তার গতি অব্যাহত থাকে –

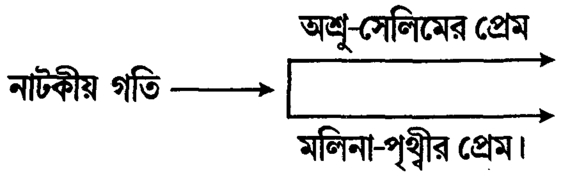

চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে শক্তসিংহকে পৃথ্বীরাজ অশ্রুর জন্য সৎ পাত্রের সন্ধান দেবে কথা দিয়ে কথা রাখতে পারেন না। মলিনার প্রতি অবিচারের কথা ভেবে পৃথ্বী দ্বিধার মধ্যে পড়লেন। শক্তসিংহ যখন জানলেন তখন অশ্রু যে মলিনা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ তাকে একবার পৃথ্বীর দেখা উচিত বলে মনে করলেন।

পরবর্তী গর্ভাঙ্কগুলিতে এই দেখা করার মধ্যে সত্য-সত্যই পৃথ্বীর অশ্রুকাঙ্খা অনেক বেড়ে গেল। মলিনা তার কাছে অপাংক্তেয় হতে শুরু হল।

পৃথ্বীরাজ পিতার অসুস্থতার সংবাদ দেওয়ার আছিলায় অশ্রুকে দেখা করতে গেলে সেলিমের ঈর্ষার সঞ্চার হল। তার উপর ফরিদ ঘৃতাহুতি দিল। পৃথ্বী সম্পর্কে তাকে উত্তেজিত করল। শক্তসিংহ সেলিমকে সত্য কথা খুলে বললে উদারচেতা সেলিমের নিষ্ঠুরতার প্রকাশ পেল। সে যে যবন সন্তান

ভিন্ন নয় তা আবারও প্রমাণ পেল– 'সে অতি কুপাত্র, তার সঙ্গে কখনোই বিবাহ দেওয়া যেতে পারে না – সে এমনি বর্বর যে কার কিরূপ পদমর্যাদা সে বিষয়ে তার একটুও লক্ষ নেই।'

সেলিম সম্পর্কে রোমান্টিকতার মধ্যে নাট্যকার দর্শককে এক টানাপোড়েনে দাঁড় করান। প্রেমের পরিণতি বিবাহ এ যেমন প্রতিটি দর্শকের অভিপ্রেত ঠিক তেমনি তৎকালীন সমাজের সংস্কার বশে প্রতাপ কন্যা অশ্রুর বিধর্মে বিবাহ ও অনভিপ্রেত। চরম উৎসুক সৃষ্টি হয় এখানে। পৃথ্বীর স্পর্ধার কারণে সেলিম তাকে কারারুদ্ধ করে। বুদ্ধি বলে শক্তসিংহ যখন অশ্রুকে মুক্ত করতে অক্ষম। তখন বলপূর্বক অশ্রুকে বের করে পৃথ্বীর হাতে সমর্পন করার পরিকল্পনা করেন এবং দুষ্ট ফরিদের কথা মতো মলিনা অশ্রুর কাছে পৃথ্বীর কয়েদ হওয়ার কথা বললেন।

সেলিম যখন অশ্রু-পৃথ্বীর সম্পর্ক নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব তখন অশ্রু সেলিমের কাছে পৃথ্বীর মুক্তি প্রার্থনা করলেন। সেলিম তা মঞ্জুর করেন এবং সন্দেহের অবসান ঘটাতে বিবাহের ব্যবস্থা নিতে চলে যান।

অন্যদিকে পৃথ্বীরাজ যখন অশ্রুকে পাওয়ার জন্য কল্পনার জাল বুনতে ব্যক্ত তখন মলিনার উপস্থিতি তার বিরক্তির সঞ্চয় করে। তবে পৃথ্বী কিন্তু অশ্রুকে জোর পূর্বক নয়, প্রতাপকে কন্যা ফেরত দিয়ে সকৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করতে চান। পৃথ্বী-অশ্রু-মলিনার ত্রিভুজ দ্বন্দ্ব উচ্চগ্রাসে পৌঁছায়। অন্যদিকে অশ্রুর বিবাহ প্রস্তুতিতে চরম সংকট সূচিত হয়। ফরিদ পৃথ্বীকে মিথ্যা রসদ দিয়ে প্রণয় কাহিনিকে জটিল আবর্তে নিক্ষেপ করে।

অষ্টম গর্ভাঙ্কে অশ্রুমতী স্পষ্টভাবে শক্তসিংহকে জানায় সেলিমকেই সে বিবাহ করবে। প্রতাপসিংহের ভ্রাতা শক্তসিংহ অশ্রুকে সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার জন্য স্বদেশের গৌরব, স্বদেশের শত্রুর কথা বলে বোঝাতে বলে। অশ্রুকে বোঝানোর জন্য যে কথাগুলি বলেন –

"শক্তসিংহ। সে আমাদের শত্রু, তার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্বন্ধ নেই।... তুমি রাজপুত ললনা হয়ে অমন উচ্চকুলোদ্ভবা হয়ে কিনা একজন ঘৃণিত যবনকে হৃদয় দেবে ? কি তাহলে কলঙ্ক রাখবার আর স্থান থাকবে ?... পৃথ্বীরাজ কুলে শীলে গুনে সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ তার সঙ্গে যদি বিবাহ হয় তো তুমি নিশ্চয়ই সুখী হবে।... তুই কি সূর্যবংশীর রাজদুহিতা অশ্রুমতী ? তুই ঘৃণিত মুসলমানকে হৃদয় দিয়েছিস ?... রাজপুত কুলের কলঙ্কিনি ! তুই মৃত্যু ইচ্ছা কচ্ছিস – মৃত্যুই তোর উপযুক্ত দণ্ড।"[২৯]

(চতুর্থ অঙ্ক/অষ্টম গর্ভাঙ্ক)

অশ্রুমতী মৃত্যু বরণ করতে প্রস্তুত তথাপি আপন প্রেমাস্পদকে ভুলতে পারবে না। শক্তসিংহ অশ্রুকে ফেরানোর ঐকান্তিক চেষ্টার একমাত্র কারণ স্বদেশভূমির স্ববংশের গৌরবকে অক্ষুন্ন রাখা। কিন্তু কোনোভাবেই যখন ফিরাতে পারছেন না তখন বিবাহ একসপ্তাহ পিছিয়ে দিতে বললেন। যাতে মাঝের এই সময়ে শেষ চেষ্টা করবেন শক্ত রাজপুতকূলকে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাতে।

অশ্রু কিন্তু শত্রু-মিত্র, রাজপুত-যবন ভেদাভেদকে বুঝতে চায় না। পিতার দুঃসংবাদ পেয়ে উতলা হয় অথচ পিতার সম্মান রক্ষা করতে তার নমনীয়তা দেখা যায় না। পৃথ্বীর মুখে পিতার দুঃসংবাদ শুনে তার অভিব্যক্তি— 'আমি থাকলে, তাঁর কত সেবা করতেম' যে পিতাকে জ্ঞানাবধি জানে না, তার কাছে পিতাকে দর্শন করার এত আঙ্কাখা যদি সত্য হয় তবে পিতার সম্মান রক্ষার জন্য স্বদেশবাসী বোঝে, পরিজন বোঝে, অশ্রুর তখন উক্তি— 'আমাকে বধ করে কলঙ্ক হতে মুক্ত হও। ... আমি রাজপুতও জানি নে, মুসলমানও জানিনে— আমার হৃদয় যাকে চায় আমি তাকেই জানি।'

আসলে অশ্রুর অবির্ভাব শুধু প্রণয় আখ্যানের জন্য। প্রেম তার কাছে স্বদেশকে কলঙ্কমোচন অপেক্ষা অনেক বড়ো। তাই হয়ত নাট্যকার সে প্রেমকে কলুষিত না করে স্বদেশের মর্যাদাকে বড়ো করে দিতে গিয়ে প্রেমকে হত্যা করেছেন। অশ্রুর মানসিক দ্বন্দ্বের সূচনা এখান থেকে। সহজ গাণিতিক হিসাবে সেলিমের প্রতি কৃতজ্ঞতার কথা বলে সেলিমকে বরণ করার কথা ভাবেন।

সেলিমকে বিবাব স্থগিতের কথা বললেও সেলিমের মনের টানাপোড়েন বহুগুণ পেড়ে যায়। ফরিদ সেলিমের সন্দেহকে মজবুত করতে মিথ্যা ভাষনে অশ্রু-সেলিমের আসক্তির কথা ঘোষণা করল। সেলিমের উদারতার মুখোশ এবার উন্মোচনের পথে। ক্রোধান্ধ হয়ে পৃথ্বীকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলে বসে। অশ্রু সম্পর্কে ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।

প্রেম সম্পর্কের জটিল বন্ধন রচিত হয় চতুর্থ অঙ্কের নবম গর্ভে। পৃথ্বীরাজ মলিনাকে তার প্রতি প্রণয়াসক্তি ত্যাগ করতে বলে।

দশম গর্ভাঙ্কে অশ্রুর টানাপোড়েনও সেলিমের অন্তরের ক্ষত-বিক্ষত চেহারাকে প্রস্ফুটিত করেছে। কি হয় ? কি হয় ? দর্শক মনে এই উৎকন্ঠার মধ্য দিয়ে Climax -এর দিকে কাহিনি যাত্রা করে।

ফরিদ নিজ স্বার্থ মতো অশ্রুমতীকে না পাওয়ায় সেলিম অশ্রুমতি-পৃথ্বীরাজ পরস্পরকে দূরে সরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। পৃথ্বীর কাছে অশ্রুর নামে পত্র লিখিয়ে তা সেলিমের সামনে তুলে ধরলে অশ্রু সম্পর্কে সেলিম ঘৃণা প্রদর্শন করতে থাকে। পত্র মতো ফরিদকে কাজ করতে বলেন। পৃথ্বীও অশ্রু পরস্পর যখন সাক্ষাৎ করবে তখন তাকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেন।

দ্বাদশ গর্ভাঙ্কে, অশ্রু জানতে পারে পৃথ্বীতাকে ভলোবাসে কিন্তু অশ্রু আপন সখীর প্রেমাস্পদ পৃথ্বীকে আপন সখীর কাছে সমর্পন করার জন্য পত্র মতো পৃথ্বীকে আসতে বলে। ত্রয়োদশ গর্ভাঙ্কে শক্তসিংহ অশ্রুকে বের করে নিয়ে যাওয়ার সব ব্যবস্থা পাকা করে।

প্রেমকাহিনির 'ক্লাইম্যাক্স' এই চর্তুদশ গর্ভাঙ্কে নিহিত। সেলিম শক্তসিংহের সমস্ত পরিকল্পিত ব্যবস্থার প্রসঙ্গ জানতে পারেন ফরিদ মারফৎ। ক্রোধে সেলিম উন্মত্ত প্রায় – 'হতভাগিনি, তোর আজ জীবনের শেষ দিন !'

'আমার শুধু রূপলালসা, আমার তো আর ভলোবাসা নয়। এখন দেখি কোথাকার জল কেথায় মরে।'

দর্শকমনে টানটান উত্তেজনা। রোমান্টিক কাহিনির চরম ক্লাইম্যাক্স এখানে সৃষ্টি হয়েছে। পৃথ্বী অশ্রুকে দেখা করতে গেলে অশ্রু তাকে বিতারিত করল। ফরিদের বিশ্বাসঘাতকতা পৃথ্বীরাজ ধরে ফেললে। ঘনান্ধকারে অপেক্ষমান সেলিম পৃথ্বীরাজকে আসতে দেখে হত্যা করল। রাজপুতবংশের নিঃকলঙ্ক একটি প্রাণকে ধ্বংস করল যবন সন্তান। মৃত্যুর আগে মলিনাকে প্রত্যাখানের অপরাধ স্বীকার দর্শকমনে যখন এক আশার আলো সঞ্চার করে তখন এমন ঘটনা দর্শকে স্তম্ভিত করে। অশ্রুমতীর সঙ্গে এবার সেলিমের সাক্ষাৎ হলে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হল। যবন সৈন্যের এ হেন নির্মম অত্যাচার প্রেমের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বাহ্যিক উদারতায় দর্শকমনে বিদেশিদের প্রতি ঘৃণা বর্ধিত হয়। স্বদেশ কন্যার এমন অপমান মেনে নিতে পারে না দর্শক। সামান্য আঘাতে অশ্রুর পতন হলে সেলিম তাকে মৃত বলে মনে করল। এককথায় সেলিমের কাছে অশ্রু মৃতই থেকে গেল। মলিনার কাছে অশ্রুর তার প্রতি ভালোবাসার কথা শুনে সেলিম উন্মাদ প্রায় হল।

ফরিদের অবস্থান সম্পর্কে সেলিম জ্ঞাত হলে তাকেও হত্যা কর।

রোমান্টিক প্রণয়ের দুটি উপকাহিনির দুটি উপকরণ এভাবে সরে গেল। ট্রাজিক পরিণতিতে সেলিম যেমন অশ্রুহীন হল তেমনি মলিনাও পৃথ্বীহীন হল। কৌশলে অশ্রুকেও সেলীমহীন করা হল। সেলিম ছাড়াও অশ্রু বাঁচতে পারে তা সেলিমের ক্রোধান্ধ পরিস্থিতিতে প্রমাণিত হল।

শক্তসিংহ এবার অসুস্থ অশ্রুকে নিয়ে আরাবল্লী পর্বতে আসীন– মেবারের পথে। অর্থাৎ প্রণয় কাহিনিকেও falling action এ দাঁড় করিয়ে দিলেন নাট্যকার এবং Conculation এর পর্ব শুরু।

নাট্যকার চতুর্থ অঙ্কের এতগুলি গর্ভাঙ্ক খণ্ড খণ্ড ভাবে বিভক্ত হয়ে প্রণয়কাহিনিকে প্রতাপকাহিনির সমস্থানে নিয়ে গেলেন।

পঞ্চম অঙ্কেনাটকটি সমাপ্তি। এখানে যে দুটি কাহিনির কেন্দ্র বিন্দু প্রতাপও অশ্রুমতী তাদের মিলন পর্ব দেখানো হয়েছে। প্রতাপ ও চিতোরকে স্বাধীন করতে না পারায় হতাশা গ্রস্থ, অশ্রুও প্রেমাস্পদকে না পাওয়ায় হতাশা গ্রস্থ। দুটি নিরাশ অন্তরকে এমনভাবে মেলানো হয়েছে তার ফলেও এসেছে হতাশা। অর্থাৎ হতাশায় নাটকটির সমাপ্তি, ট্রাজেডিতে সমাপ্তি। প্রেমকাহিনির চার নায়ক-নায়িকাও ছিন্ন-ভিন্ন। প্রত্যেকেই ট্রাজেডির শিকার। এর মধ্যেও নাট্যকার অসুস্থ প্রতাপসিংহের বীরত্বকে বজায় রেখেছেন আপন কন্যার কাছে অনমনীয় এই চরিত্রটি শেষ পর্যন্ত আপন স্বদেশভূমিকে সর্বোচ্চ আসনে বসিয়ে বিদায় নিলেন।

দুটি গর্ভঙ্কে প্রথম গর্ভঙ্কে প্রতাপ-অশ্রুর প্রসঙ্গ। শপথ পালনে দায়বন্ধ অসুস্থ প্রতাপ খড়ের শয্যায় শুয়ে স্বদেশকে মুক্ত করতে না পারার গ্লানি– 'চিতোর উদ্ধার আমার দ্বারা হল না' এমন

সময় অশ্রুমতী আসার সংবাদে অধীর হয়ে ওঠে পিতৃহৃদয়। কিন্তু এই পিতৃত্ব এক নিমেষে কঠোর কঠিন হয়ে ওঠে যখন অশ্রুর কাছে জানতে পারেন যবনেরা তাকে হরণ করেছিল, 'প্রতাপের মাথায় বজ্রাঘাত হল।'

প্রতাপসিংহ শত্রুর অশ্রুর প্রতি যত্নের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববৎ বীরত্বে জ্বলে ওঠে, কন্যার প্রতি ও নিষ্ঠুর হয়ে ওঠেন। ঘৃণিত যবন সন্তান সেলিমের প্রতি বিদ্বেষ আবারও বর্ষিত হয়–

"প্রতাপ। আর শুনতে চাই নে– কি ভয়ানক কথা! আর না জানি কি শুনতে হয়– কি বললে অশ্রুমতী– আমার যে চির-শত্রু– অস্পৃশ্য ঘৃণিত মুসলমান, তাদের যত্নে তুমি মোহিত হয়ে গেছ? সেই দুর্মতি সেলিম– যাকে সেই হলদিঘাটের যুদ্ধে আর একটু হলেই যমালয়ে প্রেরণ করেছিলেম যে দারুণ শত্রু– তার প্রশংসা তোমার মুখে আর ধরে না? কি বললে অশ্রুমতি, তোমাকে খুব যত্ন করেছিল? যত্নের অর্থ কি? যত্নের মধ্যে আর তো কিছু প্রচ্ছন্ন নেই? সেই যত্নে তুমি কৃতজ্ঞ হয়েছ? আচ্ছা তাতে ক্ষতি নাই। তার অধিক তো কিছু নয়? অশ্রুমতি, আমার এই ভীষণ সন্দেহ শীঘ্র দূর করো – এই উদ্বেগ থেকে আমাকে শীঘ্র মুক্ত করো– তুমি আমার দুহিতা অশ্রুমতী– তুমি?... ক্ষান্ত হ – যথেষ্ট হয়েছে! কেন তোর মা তোকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন? কেন হতভাগিনি, তুই প্রতাপসিংহের দুহিতা হয়ে জন্মেছিলি? আমি যে কুলসম্ভ্রম রক্ষা করবার জন্য এই পঁচিশ বৎসর কাল অনাহারে অনিদ্রায় ক্রমাগত ঘোরাঘুরি করেছি – হা ধর্ম! তার ফল কি এই হল? জানিস্ হতভাগিনি, তুই কে? জানিস, কোন্ রক্ত তোর শিরায় বহমান? বিধাতঃ, যাকে আমি অন্তিম কালের একমাত্র সান্ত্বনাস্থল মনে কচ্ছিলেম – সে প্রাণের দুহিতাকে কি না তুমি শত্রু করে পাঠিয়ে দিলে – আমার সব যন্ত্রণা উপশম হয়েছিল – বৈদ্যরাজ – আবার সেই বেদনা – ওঃ!" [৩০]

(পঞ্চম অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

কন্যাও সেলিম স্পর্শে রাজপুতকূলের কলঙ্ক লেপন করেছে এই বিশ্বাসে কন্যাকেও যেন শত্রুবৎ বলে মনে হয় প্রতাপের। বংশগৌরবকে এভাবে ক্ষুন্ন করায় বীর প্রাণ প্রতাপের যেন চরম পরাজয় ঘটে।

কন্যাকে স্পর্শ করতেও তার ঘৃণা। '... ও কলঙ্কিত হস্তে আমাকে স্পর্শ করিস নে।' এখানে প্রতাপকে সংস্কারছন্ন বলে কিছুটা মনে হলেও স্বদেশভূমির প্রতি সম্মান প্রদর্শন অনেক বেশি তীব্র সেই বার্তায় [৩১] এখানে উঠে আসে। এ প্রসঙ্গে অজিতবাবুর মতামতও সমর্থন যোগ্য, "অশ্রুমতীর পক্ষে সেলিমকে ভালবাসা অন্যায় নহে, কিন্তু সেই ভালবাসা যে পিতার আদর্শ ও গর্বকে আঘাত করিয়া ছোট করিয়া দিয়াছে ইহাতেই দর্শকের মন অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহী হইয়া উঠে। আরও একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে। মানসিংহ প্রতাপের অবমাননার প্রতিশোধ দিবার জন্য অশ্রুমতীকে অপহরণ করাইয়া, ফরিদের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া প্রতাপের কুলগৌরব নষ্টে করিতে চাহিয়াছিলেন। সেলিমকে

হৃদয় দান করিয়া অশ্রুমতী স্বেচ্ছায় মানসিংহের সেই সংকল্পে পরোক্ষভাবে সাহয়তা করিয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেকে সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে অশ্রুমতী ভীলদের মধ্যে পালিত হইয়াছিল সুতরাং পিতার আদর্শ ও গৌরব সে জানিত না।"[৩২]

প্রতাপের স্বদেশকে যে জাতি কলুষিত করেছে, ভূ-লুন্ঠিত করেছে সেই জাতির প্রতি যে কন্যার ঘৃনা হওয়া উচিত ছিল সেই কন্যার মুখে তাদের স্তুতি শুনে স্বদেশপ্রাণ বীরের এমন আচরণ অত্যন্ত স্বাভাবিক। স্বদেশপ্রেমে অন্ধ প্রতাপ কোনো কিছুর বিনিময়েই স্বদেশকে অমর্যাদা করতে দেন নি। তাই শক্তসিংহের কাছে যখন জানতে পারলেন যে অশ্রু নিঃকলঙ্ক। তখনও রুগ্ন প্রতাপ কিছুটা আশ্বস্থ হন। তাই –

"প্রতাপ। শক্তসিংহ, ওর মনেও যদি কোনোরূপ কলঙ্ক স্পর্শ করে থাকে – আমি সে কণামাত্র কলঙ্কও – ওর বিবাহ দিয়ে কুলপরম্পরায় প্রবাহিত করতে চাই নে।"[৩৩]

(পঞ্চম অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

চিরকুমারী হয়ে যোগিনীব্রত পালন করার নির্দেশ দিলেন। অশ্রু আজ প্রেমহীন। পিতা-মাতার স্নেহবঞ্চিত তাই পিতার আদেশকে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নেয়। তবুও অশ্রুর এমন পরিণতি দর্শককে ব্যথিত করবে সেকথা সত্য। অশ্রুর এই হঠাৎ যোগিনীব্রত আসলে চতুর্থ অঙ্কে প্রথম গর্ভাঙ্কে প্রতাপ যে স্বপ্ন দেখেছেন তাতেও 'রক্তবস্ত্র পরিধান করে চিতোরের জন্য প্রাণবিসর্জন' চণ্ডাবৎকূলের যেমন পুত্রকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এখানে যেন অনুবর্তন ঘটেছে। প্রতাপসিংহের এ সিদ্ধান্তে ও তাই স্বদেশের জন্য আত্মবলিদাকেই সূচিত করে। ফলে "নাট্যকার যদি প্রতাপসিংহের বীরত্ব ও স্বার্থত্যাগের চিত্র অঙ্কন না করিতেন তবে অশ্রুমতীর কাহিনী যে ভাবে ইচ্ছা গঠন করিবার স্বাধীনতা তাঁর ছিল। কিন্তু প্রতাপসিংহের সুমহান, স্বদেশহিতব্রতী চরিত্র সতত দর্শকের মনে জাগরূক থাকাতে, তাঁহার কন্যার প্রেমকে আর আলাদা, বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না। যে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতাপ মৃত্যুপণ সংগ্রাম করিয়াছেন, যাহাকে তিনি নিজের এবং স্বদেশের ঘোরতর শত্রু মনে করেন, তাঁহাকেই যখন প্রাণসমা কন্যা আত্মদান করিয়া বসিল, থকন যে প্রতাপের অভ্রভেদী গৌরবচূড়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল তাহতে সন্দেহ নাই।"[৩৪] একথা ঠিক নয় তবে একথা স্বীকার্য অশ্রু সেলিমের প্রতি হঠাৎ যেভাবে প্রণয় সক্ত হয়ে পড়ে তাতে কিছুটা হলেও মধ্যবর্তী সময়ে দর্শক বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কিন্তু নাট্যকার অশ্রুমতীকে পরিণতিতে এমন এক স্থানে দাঁড় কিরয়ে দিলেন যাতে সে বিদ্রোহ প্রশমিত হওয়ার কথা। পিতার ঐতিহ্য, দেশের মূল্য বুঝতে না পারার প্রায়শ্চিত্য করতে হয়েছে তাকে যোগিনী ব্রতের মাধ্যমে।

মৃত্যুর একেবারে শেষ লগ্নে প্রতাপের মধ্যে স্বদেশ চিন্তা মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে তার উক্তি –

"প্রতাপ। আমার দেশ তুর্কের হস্তে কখনোই সমর্পিত হবে না– এই আশ্বাসবাক্য তোমাদের মুখে শোনবার জন্যই আমার অন্তরাত্মা দেহ হতে এখনও বেরোতে বিলম্ব কচ্ছে।...

আমি যে কঠিন ব্রত অবলম্বন করেছি, তাতে যে-সব ভয়ানক কষ্ট ও কঠোরতা সহ্য করা আবশ্যক, অমরসিংহ কখনোই তা সহ্য করতে পারবে না। আমি দেখতে পাচ্ছি —এই সকল সামান্য কুটির ভগ্ন হয়ে তার স্থলে তখন চাকচিক্যময় সমুচ্চ প্রাসাদ সকল উত্থিত হবে – সে প্রাসাদে রাক্ষসী বিলাসলালসা, আর তার দলবল এসে প্রবেশ করবে। আর যে মেবারের স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য আমরা এতদিন আমাদের অজস্র রক্ত দিলেম, সেই স্বাধীনতালক্ষ্মীকে তখন সেই রাক্ষসীর নিকট বলি দেওয়া হবে – আর, রাজপুত প্রধানগণ তেমারও সেই বিষময় দৃষ্টান্তের অনুগামী হবে।'' ৩৫

(পঞ্চম অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

মেবারের ভাবী চিত্র মনে করে স্বদেশপ্রাণ প্রতাপ বিচলিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু তার আদর্শে প্রাণিত স্বদেশপ্রাণ রাজপুতরাও দীপ্ত কন্ঠে বলেন –

''রাজপুত-প্রধানগণ। না, মহারাজ! আপনি নিরুদ্‌বিগ্ন হোন, আমরা সকলে বাপ্পা রাও সিংহাসনের নামে শপথ করে বলছি যে যতদিন না মেবারের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার হয় ততদিন আমরা এখানে প্রসাদ নির্মাণ করতে কখনোই দেব না।'' ৩৬

(পঞ্চম অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

এমন আকাশবাণীর পর, প্রতাপের প্রাণ স্বদেশকে সুরক্ষিত রাখার ভার অর্পণ করেই মৃত্যু বরণ করেন। রাজপুতগণেরা প্রতাপও চিতোরকে এক করে ফেলেন – 'চিতোরের সূর্য অস্তমিত হল। রাজপুতগৌরব তিরোহিত হল!' প্রতাপের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মেবারের একটা যুগের পতন ঘটে। প্রতাপের রক্তের প্রতিটি বিন্দুতে স্বদেশভূমির গন্ধ, প্রতিটি পদক্ষেপে স্বদেশের পথ চলা। আপন মাতৃভূমিকে রক্ষা করার এমন ব্রতে ভারতবাসী গর্বিত। তার মতো দেশপ্রিয় চরিত্র দেখে দর্শকও স্বদেশমন্ত্রে উজ্জীবিত।

ফলে আমাদের আলোচনা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে স্বদেশচেতনা – তার স্পষ্ট পরিমিত সার্থক প্রকাশ যে কোন কোন দিক দিয়ে উঠে এসেছে তা আলোচনায় দেখা গেল।

পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে অশ্রু, সেলিম, মলিনার প্রেমেয় ভয়ঙ্কর ট্রাজেডি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। অশ্রু যোগিনীব্রতে নিলেও সেলিমকে যেমন ভুলতে পারেনি, মলিনা ও উন্মাদ হয়ে মৃত পৃথ্বীকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছে, সেলিমও উন্মাদপ্রায় অশ্রুর সন্ধানে শ্মশানে শ্মশানে ভ্রাম্যমান।

ফলে প্রতাপসিংহ যেমন তার ইচ্ছাপূরণে চরম ক্লীচ্ছ সাধন করলেও তা পূর্ণ করতে পারেননি। অশ্রু-মলিনাও প্রেমের গান গাইলেও তা সার্থকতা পায়নি। স্বদেশপ্রেম বা রোমান্টিকপ্রেম উভয়েরই পরিণামে ট্রাজেডি এসেছে। প্রতাপ চরিত্র চিত্রনে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করতে নাট্যকারের উদ্দেশ্যকে এর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় সফল হয়েছে।

'অশ্রুমতী' নাটকের গান প্রসঙ্গ ঃ-

সমগ্র 'অশ্রুমতী' নাটকে মোট সাতখানি গান ব্যবহৃত হয়েছে। যথা –

১. 'অগতির তুমি গতি বিশ্বমাতা ভগবতী!
ডাকি তোমা সকাতরে পিতা পুত্র দ্বারা সতী॥' – (প্রথম অঙ্ক / পঞ্চম গর্ভাঙ্ক)

২. 'এ সুখ বসন্তে এই কেন লো এমন
আপন – হারা বিষণা আহা-মরি' – (তৃতীয় অঙ্ক / তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)

৩. 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে' – (তৃতীয় অঙ্ক / তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)

৪. 'ছেড়ে দে ছেড়ে দে আমার পাখি
(আমার সাধের পাখি)।' – (চতুর্থ অঙ্ক / সপ্তম গর্ভাঙ্ক)

৫. 'প্রাণপণে প্রাণ সঁপিলাম যারে
সেই হন্তারক প্রাণে।..... ' – (চতুর্থ অঙ্ক / নবম গর্ভাঙ্ক)

৬. 'এখনো এখনো প্রাণ, সে নামে শিহরে কেন,
এখনো হেরিলে তারে কেন রে উথলে মন।...' – (চতুর্থ অঙ্ক /পঞ্চদশ গর্ভাঙ্ক)

৭. 'প্রেমের কথা আর বোলো না
আর বোলো না,... ' – (পঞ্চম অঙ্ক /দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

সাতটি গানের মধ্যে নাট্যকার তিনটি রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণ কুমারী দেবী দুটি, গীতিকার বন্ধু অক্ষয় চন্দ্রের রচনা –

এ নাটকের সাতটি গানের মধ্যে তিনটি মাত্র স্বরচিত। অন্য চারটি অনুজ রবীন্দ্রনাথ লিখিত এবং 'এখনো এখনো প্রাণ'-এর রচয়িতা ছোটোবোন স্বর্ণকুমারী দেবী। 'ক্যায়সে কাহারোয়া জাল বিনুরে' সেকালে প্রচলিত হিন্দি ঠুমরি গান, 'এ সুখ বসন্তে সই' এবং 'প্রেমের কথা আর বোল না' বন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচিত।

প্রথম গানটি প্রতাপসিংহ মহিষী ও দুই জন বালকের কন্ঠে সমবেত সুরে গীত হয়েছে। শেষ গানটি অশ্রুমতীর। বাকি পাঁচটি গান গীত হয়েছে মলিনার কন্ঠে। কেবলমাত্র প্রথম গানটিতেই স্বদেশবন্দনা আছে। বাকি গানগুলি রোমান্টিক প্রেক্ষাপটে গীত হয়েছে।

মেবারের প্রান্তভাগে প্রতাপসিংহ ও মহিষী ভগবতী মন্দিরে সম্মুখে অবস্থিত। মেবার ত্যাগ করার যন্ত্রণায় প্রতাপ যখন দগ্ধ, দেশের গৌরব, স্বাধীনতা রক্ষা করতে না পারার জন্য যখন গ্লানি মগ্ন,

যখন আকবরের সন্ধিকে উপেক্ষা করেছেন বীরত্বের সঙ্গে তখন একমাত্র শেষ ভরসা দেবী ভগবতী। দেবীর কাছে চিতোরের পুনোরুদ্ধারও স্বাধীনতা আসার জন্য প্রার্থনা করেন –

''অগতির তুমি গতি বিশ্বমাতা ভগবতি!
ডাকি তোমা সকাতরে পিতাপুত্র দারা সতী।
উপায় নাহিক কোনো, হারালাম রাজ্যধন
ও-পদে দাও শরণ ভকতের এ মিনতি।
তোমার সেবক হয়ে মর্তমানবের ভয়ে
হব কি মা নতশির? যেন না হয় ও দুর্মতি।
বরঞ্চ গো বনে বনে, বেড়াইব মরুভূমে,
মরিব মা অন্ন বিনে, সহিব না অবনতি।
যদি কভু দাও দিন (এবে মাতঃ বলহীন)
চিতোর দেখিবে পুন চিতোরাধিপতি॥'' ৩৭

(তৃতীয় অঙ্ক/প্রথম গর্ভাঙ্ক)

গানের প্রতিটি কথায় আছে স্বদেশমুক্তির প্রার্থনা। কোনো প্রতিকূলতা বা শত্রুর কাছে কোনোভাবেই অবনত যেন হতে না হয় এমন প্রার্থনা করেন। চিতোরের সম্মানকে ক্ষুন্ন রাখতে চরম জীবনযন্ত্রনা ভোগ হোক তবুও প্রতাপ প্রস্তুত। স্বদেশমাতৃকার প্রতি প্রবল অনুরাগবশত এ গানের অবতারনা।

গানটি শুধু 'ড্রামাটিক রিলিফ' হিসাবেই নয়, স্বদেশমাতৃকাকে শত্রুমুক্ত করতে প্রতাপসিংহ যে পণ করেছিলেন, সে পণ থেকে সরে আসার কোনো দুর্মতি যেন না হয় তা যেন আরেক বার দেবীর সামনে বলে নিজের অবস্থানকে দৃঢ় করে নিলেন। অন্নবিনে মৃত্যু শ্রেয় তবুও শত্রুর কাছে নত না হওয়ার সংকল্পের মধ্যে তাঁর বীরত্ব ও দেশপ্রেমের তীব্রতাকেই এখানে সূচিত করা হয়েছে।

এ গানটি নাট্যকার স্বয়ং রচনা করেন। বাকি গানগুলিতে মলিনা পৃথ্বীর, অশ্রু-সেলিমের প্রণয় দ্বন্দ্ব, আশা-আতঙ্ক প্রকাশিত। অশ্রুর কন্ঠে গীত গানটিতে প্রেমকে বিদায় দিয়ে যোগিনী ব্রতে একনিষ্ঠ হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন নাট্যকার। অর্থাৎ প্রণয় ও পিতৃ আদেশ এর মধ্যে পিতৃ আদেশ বা স্বদেশ মঙ্গলকামনার ব্রত পালনে সমাপ্তি। চতুর্থ অঙ্কের শেষ গর্ভাঙ্কে ভীলযুবকদের কন্ঠে গীত 'ক্যায়সা কাহারোয়া জাল বিনুরে...' সেকালের বহু প্রচলিত ঠুংরি গান, এ গানটি বিনোদনের কারণে প্রযোজ্য হয়েছে। উল্লেখ্য যে বেশিরভাগ প্রণয়গীতি সে সময়ে চরম জনপ্রিয়তা লাভ করে।

''ভারত সঙ্গীত সমাজ' এর নাট্য বিন্যাসে বারোটি গানের উল্লেখ আছে। 'ভারত সংগীত সমাজ'-এর নামাঙ্কিত ওই দুটি অভিনয়-পত্রীতে চরিত্র-পরিচয়, দৃশ্যবর্ণনা ও গানের উল্লেখ থাকলেও ভূমিকালিপি (অর্থাৎ কোন্ চরিত্রে কে অভিনয় করছেন) ও কোনো তারিখের উল্লেখ নেই। একটি অভিনয়-পত্রীতে দৃশ্যবর্ণনায় ছয়টি অঙ্কের অন্তর্গত মোট চব্বিশটি দৃশ্যের বর্ণনা আছে। এতে গানের সংখ্যা বারো।'' ৩৮

তবে সে গানগুলির মধ্যে 'এখনো এখনো প্রাণ সেনামে শিহরে' গানটি ছিল না। পরে তা সংযোজিত হয়। এছাড়াও উল্লেখিত আটটি গানে শিবের বন্দনা আছে। স্বদেশের বন্দনার সুর সেখানে নেই। শ্মশানের নীরবতা ও শিবের স্তুতিই সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে।

গান প্রসঙ্গে সুকুমার সেন বলেন, 'অশ্রুমতী নাটকে যে কয়টি গান আছে তাহার মধ্যে একটি রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী হইতে নেওয়া 'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে' 'প্রেমের কথা আর বলোনা' ইত্যাদি গানটি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচনা। আরো দু'একটি গান ইহারই রচনা বলিয়া অনুমান করি।[৩৯]

ফলে সুকুমারবাবু যে দু'একটি গান অক্ষয়চন্দ্রের রচনা বলে মনে করেন তা মূলত নয়।

'অশ্রুমতী' নাটকটিকে কোনোভাবেই ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। এটি স্বদেশপ্রেমের নাটক। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রেমের কাহিনি। একথায় স্বদেশ প্রীতিমূলক রোমান্টিক নাটক। ইতিহাসের একমাত্র চরিত্র প্রতাপের বীরত্ব একশ শতাংশ সার্থকভাবে প্রযোজ্য হয়েছে। কাহিনির শুরুতে টডের রাজস্থানের উল্লেখে একথা বলা যায় নাট্যকার স্বদেশপ্রেমকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন বেশি। "... অশ্রুমতী' নাটকের ললাটদেশে টডের 'রাজস্থান' হইতে উদ্ধৃতি দেখিয়া সহজেই অনুমান করা হয় যে নাট্যকার 'রাজস্থান' গ্রন্থস্থ প্রতাপ-সিংহের অতুলনীয় স্বদেশপ্রেমের কাহিনী অবলম্বন করিয়া নাটক লিখিয়াছেন।"[৪০]

অর্থাৎ নাটকটির মূল উদ্দেশ্য অধিক সংখ্যক দর্শককে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার। তাই কল্পিত চরিত্র অশ্রুমতীর মধ্য দিয়ে প্রণয়ঘন মুহূর্তে তৈরি করে প্রতাপের বীরত্বকে প্রদর্শন করিয়েছেন।

সমকালে এ নাটকটিকে নিয়ে যে দুটি প্রধান সমস্যা তোলপাড় করে তা হল –

১. 'অশ্রুমতীর' কাহিনি ঐতিহাসিক নয়।

২. অশ্রু-সেলিমের প্রণয় হিন্দুসমাজে আঘাত করে।

প্রথম সমস্যাকে এভাবেই নিরসন করা যায় যে, ইতিহাসের বীর চরিত্র নিয়ে স্বদেশপ্রেমকে তুলে ধরায় নাটকটির একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই এটি ঐতিহাসিক নয় স্বদেশপ্রেমের নাটক। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করতে নাট্যকারের এ স্বাধীনতা আছে। তবুও নাট্যকারকে একাধিক বিতর্কের সম্মুখিন হতে হয় – নিচে তা দেখানো হল – কেশবচন্দ্র মিশ্রের পত্র –

এক।। প্রথমটি লিখিত হয় ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯০১ –

"Myself and several prominent members of the Library have carefully gone through your book entitled 'Asrumati' and find therein, to our great astonishment, that Maharana Pratap Singh, the greatest of the Hindu sovereings, had a daughter in the person of Asrumati, who deeply fell in love with a Mahomedan prince. Would you please let us know the source from which you have got your information in connection with it."[৪১]

দুই।। দ্বিতীয় পত্রটি ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০১ –

"Whilst much admiring the style, diction and poetry of your drama 'Ashrumati' I am constrained to say that it is proper to associate prominent historical characters with matters quite foreign to them. Everything has its limits, and even dramatic & poetical imagination with its great latitude is no exception to it. Considering the great regard which the Rajputs have for their religion and the spirit of exemplary independence possessed by the great Maharana Pratap Singh, the story of his alleged daughter. Ashrumati's love for the Mahomedan prince Salim, based upon pure imagination is a slur cast on the sacred memory of the Maharana, who has been highly revered by the Hindu society. In the eyes of many persons reading the drama, the noble and lofty ideas and notions, rightly entertained and cherished by them, towards that great Rajput are apt to be sullied; and in the interest of history and justice. It is highly desirable that nothing should be done to lower him in the estimation of the Hindu public. I trust that you will please see your way to stop either further publication of the book or to substitue some fictitious character in the place of the much esteemed name of Maharana Pratap Singh." [৪২]

তিন।। রামকৃষ্ণ বর্মা (ভারত জীবন প্রকাশনা) জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে ২৯ অক্টোবর ১৯০১ চিঠিতে বলেন, "আপনার রচিত 'অশ্রুমতী' নাটক আমি নিজ খরচে ছাপাইয়াছিলাম, কিন্তু কতিপয় পত্রে উহার কুৎসা রটাইয়া আমাকে বাধিত করিলে যে ভবিষ্যতে যেন আর বিক্রয় না করি। তন্নিমিত্ত আমাকে প্রতুল অর্থহানি সহ্য করিতে হইয়াছে।" [৪৩]

চার।। পাঁচকড়ির বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০ নভেম্বর ১৯০৩ পত্রে জনান, "... আপনি বাঙ্গালীর শিরোমণি —বাঙ্গালী জাতির মঙ্গলকামনা আপনি করিয়া থাকেন, বাঙ্গালী জাতির উন্নতির পথ প্রশস্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে আপনি নানবিধ ত্যাগস্বীকারও করিতে পারেন, বিশেষ, আমার আপনার উপর একটু আব্দার চলে, তাই সাহস করিয়া এত কথা লিখিতে পারিতেছি। সত্য বটে, নাটকের হিসাবে 'অশ্রুমতী'তে কোন দোষ নাই, সত্য বটে নাটককারের সকল দেশেই যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে, সে স্বাধীনতার আপনি কোথাও অপব্যয় করেন নাই, তথাপি যখন একটা অছিলা ধরিয়া দুষ্ট হিন্দুস্থানী লেখকগণ বাঙ্গালী জাতির প্রতি বিষম বিদ্বেষের উদগার করিতেছে, তখন একটু সাবধান হইলে, একটু নরম হইলে বাঙ্গালীরাই পক্ষে শ্লাঘার কথা হইবে, জানিবেন। আমি শুনিলাম যে, পূর্বে আপনি উদয়পুরের কোন এজেন্টের নিকট স্বীকার পাইয়াছিলেন যে, অশ্রুমতীর নূতন সংস্করণে আপনি ভাব বদ্‌লাইয়া দিবেন। বোধ হয়, হিন্দী বঙ্গবাসীতে ও ভারতমিত্রে এ কথা প্রকাশিতও হইয়াছিল। যদি আমার খবর ঠিক হয়, তাহা ইহলে এমন অনুমান করা আমার পক্ষে অন্যায় হইবে না যে, আপনি মহারাণা বাহাদুরের

নিকট ত্রুটি স্বীকার করিয়া পত্র লিখিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। একখানি চিঠিতে সৌজন্য ও শিষ্টাচারের ভাষায় রাণা প্রতাপবংশাবতংস বর্ত্তমান মহারাণা ফতেহ সিংহ মহোদয়ের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিতে বোধ হয় আপনার সঙ্কোচ বোধ হইবে না। বিশেষ যখন এইরূপ করিলে একটি প্রবল জাতি সম্প্রদায়ের amour propre র পুষ্টি হইবে এবং বাঙ্গালী জাতির সদ্ভাবের সূচনা করা হইবে, তখন আপনার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি এ ব্যাপারে সঙ্কোচ করিতেই পারেন না।

মহারাণা বাহাদুরকে সরাসরি আপনি পত্র লিখিলে হয়ত তাঁহার হস্তগত না হইতে পারে। আপনি যদি ত্রুটি স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন ত' আমাকে বলিবেন, আমি যোগ্য লোকের দ্বারা আপনার পত্র "খোলা দরবারে" মহারাণার হস্তগত করাইয়া দিতে পারিব, এবং যাহাতে আপনার মর্য্যাদানুসারে রাণা-দরবার হইতে পত্রোত্তর ও অভিবাদন আপনার হস্তগত হয়, সে পক্ষেও যথেষ্ট চেষ্টা করিব। আপনি জানিবেন যে, ত্রুটি স্বীকার করিলে হিন্দুস্থানী সমাজে তথা মহারাণার দরবারে আপনার মানসম্ভ্রমের বৃদ্ধিই হইবে। আমি "সাহিত্য-পরিষদে"র সম্পাদক মহাশয়ের নিকট এই ব্যাপার অবলম্বন করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছি। যদি বাঙ্গালী বুধমণ্ডলীর পক্ষ হইতেও এই ব্যাপার লইয়া মহারাণার প্রতি সমাদর প্রদর্শন করা হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতির প্রতিষ্ঠা রাজস্থানে বাড়িয়াই যাইবে।"[৪৪]
'ভারতমিত্রের' সম্পাদক ও একই অভিযোগ তোলেন।

অর্থাৎ অশ্রুর প্রেম ও প্রতাপসিংহের বীরত্বের এমন সংমিশ্রণ শুধু বাংলাদেশে নয়। জনপ্রিয়তার কারণে অনুদিত গুজরাটীতে এর তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হয়। বাঙালি সম্পর্কে ভুল বার্তা অবাঙালিকে স্পর্শ করে। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি থেকে তা বোঝা যায়। পত্রকার নাট্যকারকে সংশোধন করার চমৎকার উপায়ও বলেন, ৩০ নভেম্বর ১৯০৩ (১৪ অগ্রহায়ণ ১৩১০) পত্রে জানান –

"গত কল্যকার তারিখের 'রঙ্গালয়' পত্রে দুইটি প্যারা আছে, উহাতে বাঙ্গালী গ্রন্থকারের দায়িত্বের কথা তুলিয়া আপনার 'অশ্রুমতী'র কথাও লেখা আছে। ব্যাপার এই যে, 'রাজস্থান সমাচার' নামক হিন্দী কাগজে এবং সেই সঙ্গে 'বেঙ্কটেশ্বর সমাচার' প্রভৃতি অন্য সকল হিন্দী কাগজে আফনার 'অশ্রুমতী'র কথা ধরিয়া বাঙ্গালী জাতির বিরুদ্ধে বিষম আন্দোলন চলিতেছে। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে অশ্রুমতীর অনুবাদ হইয়া উহার অভিনয়ও চলিতেছে। এই অভিনয় কারণ লোকের মনে অনায়াসেই বাঙ্গালী বিদ্বেষ যেন দৃঢ়ীভূত হইতেছে। যে সকল হিন্দুস্থানী লেখক-বন্ধু বাঙ্গালীর পক্ষপাতী তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে বলিতেছেন যে, আপনি যদি সোজা মহারাণা উদয়পুরকে পত্র লিখিয়া ত্রুটি স্বীকার করেন এবং প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেন যে, ভবিষ্যতে নূতন সংস্করণ করিতে হইলে অশ্রুমতীর ভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া দিবেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান কালের আন্দোলনটা একেবারেই নিভিয়া যায়। উদয়পুরের বর্ত্তমান মহারাণা ফতেহ সিংহ বাহাদুর বড়ই যোগ্য ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি আপনার স্বাক্ষরিত একখানি পত্র পাইলে জ্ঞাতি-কুটুম্বদিগকে শান্ত রাখিতে পারেন। রাজস্থানে একটা ক্ষত্রিয়-সভা হইয়াছে। এই সভার সদস্য 'রাজওয়াড়ার' সকল করদ নৃপতি ; এই সভার প্রতাপও খুব। বাঙ্গালী-বিরোধের আন্দোলনটা এই সভাই গ্রহণ করিয়াছে। তাই আশু কুফল ফলিবে বলিয়া আমার আশঙ্কা।"[৪৫]

নাট্যকারের সামনে বলবৎ নাট্য নিয়ন্ত্রণের ফরমান। তাই নাট্যকারমূলত রোমান্টিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে স্বদেশপ্রেমের উন্নপ্রবাহ দর্শকমনে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। নাটকটিতে নারী পুরুষ ভৃত্য সকলকে দেখানোর জন্য তাই নাট্যকার ব্যবস্থা করেন – "১৮৮০র প্রাক মুহূর্তের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'অশ্রুমতী নাটক' নাটক দেখবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেঙ্গলের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থা করেন। যাতে সেদিন শুধুমাত্র ঠাকুর বাড়ির মেয়ে-পুরুষেরাই ঠাকুর বাড়ির ছেলের লেখা নাটক দেখতে পারে।"[৪৬]

অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "অশ্রুমতী অভিনয় হল, বাড়ির মেয়েরা কেউ দেখতে পেলেন না। তখন পাবলিক স্টেজে গিয়ে মেয়েরা দেখবে, এ দস্তুর ছিল না। কী করা যায়। বাবামশায় (গুনেন্দ্রনাথ) বললেন, পুরো বেঙ্গল থিয়েটার এক রাতের জন্য ভাড়া নেওয়া হোক। কেবল আমাদের বাড়ির লোকজন থাকবে সেদিন। অ্যাক্টাররা ছাড়া বাইরের লোক আর-কেউ থাকবে না।

সেই প্রথম মেয়েরা ছাড়া পেলে পাবলিক স্টেজে থিয়েটার দেখতে। ছয় বছরের শিশু আমার মতো, (জন্ম ১৮৭১। আসলে তখন তার বয়স ছিল আট) আর অনেক বুড়িদেরও সেই প্রথম থিয়েটার দেখা। অনেক টাকা খরচ করে একদিনের জন্য স্টেজ ভাড়া করা হল, বেঞ্চিটেঞ্চি নয়, ও-সব সরিয়ে বাড়ির বৈঠকখানা থেকে আসবাবপত্র নিয়ে হল্‌ সাজানো হল। নীচে কার্পেট পেতে ইজি-চেয়ার, ফুলের মালা, আলবোলা, মেয়েদের জন্য চিকের ব্যবস্থা – ঠিক যেন আটচালা সাজানো হয়েছে। স্টেজের অডিটরিয়াম ঘর হয়ে গেল। ছোটোদিদিমা ত্রিপুরাসুন্দরী আছেন, বাড়ির ছেলেমেয়ে কেউ বাদ যাবে না, সবাই যাবে – আমরাও অনুমতি পেলুম থিয়েটার দেখবার। ঘর হয়ে গেছে, ঘরে বসে দেখব, আপত্তির কী আছে। সবাই গেছি, রামলাল চাকর আমাকে স্টেজের বাঁ দিকে প্রথম 'রো'তে– 'রো' বলে কিছু ছিল না, আমাদেরই চেয়ার দিয়ে সাজানো হয়েছিল ঘর – তবু রামলাল আমাকে স্টেজের সামনেই বসিয়ে দিলে, ছোটো ছেলে ভালো করে দেখতে পাব।...

বাসে আছি, ড্রপসিন পড়ল, তাতে আঁকা ইউলিসিসের যুদ্ধযাত্রা। রাজপুত্তুর নৌকাতে চলেছে, জলদেবীদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, পিছনে পাহড়ের সার – গ্রীক-যুদ্ধের একটা কপি। কোনো সাহেবকে দিয়ে আঁকিয়েছিল বোধ হয়, প্রকাণ্ড সেই ছবি। নৌকা থেকে গোলাপ ফুলের মালা ঝুলছে কী ভালো যে লাগছে, তন্ময় হয়ে দেখছি।

সিন উঠল। ভামসা মন্ত্রী ইয়া লম্বা দাড়ি, রাজপুত্তুর, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, তলোয়ারের ঝকমকানি, হাসিকান্না – ডুবে গেছি তাতে।

অভিনয় হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে কথা মুখস্ত হয়ে যাচ্ছে। মলিনা সেজেছিল সুকুমারী দত্ত। স্টেজ নাম ছিল গোলাপী, সে যা গাইত! বুড়ো বয়সেও শুনেছি তার গান, চমৎকার গাইতে পারত। মিষ্টি গলা ছিল তার, অমন বড়ো শোনা যায় না। আর কী অভিনয়, এক হাতে পিদিমটি ধরে শাড়ির আঁচল দিয়ে ঢাকতে ঢাকতে আসছে, যেন ছবিটি – এখনো চোখ ভাসছে। পৃথ্বীরাজ আর মলিনার গান, এখনো কানে বাজছে সে সুর –

এ সুখ-বসন্তে সই কেন লো এমন
আপন-হারা বিবশা –

ওইটুকু ছেলের মন একেবারে তোলপাড় করে দিলে। ভীল সর্দার সেজেছিলেন অক্ষয় মজুমদার। "এ চেনীবুড়ি" বলে যখন অশ্রুমতীর থুঁতি ধরে আধর করছে, তা ভুলবার নয়। আর ভীলদের মতো সেজে, মাথায় পালক গুঁজে তীরধনুক নিয়ে সে যা নাচলেন, আর গাইলেন –

ক্যায়্সে কাহারোয় জাল বিনুরে,
জাল বিনু, জাল বিনু, জাল বিনুরে।
দিনকো মোর মছলি, রাতকো বিনু জাল,
আর অ্যায়সা দেক্‌দারী কিয়া জিয়া কি জঞ্জাল।

এই বলে অক্ষয়বাবুর নৃত্য, এই নৃত্যতেই ছোটো ছেলেরে মন একেবারে জয় করে নিলেন। ... অশ্রুমতীও বেশ ভালো অভিনয় করেছিল। প্রতাপসিংহের অভিনয়, বাদশার ছেলে সেলিমের অভিনয়, সব যেন সত্যি সত্যিই রূপ নিয়ে ফুটে উঠছে, অভিনয় বলে মনেই হচ্ছে না। অশ্রুমতীর অগ্নিপ্রবেশ, সেলিমকে বিদায় দিচ্ছে –

প্রেমের কথা আর বোলো না
আর বোলো না,
আর তুলো না, ক্ষমো গো সখা –
ছেড়েছি সব বাসনা –
ভালো থাকো, সুখে থাকো (হে),
আর দেখা দিয়ো না (আমারে দেখা দিয়ো না), দেখা দিয়ো না।
নিভানো অনল আর জ্বেলো না (নিভানো অনল জ্বেলো না।)।

হু হু করে আমার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। অশ্রুমতরী এই গানে সব মাত করে দিলে। এই গানটায় সুর দিয়েছিলেন জ্যোতিকাকা, ইটালিয়ান ঝিঁঝিট।... বিলতি সুরে বাংলা গান, এখন মজা লাগে ভাবতে। কোত্থেকে যে সুর সব জোগাড় করেওছিলেন। এই-সব স্তব্ধ হয়ে দেখছি, অন্য জগতে চলে গেছি। অশ্রুমতী নাটকে না ছিল কী! আর কী রোমান্টিক সব ব্যাপার। মুখে কথাটি নেই, স্থির হয়ে দেখছি, হঠাৎ এক জায়গায় খটকা লাগল এই প্রথম আমার স্টেজে দেখা নাটক। তারপর বাড়ি এসে আমরা ছেলেরা কয়েকদিন অবধি কেবলই অশ্রুমতীর নাটক করছি নীচের বড়ো ঘরটিতে। কথাগুলো সব ওই এক দিনের দেখাতেই মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল।"[৪৭]

নাটকটির অভিনয় দেখার উত্তেজনা যে কত ছিল তা জানা যায় – "বেঙ্গল থিএটরে বাটীর সকল মেয়েরা অশ্রুমতী থিএটর দেখিতে জান... ", এর পরিপূরক হিসাবটি লিখিত হয় ১২ আশ্বিনে ঃ "দ অশ্রুমতী নাটক বাটীর মধ্যের সকলকে অভিনয় দেখাইবার ব্যয়... ১৪২/৩।" এই বিশষ

অভিনয় হয় ৮ আশ্বিন মঙ্গল 23 sep 1987 তারিখে; "বিশেষ অভিনয়", কেননা এদিন ঠাকুরগোষ্ঠীর লোকেরাই কেবল অভিনয় দেখতে পেয়েছিলেন।"[৪৮]

নাটকটির আলোড়ন যে মাত্রায় হয় তা একাধিক স্থানে উল্লেখিত –

"উনিশ শতাব্দীর শেষ, দু-দশক জুড়ে প্রথমে বেঙ্গল থিয়েটারে এবং পরে রয়াল বেঙ্গল থিয়েটারে বহু অভিনীত এ নাটকখানি কলকাতার সংস্কৃতিমহলে বিশেষ সাড়া জাগায়। কলকাতার বাইরেও নাটকটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে।"

'ভারতসঙ্গীত সমাজ' কর্তৃক অভিনেয়ের সময়ে স্বয়ং নাট্যকার প্রধান ভূমিকা নেন –

সে অভিনয়ে কুশীলব ছিলেন –

সেলিম	হেমচন্দ্র বসুমল্লিক
প্রতাপসিংহ	নগেন্দ্রনাথ বসুমল্লিক
আকবর	(রায়) পশুপতিনাথ বসু
পৃথ্বীরাজ	(রায়বাহাদুর) মন্মথনাথ মিত্র'

এ হেন স্বদেশপ্রেমের জনপ্রিয় নাটক সম্পর্কে যে অভিযোগ উঠেছে তার সদুত্তর দিয়েছেন নাট্যকার স্বয়ং। অভিযোগের কারণগুলি আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। এবার নাট্যকার যে উত্তর দেন তা হল –

১. কেশবপ্রসাদ মিশ্র যে প্রশ্ন রেখেছিলেন, "... Would you please let us know the source from which you have got your information is connection with it."

এবং " Everthing has its limit and even dramatic & poetical magination with is great lahtude is no exception to it ... " ইত্যাদি

নাট্যকার উত্তরে লেখেন,

"... যাঁহারা মনে করেন, এই (অশ্রু-সেলিম) ভালবাসার কথা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত, তাঁহাদের ভ্রম দূর করিবার জন্য পুনর্মুদ্রণের সময় এই বিষয়ে একটি ভূমিকা লিখিয়া দিব স্থির করিয়াছি। ইহা বুঝা উচিত, নাটক ও ইতিহাস এক জিনিস নহে। কোন দেশের কোন নাটকেই ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয় না।

যদি কেহ বলেন, প্রতাপসিংহের দুহিতা একজন মুসলমানকে ভালবাসিবে ? – দেখুন কিরূপ অবস্থায় অশ্রুমতী মানুষ হইয়াছিল – সে জানিত না – রাজপুত কে সুলমান কে। যে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করল তাকেই সে ভালবাসিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি ?"[৪৯]

অশ্রুমতীর অষ্টম সংস্করণে (১৬ নভেম্বর ১৯২০/১ অগ্রহায়ণ ১৩২৭) নাট্যকার যে জবাব দেন তাতে স্পষ্ট অশ্রুমতীর স্বর্গীয় প্রেমে পার্থিব কলঙ্ক মুক্ত যেমন রাখা হয়েছে সামান্য কিংবদন্তী নিয়ে প্রতাপসিংহকেও অশ্রুমতী চরিত্র বিন্যাস যেমন স্বাভাবিক তেমনি প্রতাপসিংহের মরণপণ স্বদেশপ্রীতিকে কীভাবে রক্ষা করেছেন –

"কেই কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, রাণা প্রতাপসিংহের অশ্রুমতী নাম্নী কন্যা ছিল কি না এবং অশ্রুমতী ও সেলিমের মধ্যে বাস্তবিক কোন প্রেমের ব্যাপার ঘটিয়াছিল কি না। ইহার উত্তরে আমার নিবেদন –

রাণা প্রতাপসিংহের একটি কন্যা আরাবল্লি পর্ব্বতের অভ্যন্তরস্থ এক টিনখানির মধ্যে হারাইয়া যায় এবং তত্রত্য ভীলগণ কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত ও প্রতিপালিত হয়। এইটুকুই ইহার ঐতিহাসিক কিম্বা কিংবদন্তীমূলক ভিত্তি। বাকী সমস্তই কপোলকল্পিত। 'অশ্রুমতী' নামও মৎপ্রদত্ত। এইরূপ নিরাশ্রয় বালিকার সৈনিকদিগের কবলে পতিত হওয়া অসম্ভব ঘটনা নহে। তাহার পর সেলিম উহাকে দস্যুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, বিশ্বাস করিয়া সেলিমের প্রতি ঐ বিমূঢ়া সরলা বালা যে কৃতজ্ঞ হইবে এবং সেলিমের যত্নাতিশয্যে এ কৃতজ্ঞতা যে ক্রমে, ভালাবাসায় পরিণত হইবে, তাহাতেও আশ্চর্য্য নাই। ইহা মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণাম। বলা বাহুল্য, স্থলবিশেষে ও অবস্থাবিশেষে মানপ্রকৃতির কিরূপ বিকাশ ও পরিণাম ঘটে তাহা প্রদর্শন করাই নাটকের মুখ্য কার্য্য। কোন মুসলমানদের প্রতি হিন্দু ললনার অনুরাগের কথা শুনিয়া কেহ কেহ আঁৎকিয়া উঠেন। যেন এরূপ ঘটনা অত্যন্ত অস্বাভাবিক, যেন এরূপ কেহ কখনও শুনে নাই, যেন ইতিপূর্ব্বে কোন উপন্যাসেই এরূপ ঘটনা বর্ণিত হয় নাই। তবে যদি কেহ বলেন, রাণা প্রতাপসিংহের দুহিতাকে এরূপ অবস্থায় ফেলিয়া রাণার শুভ্র যশকে কলঙ্কিত করা উচিত হয় নাই– তাহার উত্তরে আমার বক্তব্য– যিনি অশ্রুমতী নাটক ভাল করিয়া পড়িয়াছেন, তিনিই জানেন, যাহাতে রাণা প্রতাপসিংহের শুভ্র যশ কলঙ্কিত না হয়, যাহাতে অশ্রুমতীর বিশুদ্ধ চরিত্রে কলঙ্কের স্পর্শ মাত্র না থাকে, সে বিষয়ে আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি ও যত্নবান হইয়াছি। যথা –

'প্রতাপ। কি বল্লে শক্তসিংহ ? আমার শুভ্র যশ কলঙ্কিত হয় নি ?

শক্ত। আমি বিলক্ষণ জানি – আর তরবারি স্পর্শ করে বলতে পারি – সেলিম কর্ত্তৃক অশ্রুমতীর কোন অসম্ভ্রম হয় নি – শত্রু হলেও মুক্তকণ্ঠে আমার এ কথা স্বীকার করতে হবে। এ আপনাকে আমি শপথ করে বলছি – কোনও প্রকার কলঙ্ক অশ্রুমতীকে আজও পর্য্যন্ত স্পর্শ করে নি – আপনি যে বিষয়ে নিরুদ্বিগ্ন হোন।'

এই কথায় আশ্বস্ত হইয়া প্রতাপসিংহ বিষপ্রয়োগের আদেশ রহিত করিলেন বটে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে কঠোর যোগিনী-ব্রত পালনের আদেশ করিলেন।

'শক্তসিংহ – ওর মনেও যদি কলঙ্ক স্পর্শ করে থাকে – আমি সে কণামাত্র কলঙ্কও এর বিবাহ দিয়ে কুলপরম্পরায় প্রবাহিত করতে চাই নে।'

অতএব দেখা যাইতেছে, এইরূপ আদেশ করিয়া রাণা প্রতাপসিংহ স্বকীয় শুভ্র যশকে অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন, এবং অশ্রুমতীর আচরণ হইতে ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে – অশ্রুমতীর স্বর্গীয় প্রেমে কোন পার্থিব কলঙ্কের স্বর্শমাত্র হয় নাই।'' [৫০]

সুতরাং নাট্যকার যেভাবে উপস্থিত অভিযোগের সামনা সামনি হয়ে প্রতাপসিংহের বীরত্ব নিয়েই প্রতাপের অবস্থানকে উল্লেখ করলেন তাতে নাটকটিতে যে স্বদেশপ্রেমের নাটক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর ভারতমিত্র পত্রিকায় অভিযোগকে খণ্ডন করতে নাট্যকার লেখেন –

''মহারাণা প্রতাপসিংহকে আমি আরাধ্য দেবতার ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। তাঁহার বীরত্ব, তাঁহার মহত্ত্ব, তাঁহার সহিষ্ণুতা, তাঁহার কুলনিষ্ঠা, তাঁহার দেশভক্তি আমাদের আদর্শস্থল। চরিত্রের এই উচ্চ আদর্শ বঙ্গবাসীর সম্মুখে অর্পণ করাই এই নাটক রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমি স্বীকার করি, 'অশ্রুমতী' বলিয়া প্রতাপ সিংহের কোন কন্যা ছিল না। ইহা আমার কল্পনা মাত্র। আমার এইমাত্র বক্তব্য, এই নাটকে যে কল্পিত ঘটনাবলী যোজিত হইয়াছে। যখন প্রতাপসিংহ আসন্ন মৃত্যু-শয্যায় শরণ হইয়া শক্তসিংহের নিকট শুনিলেন যে সেলিম পাপ-হস্তে অশ্রুমতীকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করে নাই, তখন তিনি তাহার প্রাণনাশ করিতে ক্ষান্ত হইলেন বটে, কিন্তু অশ্রুমতীর মনেও পাছে কোন কলঙ্ক স্পর্শ হইয়া থাকে – এই আশঙ্কায় তিনি তাকে চিরকুমারী-ব্রত গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। ইহা অপেক্ষা অটল কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে ?

আর এক কথা। যদি বলেন, রাজপুত-মহিলা হইয়া অশ্রুমতী কি করিয়া একজন বিধর্ম্মী মুসলমানকে ভালবাসিল, সে বিষয়ে আমার বক্তব্য এই; – অশ্রুমতী অতি শিশুকালেই নিরুদ্দেশ হয় এবং বহুকাল ভীলদের নিকটে থাকায় এবং তাহাদের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ায়, নিজের কুলধর্ম্মজ্ঞান তাহার মন হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল; সে জানিত না– কে রাজপুত, কে মুসলমান। সেলিম তাহাকে দস্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে মনে করিয়া তাহার প্রতি প্রথমে সে কৃতজ্ঞ হয়, পরে সেই কৃতজ্ঞতা প্রেমে পরিণত হয়। ইহা তাহার পক্ষে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে। এবং কি অবস্থায় পড়িয়া অশ্রুমতী রাজপুত মহিলার অযোগ্য কাজ করিয়াছিল, তাহা যদি বিবেচনা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে অশ্রুমতীকেও দোষ দেওয়া যায় না। আর এক কথা, অশ্রুমতী সেলিমকে মনে মনে ভালবাসিয়াছিল – শুধু ইহাতেই প্রতাপসিংহের কুলে কলঙ্ক আসিতে পারে না। এবং মনে মনে ভালবাসাতেও যদি কিছু কলঙ্ক হইয়া থাকে, অশ্রুমতী চিরকুমারী-ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করায় প্রতাপ সিংহ সে কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

এই নাটকের প্রতি লেখকের যেরূপ আন্তরিক বিদ্বেষ ও বিরাগ তাহাতে বলিতে সাহস হয় না, আর একবার যেন তিনি এই নাটকখানি ধীরভাবে পড়েন – আমার বিশ্বাস, আর একবার ভাল করিয়া পড়িলে তিনি আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন।

এই নাটকে ঐতিহাসিক ভুল ও অসংলগ্নতা থাকিতে পারে, কিন্তু এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, বীরশ্রেষ্ঠ মহারাণা প্রতাপসিংহের উপর আমার যে শ্রদ্ধাভক্তি তাহা কাহারও অপেক্ষা কম নহে।'' [৫১]

সুতরাং নাট্যকার যেভাবে উত্থিত অভিযোগের সামনা-সামনি হয়ে প্রতাপসিংহের বীরত্ব নিয়েই প্রতাপের অবস্থানকে উল্লেখ করলেন তাতে নাটকটি যে স্বদেশপ্রেমের নাটকতা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্লেষণ কালে দেখেছি, নাট্যকার সেই স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করতে যথেষ্ট সার্থক। নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন ও দর্শকরুচিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে অশ্রুমতী নামকরণ করা হলেও প্রতাপের প্রাধান্য বীরত্ব, দেশপ্রীতি সীমিত গণ্ডীর মধ্যে সফলভাবেই রূপায়িত হয়েছে, "... অশ্রুমতীতে দেশপ্রেমের পটভূমিকায় পিতৃপরায়ণতার সহিত প্রেমের বিরোধ অভিব্যক্ত।" [৫২]

ফলে অশ্রুমতীর সংযোজনে প্রতাপের গর্ব ক্ষুন্ন হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন তা নাট্যকারের স্বগতোক্তিও বিশ্লেষণ দেখলে সে অভিমত টেকে না। নাট্যকার যদি না অশ্রুকে প্রেমের ট্রাজেডির সম্মুখে না ফেলতেন তবে প্রতাপচিত্র ক্ষুন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকত। ব্যক্তিপ্রেমের যে কোনো মূল্য নেই স্বদেশের গৌরব রক্ষায় সেই দৃঢ়তার শেষ পর্যন্ত প্রতীয়মান হয়েছে।

তবে অশ্রুমতীর এমন পুতুলপানাভাব সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। তার চরিত্র বিকাশে নাট্যকারকে তার সদুত্তর দিতে হয় —অজিত ঘোষ সঙ্গত কারণেই বলেন।

"সেলিমের বন্দিনী হইয়া যখন সে বাস করিতেছিল তখন সে যথেষ্ট সেয়ানা হইয়াছে, কামদেবের রীতিনীতি বুঝিতে পারিয়াছে, কেবল এইটুকু বুঝে নাই যে তাহার প্রেমাস্পদ তাহারই পিতার ঘৃণিত শত্রু। প্রকৃতপক্ষে 'Love is ever blind' এই নীতি দেখাইয়া অশ্রুমতীর প্রেমকে সহানুভূতির চোখে দেখা যাইত যদি নাট্যকার তাহার মনে মধ্যে প্রেম এবং কর্তব্যের দ্বন্দ্ব দেখাইতে পারিতেন। কিন্তু অশ্রুমতী সেলিমের প্রেমে এতই সমাহিত হইয়া পড়িয়াছে যে নিজের পরাধীন অবস্থাতেও তাহার কোনো অ-সুখ নাই, এবং পিতামাতা ও স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও তাহার কেনো অসন্তোষ কিংবা অশান্তি নাই। সেলিম তাহাকে নিতান্ত অন্যায়ভাবে হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছে, ইহাতেও তাহার মনের মধ্যে কোনো অভিমান কিংবা অভিযোগ উপস্থিত হয় নাই, পিতার সুকঠোর আদেশ স্বত্বেও সে তাহার প্রণয়াস্পদকে ভুলিতে পারে নাই — এই সব কারণে তাহা প্রেমের মধ্যে একটা আত্যন্তিক হীনতা এবং বিরক্তিকর দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়।" [৫৩]

এ মত সম্পূর্ণ গ্রহণ যোগ্য। যদিও নাট্যকার বলেছেন — "... মনে মনে ভলোবাসাতেও যদি কিছু কলঙ্ক হইয়া থাকে, অশ্রুমতী চিরকুমারী ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত করায় প্রতাপসিংহ সে কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইয়াছেন।" কিন্তু দর্শকমনে অশ্রু সম্পর্কে একটা বিরূপ ধারণার সামান্য ছিটেফোটাও থেকে যায়।

অর্থাৎ প্রতাপসিংহের বীরত্ব, সাহস, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মাতৃভূমির গৌরব রক্ষার অক্লান্ত চেষ্টা দেশবাসীকে স্বদেশচেতনায় উদ্দীপ্ত করে —একথা অনস্বীকার্য। অশ্রুর অপহরণ ও শত্রুকে প্রণয়াসক্ত হওয়ার ফলে তাৎক্ষণিক প্রতাপ কলঙ্কলিপ্ত মনে হলেও পরিণতিতে তার নিরসন — একথাও স্বীকার্য। তবে অশ্রুর এই সত্য-মিথ্যা না বুঝতে পারাটা কিছুটা অবাস্তব হলেও বীরকাহিনি বিস্তারে সেই অবাস্তবতা স্পর্শ করতে পারেনি। প্রেমের অপমৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে তার 'ইমম্যাচুরিটির' ঋণশোধ

করে। প্রতাপ থেকে যান প্রতাপেই। পাশাপাশি পৃথ্বীসিংহ চরিত্রটিও প্রতাপেরযোগ্য ভ্রাতার পদ অলংকৃত করেছেন। তার ভ্রাতৃবৎসল এবং কুলরক্ষার প্রয়াস দর্শককে মোহিত করে।

সুতরাং 'অশ্রুমতী' মূলত রোমান্টিক প্রণয় কাহিনির পাশাপাশি পূর্বের নাটকগুলির মতো স্বদেশপ্রেমের বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। প্রতাপসিংহের কাহিনির মধ্যে দেশপ্রীতি এবং অশ্রু সেলিমের কাহিনির মধ্যে রোমান্টিক কাহিনিকে যুগপদ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। একসময় রোমান্টিক পরিমণ্ডলে প্রতাপসিংহের প্রবেশ ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত প্রতাপের প্রতাপে প্রেম গৌণ হয়ে স্বদেশানুরাগ মুখ্য স্থান লাভ করেছে। নাট্যকারের উদ্দেশ্য ইতিহাসের বীর কাহিনিকে বাঙালির সামনে তুলে ধরে স্বদেশপ্রেম জাগরণ তা এই নাটকে শুধু সার্থক নয়, পূর্ণমাত্রায় সার্থক হয়েছে। নাট্যকারের জীবনের নানান ঘটে যাওয়া ঘটনার মধ্যে, 'সঞ্জীবনী সভা' সদস্যপদ গ্রহণের কালে রক্তবস্ত্র পরিধান করে দেহের রক্ত দেওয়ার যে প্রসঙ্গ আছে নাটকে তা স্থান পেয়েছে অস্পষ্ট ভাবে। প্রতাপ এর স্বপ্নদৃশ্য রাজপুতললনার যে চিত্র বা পরিণতিতে অশ্রুমতীর যে রক্তবস্ত্র পরিধান সেখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আসলে নাট্যকার ব্যক্তিস্বার্থকে ত্যাগ করে দেশের স্বার্থকে আঁকড়ে ধরার আদর্শকে প্রচার করতে চেয়েছেন। নাট্যকারের মননে, চিন্তনে, কর্মে স্বদেশানুরাগের যে পরিচয় আমরা পেয়েছি তারই প্রতিচ্ছবি এখানে ফুটে উঠেছে। নাট্যকাহিনিতে নানান বির্তক দানা বাঁধবে যদি নাটকটিকে শুধুমাত্র ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে বিবেচনা করি। কিন্তু সব বিতর্কের অবসান হয় যখন নাটকটিকে স্বদেশপ্রীতিমূলক রোমান্টিক নাটক হিসাবে বিশ্লেষণ করি। অনেক নাট্যকারই আপন উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করতে কখনও পুরাণ থেকে কখনও লোকপ্রবাদ থেকে কখনও বা ইতিহাস থেকে 'Myth' গ্রহণ করেছেন সেখানে যেমন বিচার্য হয়েছে নাট্যকারের উদ্দেশ্য কতটা সার্থক হয়েছে এখানেও সেই প্রশ্ন আসা উচিত যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রেম ফুটিয়ে তুলতে কতটা সার্থক হয়েছে, উত্তরে এ কথায় বলা যায়, সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে।

নাট্যকারের জীবন দর্শন, জীবনীতে স্বদেশপ্রীতির যে আবেগ ছিল নাটকটির মধ্যেও সে আবেগ বজায় রয়েছে। জারি হওয়া নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের পরিমণ্ডলে থেকেও নাট্যকার এর বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলে অশ্লীনতা বর্জন করে, সরকার বিরোধীমূলক অনুসঙ্গ বর্জন করেও দেশপ্রীতির বার্তা পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। কালা আইন বলবৎ হওয়ার পরে বাংলা নাটকের গতি যখন হঠাৎই ঘুরে যায়, তখন কিন্তু নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পূর্বধারা বজায় রেখেই কোনপ্রকার ভীত না হয়েই এ নাটক রচনা করেন। বিশ শতকের পূর্বে তার বহুবার অভিনীত হয়। ইংরেজ সরকার বাংলার মাটি থেকে স্বদেশপ্রীতিমূলক নাটকের অভিনয় নিঃশেষ করতে চাইলেও তা মূলত শেষ হয়নি। এই ধারা অব্যাহত ছিল যে কয়টি নাটকের মধ্যে 'অশ্রুমতী' তার অন্যতম। আর সে কারণেই হয়ত বিশ শতকের প্রথম দিকে তা আবার সহজেই জেগে ওঠে প্রকটভাবে।

অনেকেই সম্প্রদায়িকতার কথা বলে থাকেন। একথা অস্বীকার করা যায় না, বাংলাদেশে স্বদেশপ্রেমের জাগরণমূলত হিন্দুত্ববাদের হাত ধরে ঠিকই। প্রবল ব্রাহ্মণ্য শাসনে লালিত বঙ্গ-সমাজে হিন্দুত্ব রক্ষা করার প্রবনতা অনেক বেশি ছিল উনিশ শতকের উনিশ শতকের আগে পর্যন্ত। বিশেষ করে আদি ব্রাহ্মসমাজ, নবগোপাল মিত্রের সান্নিধ্যে থাকা নাট্যকারের মধ্যেও। জাতীয়তাবাদ তাই

চরম আকার নেয়। দীর্ঘ মুসলমান শাসনে বাঙালি হিন্দুর একটা বৈরি ভাব ছিল থাকও হয়ত স্বাভাবিক ছিল কিন্তু ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা থেকে শিক্ষিত তরুণের ভাবনার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে। নাট্যমঞ্চে অনেক মুসলমান তনয়কে দেখা যায় তার পর থেকে। উগ্র জাতীয়তাবাদ পরিবর্তিত হয় স্বদেশভাবনা। নাট্যকারের 'সঞ্জীবনী সভা'তে তার দৃষ্টান্ত পেয়েছি। এই সময়ের কিছু নাটকেও মুসলমান প্রজাপালক শাসককে প্রশংসা করতে দেখেছি। নাট্যসাহিত্য যে মুসলমান চিত্র এ সময়ের নাটকে অঙ্কিত হয়েছে তা মূলত শাসক ব্রিটিশ প্রতিনিধি হিসাবে। নাটকের সংগ্রাম হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ছিল না। সংগ্রাম ছিল শাসক ও প্রজার মধ্যে।

তাছাড়া ইতিহাসকে অবলম্বন করে বাংলা নাটক রচনা করতে হলে মুসলমান ইতিহাসই সর্বাগ্রে চলে আসে। তুর্কি আক্রমনের পূর্বে বাংলার ইতিহাস স্পষ্ট নয়। মোঘলদের ইতিহাস যখন সাহিত্যে আসে (স্পষ্টতা ও তথ্যের বাহুল্যের কারণে) তখন যবন ছাড়া আর কে আসবে। তবুও একটি জিজ্ঞাসা থাকে, বাঙালি নাট্যকাররা বাংলার ইতিহাসের অভাব হেতু ভারতের অন্য অঞ্চলের ইতিহাসকে গ্রহণ করেছেন কিন্তু দেশহিতৈষী মুসলমান শাসকদের 'মডেল' হিসাবে অঙ্কন করেননি। এ বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে। সিরাজের ইংরেজ বিদ্বেষকে এ সময়ের নাট্যকাররা যেমন শ্রদ্ধা করেছেন, দিল্লিশ্বরদের অপশাসনকে তেমনই ধীক্কার করেছেন। তাই নাট্যকারের নাটকগুলিতে কোনো সাম্প্রদায়িক বা নির্দিষ্ট জাতির কথা নয় স্বদেশবাসীর দুর্দশা, স্বাধীনতা প্রাপ্তির উৎসাহকে দেখানো হয়েছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ যেমন মানবতাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন আহম্মদ খান মুসলিম সমাজে তেমনই মানবতাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

ইংরেজদের সীমাহীন ঔদ্ধত্যে ভারতীয়দের মনে যে ঘৃণার সঞ্চর হয় তা শিক্ষিত তরুণেরা মেনে নিতে পারেন না। তারই ফলস্বরূপ 'ইন্ডিয়ান লিগ' (১৮৭৫), 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৬) বা ভারত সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতসভার প্রাণপুরুষ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের বিভিন্ন জাতি, হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে ঐক্য সাধন করে গণ-আন্দোলনের মঞ্চ তৈরি করেন। নাট্যকার এইসব সভার নানান সভ্যের বিশষ করে সুরেন্দ্রনাথের আদর্শকে যেখানে শ্রদ্ধা করতেন সেখানে তাঁর নাটকে হিন্দুত্ব অপেক্ষা মানবতা স্থান পাবে – সেটাই স্বাভাবিক। তাই সাম্প্রদায়িক বলে যাঁরা তাঁর নাটককে অভিযুক্ত করতে যান তা ঠিক নয়। তার নাটক স্বদেশপ্রেমের নায়ক, স্বদেশবাসীর উন্নতির মহৎ উদ্দেশ্যের নাটক শেষ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্ত করতে হয়।

টীকা ও সূত্রনির্দেশ ঃ

১. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অশ্রুমতী নাটক', কলকাতা, ১৮৮৮, দ্র. ঐ গ্রন্থের শিরোনাম অংশ।

২. মন্মথনাথ ঘোষ, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ', পৃ. ৮১, দ্র. দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. একত্রিশ-বত্রিশ।

৩. দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১০৪

৪. ঐ, পৃ. ১০৬

৫. ঐ, পৃ. ১০৭

৬. ঐ, পৃ. ১০৮

৭. ঐ, পৃ. ১১১

৮. সুশীল রায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ', কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ৫৫

৯. দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১১৪

১০. মন্মথনাথ ঘোষ, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ', পৃ. ৮১-৮৩, দ্র. দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দনাথ নাটক সমগ্র', কলকাতা, ২০০২, পৃ. বত্রিশ

১১. দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১১৭

১২. ঐ, পৃ. ১১৬

১৩. অজিত কুমার ঘোষ, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', কলিকাতা, ২০০১, পৃ. ১৩৮

১৪. দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১২০

১৫. ঐ, পৃ. ১২৩

১৬. সেলিম-অশ্রুর প্রণয় সম্পর্কে সমালোচনার ঝড় ওঠে। বিধর্মীর প্রতি অশ্রুর প্রণয় দর্শককে আঘাত করে। নাট্যকারের জবাব পাই মন্মথনাথ ঘোষের 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ' গ্রন্থে, "কেহ কেহ মনে করেন, সেলিমের সহিত অশ্রুমতীর ভালোবাসা হওয়ার প্রতাপসিংহের শুভ্র যশে কলঙ্ক পড়িয়াছে। কিন্তু আপনারা যদি প্রাণিধান করিয়া নাটকখানি আগাগোড়া পাঠ করিয়া দেখেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, আমি এই ভালোবাসার বিশুদ্ধতা বরাবর রক্ষা করিয়াছি —শারিরিক স্পর্শে ইহাকে দূষিত হইতে দেই নাই।" দ্র. দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. একত্রিশ।

১৭. দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১২৩

১৮. ঐ, পৃ. ১২৪-১২৫

১৯. ঐ, পৃ. ১৩০

২০. ঐ, পৃ. ১৩১

২১. ঐ, পৃ. ১৩৪

২২. ঐ, পৃ. ১৩৪-১৩৫

২৩. মন্মথনাথ ঘোষ, 'জ্যোতিরিন্দ্র নাথ', পৃ. ৮১, দ্র. দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র', কলকাতা, ২০০২, পৃ. একত্রিশ-বত্রিশ
২৪. অজিত ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৩৮
২৫. দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১৩৫
২৬. ঐ, পৃ. ১৩৫
২৭. ঐ, পৃ. ১৩৬
২৮. ঐ, পৃ. ১৩৬
২৯. ঐ, পৃ. ১৪৫-১৪৬
৩০. ঐ, পৃ. ১৬৬-১৬৭
৩১. ১৯০১, ১৫ সেপ্টেম্বর ও ৩০ সেপ্টেম্বর কেশবচন্দ্র মিত্র দুটি পত্রে এবং ভারতজীবন প্রকাশনার রামকৃষ্ণ বর্মা একপত্রে (২৯/১০/১৯০১) অশ্রু-সেলিম নিয়ে যে প্রশ্নগুলি তুলেছিলেন, প্রতাপের এই অনমনীয় চরিত্রাঙ্কনে, বীরত্ব প্রকাশে তথা স্বদেশ সম্মানকে প্রাধান্য দিতে এই অংশটিতে সে অভিযোগ অনেকাংশে লঘু হয়ে যায়। পত্র দ্র. দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র', কলকাতা, ২০০২, পৃ. ত্রিশ-বত্রিশ।
৩২. অজিতকুমার ঘোষ, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৩৮
৩৩. দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১৬৮
৩৪. অজিতকুমার ঘোষ, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৩৮
৩৫. দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১৬৮-১৬৯
৩৬. ঐ, পৃ. ১৬৯
৩৭. ঐ, পৃ. ১২৩
৩৮. গৌতম বসু মল্লিক, ভারতসংগীত সমাজ,' শারদীয় দেশ', ১৪০৪, পৃ. ১২১
৩৯. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (৩য়), কলকাতা, ১৪০৬, পৃ. ৩২৫
৪০. অজিতকুমার ঘোষ, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', কলকাতা, ২০০১, পৃ. ১৩৭
৪১. মন্মথনাথ ঘোষ, 'জোতিরিন্দ্রনাথ' পৃ. ৭৭-৭৮, দ্র. দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ত্রিশ
৪২. মন্মথনাথ ঘোষ, ঐ, পৃ. ৭৯-৮০
৪৩. ঐ, পৃ. ৯২, দ্র. ঐ, পৃ. বত্রিশ-তেত্রিশ
৪৪. ঐ, পৃ. ৯৪-৯৭, দ্র. ঐ, পৃ. তেত্রিশ-চৌত্রিশ
৪৫. ঐ, পৃ. ৯৪, দ্র. ঐ, পৃ. তেত্রিশ
৪৬. দর্শন চৌধুরী, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১২৮

৪৭. শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'অবনীন্দ্র রচনাবলী' (১ম), কলিকাতা, ১৩৯৯, পৃ. ১২৭-১৩০

৪৮. প্রশান্তকুমার পাল, 'রবিজীবনী' (২য়), কলিকাতা, ২০০৬, পৃ. ৫৯

৪৯. মন্মথনাথ ঘোষ, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ', পৃ. ৮৫-৮৮, দ্র. দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র' (১ম), জীবনকথা অংশ, পৃ. একত্রিশ

৫০. দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (স), 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র' (১ম), কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৩৫-৩৬

৫১. মন্মথনাথ ঘো, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথ', পৃ. ৮১-৮৩, দ্র. ঐ, পৃ. একত্রিশ-বত্রিশ

৫২ সুকুমার সেন, বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, কলকাতা, ১৩৮৬, পৃ. ৩২৪

৫৩. অজিত কুমার ঘোষ, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', কলিকাতা, ২০০১, পৃ. ১৩৮-১৩৯